বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের চেতনা ও মতাদর্শিক বিকাশ

হাসানউজ্জামান

[illegible]

বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের চেতনা
ও
মতাদর্শিক বিকাশ

হাসান উজ্জামান

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং
১১৪ মতিঝিল বা/এ
পোষ্ট বক্স ২৬১১
ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ১৯৯১

প্রচ্ছদ : আমান উল্লাহ

পুস্তানী অলঙ্করণ : সামারুক্ষ মহিউদ্দিন (বয়স ১১ বছর)।

প্রকাশক : মহিউদ্দিন আহমেদ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বা/এ, পোষ্ট বক্স ২৬১১, ঢাকা ১০০০। কম্পিউটার কম্পোজ : মডার্ণ টাইপ ফাউণ্ডার্স। ইন্টারস্পিড প্রিন্টিং এ্যাণ্ড প্যাকেজিং, ৬১৮ উত্তর শাহাজানপুর, ঢাকা।

নূর হোসেন, শামসুল আলম মিলন
ও স্বেচ্ছাচারবিরোধী সংগ্রামের
সকল শহীদ এবং বাংলাদেশের
সাহসী জনগণকে–

লেখকের কথা

'বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের চেতনা ও মতাদর্শিক বিকাশ : আর্থ রাজনীতি ও ইতিহাস' শীর্ষক এই গবেষণা কর্ম ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ পর্যায়ে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের চেতনা বিকাশের আর্থ রাজনীতি ও ইতিহাস অনুসন্ধান করে। মতাদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্রের বিষয়টি কীভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং জনগণের চেতনায় ঠাঁই পেলো; কীভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ, ছাত্র–বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক কর্মী ও নেতৃবর্গ এবং দেশের ব্যাপক গণমানুষ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে জাতীয় ঐকমত্য হিসেবে গ্রহণ করলো, সেই ইতিহাস, তার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত এবং ১৯৪৭–৭২ পর্যায়ের রাজনৈতিক অর্থনীতি অনুসন্ধান, আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

প্রায় দু'শো বছরের বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হবার কালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি গণতন্ত্র, জন স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং আর্থনীতিক শোষণমুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব গ্রহণে এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলা ও বাঙালী জনমণ্ডলীর সমর্থন নিয়ে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ঘটাতে পেরেছিলো। কিন্তু পাকিস্তান তার ২৪ বছরের জীবনে স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ করে নি, বাঙালীর স্বপ্নকে সত্য হতে দেয় নি। পাকিস্তানী ধর্মীয় রাষ্ট্রটি হাজার মাইলের ব্যবধানে থেকে পূর্ব বাংলাকে অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক কাঠামোয় আবদ্ধ করে এবং সামরিক আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে রাজনীতিক স্বেচ্ছাচার ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন চালিয়ে যায় ঊনিশ শতকীয় কায়দায় গড়ে তোলা শোষণভিত্তিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ এবং পূর্ব বাংলার ওপর চেপে বসা আঞ্চলিক ও শ্রেণী শোষণের দ্বিবিধ, পরস্পর প্রবিষ্ট ও পরস্পর সম্পর্কিত প্রক্রিয়া বাঙালী উঠতি বুর্জোয়ার শোষণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন ও সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষকে নিঃস্ব করে ছাড়ে। মোহভঙ্গ হওয়া বাঙালী এর ফলে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় শোষণের কাঠামো উপড়ে ফেলা ও বন্টনে সাম্য প্রতিষ্ঠা তথা সমাজতন্ত্রের বিবেচনাটি রাজনীতিক গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন–স্বাধিকার এবং পূর্ব বাংলার ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি ও ভিত্তিরূপে সর্বাধিক প্রভাবশালী প্রপঞ্চ হিসেবে রাজনীতিক নেতৃবর্গ ও কর্মী সমাজ, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহ, ছাত্র–বুদ্ধিজীবী–পেশাজীবী গোষ্ঠী এবং সাধারণ জনগণের চেতনায় ঠাঁই পায়। ১৯৪৭ থেকে শুরু করে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যটি বিভিন্ন কর্মসূচী ও ম্যানিফেস্টোর মাধ্যমে ১৯৬৮–৬৯ এর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচনী সংগ্রাম এবং ১৯৭১–এর মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাঙালীর জাতীয় ঐকমত্যরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।

বর্তমান গবেষণা কর্মটি সমাধা করা হয়েছে বহু সংখ্যক বই–পত্র, রাজনীতিক দলের কর্মসূচী ও ম্যানিফেস্টো, রাজনীতিক–সামাজিক–সাংস্কৃতিক ও ছাত্র সংগঠনের প্রচারপত্র ও ঘোষণা, রাজনীতিক নেতৃবর্গের বক্তৃতা–বিবৃতি–সাক্ষৎকার, সরকারী দলিল পত্র, পরিকল্পনা কমিশনের দলিল পত্র, পার্লামেন্টের প্রসিডিংস, বিভিন্ন লেখকের

রচনাবলী, দৈনিক-সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা-জার্নাল, রাজনীতিক সাংস্কৃতিক নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপচারিতা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি অনেক উৎসের সম্মিলনে প্রাপ্য তথ্য ও তত্ত্ব সমন্বয়ে।

বাঙালীর রাজনীতিক সংগ্রাম আর্থনীতিক শোষণের বিরুদ্ধে তার যে-সংগ্রাম, সেটাকে ভিত্তি করেই বিকশিত হয়েছিল। অর্থাৎ আর্থনীতিক বন্টন সাম্য প্রতিষ্ঠার বিবেচনাই রাজনীতিক প্রবাহকে গতিবেগ দিয়েছিল এবং রাজনীতিক ঐকমত্যে সমাজতন্ত্র অন্যতম একটা লক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

বাঙালী পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেলেও প্রকৃত গণতন্ত্র এবং আর্থনীতিক মুক্তি আজো পায় নি। ১৯৭০ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হবার ১৯ বছর পরেও নয়। এর কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতি আন্তর্জাতিক পুঁজির আশ্রিতের অবস্থানে যেমন রয়েছে, তেমনি দেশাভ্যন্তরে শোষণভিত্তিক বিকৃত পুঁজিবাদী আর্থনীতিক পরিমণ্ডল ও শ্রেণী কাঠামো পুরোপুরি টিকে আছে। এ দু'টি দিক আবার পরস্পর ঘনিষ্ট সম্পর্কিত। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক পুঁজি নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশকে শোষণমুক্ত নবজীবনের ওপর দাঁড় করাতে হলে বাইরের শক্তির সহযোগী হিসেবে দেশাভ্যন্তরে যে-শ্রেণী কাঠামো ও শোষণ রয়েছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এ সংগ্রাম হবে মূলত খাড়ামুখী সংগ্রাম এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামরিক কর্তৃত্বাধীন স্বেচ্ছাচারী আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর উৎপাটন করে নতুন গণতান্ত্রিক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র কাঠামো সৃজন করা প্রয়োজন হবে। এই নতুন কাঠামোই বদলে ফেলবে বাংলাদেশের অর্থনীতির শোষণ প্রক্রিয়াটিকে।

বাংলাদেশে আজ শহরে-গ্রামে, শিল্পে-কৃষিতে, বাণিজ্যে এক কথায় অর্থনীতির সর্বত্র পুঁজি ও উৎপাদন উপকরণের এবং ভূমি মালিকানার যে-কেন্দ্রীভবন ঘটেছে, আন্তর্জাতিক পুঁজির যোগসাজশে লুটেরা পুঁজির বিকাশের মধ্যে দিয়ে কালো টাকার যে-বিকৃত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পুঁজি ও উৎপাদন উপকরণের মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ মানবেতর জীবন যাপন করছে। বাংলাদেশের বিদেশী ঋণ নির্ভরতা, জনগণের বিপুল অধিজনের প্রকৃত আয়, তাদের আর্থনীতিক জীবন মান ও ক্যালরী গ্রহণের মাত্রা লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দেশের বিদ্যমান সমস্যার সমাধান বর্তমান আর্থনীতিক কাঠামোয় কোনেক্রমেই সম্ভব নয়। পূর্ণাঙ্গ আর্থনীতিক পুনর্বন্টন ও সাম্য প্রতিষ্ঠাই কেবল এ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায়। কেননা এখানে শুধু মুষ্টিমেয়র হাতে অস্বাভাবিক কেন্দ্রীভবন নয়, বরং সেই সঙ্গে বিপুল অধিজনের সীমাহীন দারিদ্র্য সৃষ্ট চাপের মুখে আতঙ্কিত মুষ্টিমেয়-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পত্তির মালিকানা ও শোষণ রক্ষার্থে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের খোলসটিকে পর্যন্ত ধ্বংস করেছে। বিগত ১৮/১৯ বছর ধরে রাষ্ট্র চরম স্বেচ্ছাতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং গত ১৫ বছর ধরে সামরিক স্বৈরতন্ত্র চালিয়েছে। ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল এ অবস্থার পূর্ণাঙ্গ বদলের সংগ্রাম। সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আর্থনীতিক শোষণমুক্তি, বন্টনে সাম্য ও ভালভাবে বাঁচার দাবীও তীব্রভাবে উঠে এসেছে।

এই প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্রের দাবী আবারো সামনে আসবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব-ইউরোপে সমাজতন্ত্রে যে-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সে ব্যাপারে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি। কেননা সমাজতন্ত্র থেকে সরে এসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমস্যা বহুগুণ বেড়েছে বই কমে নি। আসলে সমাজতন্ত্রে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের বদলে কেবল কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জন স্বাধীনতা বিনষ্ট করে আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার কায়েমের ভ্রান্তির কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। অথচ সমাজতন্ত্রের তো কেবল আর্থনীতিক মুক্তিই নয়, সেই সঙ্গে রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি এবং স্বাধীনতা দেয়ার কথা ছিল। সমাজতন্ত্রের কথা ছিল প্রকৃত স্বাধীন মর্যাদাবান সৃজনশীল মানুষ তৈরী করা। সমাজতন্ত্রই তো সত্যিকার গণতন্ত্র হবার কথা ছিল। তা হয় নি বলেই পরিবেশে সৃষ্ট নানাবিধ চাপ এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে জনজোয়ার জাগিয়েছে। এ থেকে সারা বিশ্ববাসীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষকে ইতিবাচক শিক্ষা নিতে হবে। অর্থাৎ আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রকৃত গণতন্ত্র ও জনস্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে আসতে পারে না। বস্তুত, প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আর্থনীতিক শোষণমুক্তি, বন্টনে সাম্য ও ভিত্তিতে সবার সম অবস্থান তৈরী করা একান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত। আবার সমাজতন্ত্রও টেকে না রাজনীতিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র না থাকলে। তাই আর্থনীতিক ও রাজনীতিক মুক্তি পাশাপাশি ও একযোগে থাকা দরকার। আর্থনীতিক সাম্য ও গণতন্ত্র পরস্পর নির্ভর ও পরিপূরক। আর আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আর্থনীতিক নিদারুণ শোষণ থেকে জনসমাজকে রক্ষা করতেই হবে। সামাজিক শ্রম ও ব্যক্তিগত ভোগের মৌলিক অসঙ্গতি, পুঁজি ও উৎপাদন উপকরণের চরম কেন্দ্রীভবন ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই দরিদ্রতম সমাজে সর্বাধিক গুরুতর সামগ্রিক সঙ্কট তৈরী করেছে। এমতাবস্থায় আর্থনীতিক পুনর্বন্টন, সাম্য ও সমসুযোগ তথা সমাজতন্ত্র ছাড়া দরিদ্রতম বাংলাদেশের আর বিকল্প কোথায় ? বর্তমান গবেষণা কর্মটি এই লক্ষ্যে কিছু চিন্তার খোরাক পাঠককে দেবে বলে মনে হয়।

পরিশেষে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী জনাব মহিউদ্দিন আহমেদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার এই গবেষণা কর্মকে পাঠকের সামনে গ্রন্থাকারে তুলে ধরার সুযোগ দিয়েছেন বলে।

হাসান উজ্জামান

১৪ ই জানুয়ারী, ১৯৯১

সূচী

ভূমিকা : সমাজতন্ত্রের চেতনা	১
আর্থনীতিক শোষণ ও প্রতিনিধিত্বহীনতা : পূর্ব বাংলার উপনিবেশীকরণ	৪
শ্রেণীশোষণ এবং পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের অবস্থা	২৩
পূর্ব বাংলার সমাজতন্ত্রের চেতনা এবং ঐকমত্যের প্রক্রিয়া : ১৯৪৭–৬৮	৩১
১৯৬৮–৬৯-এর বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান, শ্রমিক কৃষক সাধারণ জনতার অগ্রসরমানতা এবং সমাজতন্ত্রের ঐকমত্য	৫৬
বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান : মেহনতি জনতার অংশগ্রহণ, ঘেরাও ও শ্রেণী চেতনা	৬০
মেহনতি জনতার অংশগ্রহণ ও অগ্রসরমানতা : প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও সংঘাত এবং 'ঘেরাও'–এর চিত্র	৭৪
ঘেরাও ও গণঅভ্যুত্থান : আরো কিছু তথ্য ও মূল্যায়ন	৯৪
বুর্জোয়া রাজনীতিক নেতৃত্বের ভূমিকা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ	১০০
বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের প্রভাব : নভেম্বর ১৯৬৮ থেকে মার্চ ১৯৭১–এর ভেতর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ঐকমত্য	১০৩
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সমাজতন্ত্রের ঐকমত্য সম্পর্কে কিছু নমুনা	১২৫
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন সংগঠনের দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র	১২৮
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র	১৩৪
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গণমাধ্যম বা সংবাদপত্রে সমাজতন্ত্র	১৩৬
তথ্য ও সূত্র নির্দেশ	১৪৬

১

ভূমিকা ঃ সমাজতন্ত্রের চেতনা

আধুনিক বিশ্ব পরিসরে সমাজতন্ত্র একটি অন্যতম গ্রহণযোগ্য সমাজব্যবস্থা তথা জীবন ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, পরিচিত ও জনপ্রিয়। নানা হেরফের রেখে আজকের বিশ্বের অনেকগুলো দেশের (সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোসহ) শত কোটিরও বেশি মানুষ সমাজতান্ত্রিক সমাজে বাস করছে। বিশ্বপরিসরে পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার শ্রেণী-ভাঙন, শ্রেণী শোষণ ও পীড়ন, এর কর্তৃক উৎপাদিকা শক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ রুদ্ধকরণ, পুঁজিবাদের বিচ্ছিন্নতা-সমস্যা-সংকট, একদিকে মুষ্টিমেয়ের ধন-সম্পত্তি ও বিলাসের বিপরীতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্পত্তিহীনতা ও দরিদ্র মানবেতর জীবন যাপন—এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই দেশে দেশে সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগণের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটতে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পালটে ফেলে তার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই সমাজতন্ত্রের মূল কথা। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তথায় সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার সাহায্যে নতুন উপযোগী সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মৌল স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন— এর সামাজিকীকরণ তথা উৎপাদন, বন্টন, বিনিময়, ভোগের সামাজিকীকরণই হচ্ছে সমাজতন্ত্র। উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানাসৃষ্ট পরিবেশে মজুরী শ্রমের বিনিময়ে উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ-এর প্রক্রিয়া উৎপাটন করে শ্রেণী শোষণের মূলে কুঠারাঘাত করা এবং শোষণহীন, সাম্যভিত্তিক, ন্যায়ানুগ জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল কথা। সাম্যভিত্তিক, মানবিক ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক

জীবন হল সমাজতন্ত্র –এর স্মারক।

ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বপরিসরে আদিম বা প্রাথমিক সমতার বা সাম্যের সমাজ ভেঙে যায় মানুষের হাতিয়ার, কলাকৌশল ও শ্রমের উন্নতির ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে পারার সময় থেকে। এই উদ্বৃত্তের মালিকানা নিয়ে মানুষের মধ্যে গোলযোগ বাধে এবং মানুষ বিভক্ত হয়ে যায় বিভিন্ন অসম অবস্থানে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানার ভিত্তিতে মুষ্টিমেয় পরজীবী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীর বিভাজনই এ সময় থেকে সমাজের মৌল রূপ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ সমাজ হয়ে পড়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। আর রাষ্ট্রের প্রয়োজন এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। এর কাজ হচ্ছে নিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিভিন্ন অসম বর্গের ভেতর দ্বন্দ্ব–সংঘাতকে সীমার ভেতর, মীমাংসার ভেতর রেখে শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এজন্যে গোড়ার দিকে রাষ্ট্র ছিল পুলিশী রাষ্ট্র, অতঃপর 'লেসেস ফেয়ার' যুগের পথ পেরিয়ে রাষ্ট্র তার কার্যপরিধি ও ক্ষমতা সীমা অনেক বাড়িয়ে ফেলে, তার ভূমিকাও হয়ে পড়ে বহু–বিস্তৃত। এরপর আসে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও এর পরপরই সমাজ কল্যাণ রাষ্ট্রের যুগ। এসময় থেকেই রাষ্ট্র মূলত শ্রেণী শোষণের যন্ত্র হলেও এর নৈর্ব্যক্তিক, সমাজ কল্যাণ কামী বৈশিষ্ট্য এবং ব্যাপক জনজীবনে উন্নয়ন–অগ্রগতি–প্রগতি নিশ্চিতকরণার্থে এর আর্থনীতিক–সামাজিক উপযোগবাদী বৈশিষ্ট্যও বিকশিত হয়। শিক্ষাদীক্ষা, যোগাযোগ, মানব জ্ঞান–সংগ্রাম–অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশ, রাজনীতিক গণতন্ত্র ও সার্বজনীন ভোটাধিকার, মানব সাম্য ও স্বাধীনতার চেতনা বিকাশ ইত্যাদির ফলে আজকের বিশ্বে পুঁজিবাদী শোষণের সমাজেও রাষ্ট্র একটা সমাজচুক্তি বিশেষ। রাষ্ট্র আজ একটা প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি হচ্ছে উন্নত সমাজ গঠনের, আর্থনীতিক সাম্য ও সম বন্টনের, এই প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্র অন্তর্গত মানবমণ্ডলীকে সম বন্টন ও সুবিচারের ভিত্তিতে সমতালে সমষ্টিগতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার।

ঐতিহাসিকভাবে 'মুসলমান স্বাতন্ত্র্য'–এর বিভ্রান্তির কবলে নিপতিত হয়েও, 'ধর্মীয় রাষ্ট্র' গঠনের সাম্প্রদায়িক চোরাবালিতে পা রেখেও তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা এবং সাতচল্লিশ উত্তরকালে পূর্ব বাংলা, এর নেতৃবর্গ ও জনমণ্ডলী নব রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের ভেতর দিয়ে এ যাবৎকালের আর্থনীতিক–সামাজিক–সাংস্কৃতিক–রাজনীতিক শোষণমুক্তি, সমতা ও ন্যায়ানুগ বন্টন এবং পূর্ণাঙ্গ রাজনীতিক–সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাধীনতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল।

কিন্তু ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাঙালী জনমণ্ডলী— এর নেতৃবর্গ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজ ও কৃষক সাধারণকে প্রতারণা করে, তাদের সকল প্রত্যাশা গুঁড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানে রাষ্ট্র ক্ষমতাধিষ্ঠ পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক অবাঙালি শোষক–

শাসকগোষ্ঠীর কারণে এবং আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীতে একই গোত্রের, একই অঞ্চলের ও একই ভাষাভাষীর একচেটিয়াত্ব অর্জনের ফলে শোষণমুক্তি, ন্যায়ানুগ বন্টন ও সমতা শিকেয় উঠেছিল এবং এসবের পরিবর্তে রাতারাতি প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে দ্বিবিধ শোষণ—আঞ্চলিক ও শ্রেণীগত। পরিণতিতে পূর্ব বাংলা লোক সংখ্যায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও 'ইসলামী রাষ্ট্র' পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়।

আর এই অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে, আঞ্চলিক ও শ্রেণীগত দ্বিবিধ শোষণের খপ্পর থেকে নিষ্কৃতি লাভের বাসনায় গোড়া থেকেই বাঙালিরা আর্থনীতিক শোষণমুক্তি, শ্রেণীপীড়ন মুক্তি, রাজনীতিক যথার্থ স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্যে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে একের পর এক, একটানা। শ্রেণী ও আঞ্চলিক শোষণমুক্তি, আর্থনীতিক বৈষম্য বিরোধী ন্যায়ানুগ ও সম বন্টন — এই মৌল চেতনা থেকেই পূর্ব বাংলায় বাঙালি নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, সাংবাদিক সমাজ, ছাত্র সমাজ, শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন— এক কথায় ব্যাপক জনমণ্ডলীর ভেতর শোষণমুক্ত সমাজ তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে নব চেতনা জাগ্রত হয়। কালে কালে তা ব্যাপকতা লাভ করে।

এক বৃটিশ শাসনামলেই বাংলাদেশে শতাব্দী কালেরও বেশি কৃষক অভ্যুত্থান ও সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। বিশ শতকের গোড়া থেকে এতদঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামও অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছে। এ শতকের বিশের দশকে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রসার ঘটে এবং কমিউনিষ্ট পার্টিও গঠিত হয়। এসবের ফলে শোষণমুক্ত জীবন তথা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একটা চেতনা বরাবরই বহু বছর ধরে এতদঞ্চলের মানবমণ্ডলীর চেতনায়, তাদের অগ্রসর অংশের রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে ক্রিয়াশীল ছিল। এতদঞ্চলের কমিউনিষ্ট পার্টি, অন্যান্য বাম সংগঠন, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের ভেতরতো বটেই, এমনকি অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের কর্মসূচীতেও, কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ হাইকমাণ্ডের বিরোধিতা সত্ত্বেও, জমিদারী উচ্ছেদের পরিকল্পনা এবং 'লাঙল যার জমি তার' ইত্যাদি র‍্যাডিকাল চেতনা বিদ্যমান ছিল।

চল্লিশের দশকের মাঝ নাগাদ সাম্প্রদায়িকতার জোয়ারে এসব চিন্তা-চেতনা খানিকটা চাপা পড়ে গেলেও এগুলো অন্তঃসলিলা ছিল; একটা স্রোতধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বাংলার রাজনীতিতে, এর অগ্রসর মানবগোষ্ঠীর চেতনায় ফল্গুধারার মতোই প্রবাহিত ছিল। একারণেই দেখি, ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতারণা এবং বাঙালির জীবনে তার অগ্রহণযোগ্যতা উপলব্ধি করতে পারার সাথে সাথেই শ্রেণী ও আঞ্চলিক আর্থনীতিক শোষণমুক্তি এবং যথার্থ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার উপায়স্বরূপ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের দাবীও নতুন শক্তি ও আবেদন নিয়ে উঠে এসেছে। অতঃপর ২৪ বছরের প্রক্রিয়ায় একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে তা বাঙালি জনমন্ডলীর রাজনীতিক ঐকমত্যে রূপ পেয়েছে এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২-এর সংবিধানে মৌল রাষ্ট্রীয় নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২

আর্থনীতিক শোষণ ও প্রতিনিধিত্বহীনতা ঃ পূর্ব বাংলায় উপনিবেশিকরণ

জনগণের এবং অন্তর্গত অঞ্চলসমূহের ক্রমাগত আর্থনীতিক উন্নতি, বৈষয়িক সমৃদ্ধি এবং সমতালে অগ্রগতিই আধুনিক রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এসব প্রতিশ্রুতি দিয়েই। কিন্তু পাকিস্তান তার প্রতিশ্রুতি রাখে নি এবং সমস্যা ও সংকটের শুরু সেখান থেকেই।

সাইমন কুজনেত বলেন যে, আর্থনীতিক উন্নয়নের একটা স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এর 'স্বয়ং সংরক্ষণ' (সেলফ্ সাস্টেইনিং) প্রকৃতি।[১] এই স্বয়ং সংরক্ষণ প্রকৃতি অর্জন করার জন্যে প্রধানত দরকার জাতীয় প্রতিশ্রুতি এবং উৎপাদন কর্মকাণ্ডে জনমণ্ডলীর সম্ভবপর বৃহত্তম বিজড়ন ও অংশগ্রহণ। এ ধরনের বিজড়ন যা কেবল নৈতিক কারণেই নয়, বরং সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ আর্থনীতিক কারণেও কল্যাণকর, তা আখ্যায়িত হয়েছে ' সর্বজনীনকরণ' হিসেবে।[২] আর এসব করতে গেলে সমাজের একটা কাঠামোগত পরিবর্তন আবশ্যক। রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষমতাকে এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ও বিকেন্দ্রীকৃত করে দিতে হবে যাতে করে রাষ্ট্রে একটা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে একটা অংশগ্রহণকারী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সার্বিক ও সুসমন্বিত উন্নয়নের স্বার্থে আর্থনীতিক কর্মকাণ্ড ও রাজনীতিক কর্মকাণ্ড ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে এগোবে। আর্থনীতিক সমবন্টনের সাথে সাথে বিভিন্ন শ্রেণী ও অঞ্চলের ভেতর রাজনীতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বও সমভাবে বন্টিত হতে হবে। তাই দেশের, রাষ্ট্রের আর্থনীতিক উন্নয়ন ও প্রগতি যথার্থভাবে নিশ্চিত করার জন্যে বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, দক্ষতা বৃদ্ধি, জাতীয় আয়ের সমবন্টন, অঞ্চলগত ও

শ্রেণীগত বৈষম্য হ্রাসকরণ ইত্যাদির সাথে সাথে রাজনীতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে, প্রশাসন পরিচালনায়, ব্যাপক ও কার্যকর গণ অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সমতা রক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন। এককথায় রাষ্ট্র ও জনজীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি অসাম্য, দারিদ্র, বেকারত্ব ও ক্ষুধা দূরীকরণের সাথে সাথে গণঅংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতিক গণতন্ত্রও দাবী করে।

১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এর উভয় অঞ্চলই ছিল পুরনো পদ্ধতিসহ কৃষি ব্যবস্থা ও জীবন ধারণ অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। শিল্পের ও আধুনিকতার বিকাশ সেকালে কোনো অঞ্চলেই তেমন একটা হয় নি। সেসময় সমগ্র পাকিস্তানের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শতকরা ৫৬ ভাগ ছিল পূর্ব বাংলার এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ৫২.৬ ভাগ অবদান ছিল এ অঞ্চলের। এ অবস্থা থেকে আর্থনীতিক মুক্তি ও স্বাধীন গণতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতির স্বপ্ন নিয়েও পূর্ব বাংলা কালক্রমে পরিণত হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে।

পাকিস্তানী কাঠামোয় পূর্ব বাংলার এ অবস্থায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া কতকগুলো বিষয়ের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সেগুলো ছিল ঃ

১. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অঞ্চল পূর্ব বাংলায় না হয়ে একের পর এক করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি ও ইসলামাবাদে হওয়া। এর ফলে বিশাল পরিমাণ অর্থ সে অঞ্চলে ব্যয় হওয়া ছাড়াও রাজধানীর যাবতীয় সুযোগ ও অন্যান্য সরকারি কর্মকাণ্ডও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় রাজধানী হওয়ায় এবং সেখান থেকে বিদেশী রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দ্বারা ১২০০ মাইলের ধান থাকায় পূর্ব বাংলা রাজধানীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল।

২. রাজধানী পশ্চিমাঞ্চলে হওয়ায় পুঁজির মালিক, উদ্যোক্তা, মিলকারখানার সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

৩. পাকিস্তানের রাজনীতিক, আর্থনীতিক, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের চরম একচেটিয়াত্বের কারণে প্রতিনিধিত্বহীন পূর্ব বাংলা ও বঞ্চনার শিকার হয়।

৪. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার বদলে কঠোর এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা তোলায় এবং ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে আর্থনীতিক উন্নয়ন ও ভৌগলিকভাবে ত হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের জন্যে এক অর্থনীতি গড়ে তোলায় পূর্ব বাংলা শ্রেণী কাঠামোগতভাবে ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার হয়।

৫.আমলাতন্ত্রে পূর্ববাংলার প্রতিনিধিত্ব একেবারে কম থাকায় এবং রাজনীতিক-প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার কোনো ঠাঁই না থাকায় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, আমদানী–রফতানী, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য বন্টন, বৈদেশিক মুদ্রা, উন্নয়ন ব্যয়, রাজস্ব ব্যয়, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান তথা অবাঙালিরা একচেটিয়া সুবিধা পায় এবং পূর্ব বাংলা চরম বঞ্চনা ভোগ করে।

৬. পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপূর্ণ অনুপস্থিতিতে এবং 'প্যারিটি'–এর কৌশলের ফলেও পূর্ব বাংলা বৈষম্য ও বঞ্চনার মধ্যে পড়ে।

৭. ব্যাঙ্ক, বীমা, ঋণদানকারী ও পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির প্রধান অফিস পশ্চিমাঞ্চলে হওয়ায় এগুলোর সুবিধাও পশ্চিমাঞ্চল পায়।

৮. পাকিস্তানের ২৪ বছরের জীবনকালে সামরিক বাহিনী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা দখলের পর শাসন পরিচালনার বছরগুলো বাদেও তাদের সার্বিক প্রভাব ছিল বাকি সময়টা জুড়ে। সকল রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাদের ইচ্ছা অনুসারেই নেয়া হতো। আর এক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলার ন্যূনতম প্রতিনিধিত্বও ছিল না, পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল একক কর্তৃত্ব। এ ছাড়া প্রতিরক্ষার নামে বিশাল ও সর্বাধিক ব্যয়ও করা হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চলে।

এসব কিছুর কারণে ও ফলে পূর্ববাংলা দারুণভাবে প্রতিনিধিত্বহীন এবং শোষিত-নিগৃহীত হয়। এভাবে এক ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সার্বিক অর্থেই জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসে এর ওপর। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পূর্ব বাংলার অবদান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে এর সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বরূপ নিম্নে বিভিন্ন হিসাব, ছক ও টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

টেবিল ১

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার ছিল নিম্নরূপ ঃ

সময়	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭–৫৫	৬%	১.৭%
১৯৫৫–৬০	৭.৬%	৪ %
১৯৬০–৬৫	৪.৩%	০.৯%

উৎস : রেহমান সোবহান, " হ পেজ ফর ডেভেলপমেন্ট", ফোরাম, ঢাকা ঃ ফোরাম পাবলিকেশন্স,২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, পৃঃ ৬–৭।

টেবিল ২

পাকিস্তানের রফতানী আয় (মিলিয়ন টাকায়)

বছর	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭-৪৮	২৭২	৪৪৪
১৯৪৮-৪৯	১৩২৮	৫৪২
১৯৪৯-৫০	৬৮৩	৫৩৫
১৯৫০-৫১	১২১১	১৩৪২
১৯৫১-৫২	১০৮৭	৯২২
১৯৫২-৫৩	৬৪২	৮৬৭
১৯৫৩-৫৪	৬৪৫	৬৪১
১৯৫৪-৫৫	৭৩২	৪৯১
১৯৫৫-৫৬	১০৪১	৭৪২
১৯৫৬-৫৭	৯০৯	৬৯৮
১৯৫৭-৫৮	৯৮৮	৪৩৪
১৯৫৮-৫৯	৮৮১	৪৪৪
১৯৫৯-৬০	১০৮০	৭৬৩
১৯৬০-৬১	১২৫৯	৫৪০
১৯৬১-৬২	১৩০০	৫৪২
১৯৬২-৬৩	১২৪৯	৯৯৮
১৯৬৩-৬৪	১২২৮	১০৭৫
১৯৬৪-৬৫	১২৬৮	১১৪০
১৯৬৫-৬৬	১৫১৪	১২০৪
১৯৬৬-৬৭	১৫৭৯	১৩৩৮
১৯৬৭-৬৮	১৪৮৪	১৮৬৪
১৯৬৮-৬৯	১৫৪০	১৭৬৩
১৯৬৯-৭০	১৬৬০	১৬০৮
১৯৪৭-৭০	২৫,৫৫৯	২১,১৩৭

উৎস : মান্থলি ফরেন ট্রেড স্ট্যাটিস্টিকস্, করাচীঃ সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস, গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান, জুন ১৯৭০, পৃঃ ১।

টেবিল ৩

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের বন্টন, ১৯৪৭–৪৮ থেকে ১৯৬০–৬১ ঃ

	পূর্ব বাংলা		পশ্চিম পাকিস্তান		অবরাদ্দ যোগ্য	
	কোটি টাকায়	সমগ্রের শতকরা	কোটি টাকায়	সমগ্রের শতকরা	কোটি টাকায়	সমগ্রের শতকরা
বাণিজ্যিক বিভাগগুলোর কার্যনির্বাহ ব্যয়সহ রাজস্ব ব্যয়	২৬৯	১২	৯৯৫	৪৫	৯৫২	৪৩
বাণিজ্যিক বিভাগগুলোর কার্যনির্বাহ ব্যয়ব্যতীত রাজস্ব ব্যয়	৮৬	৫	৬১৬	৩৪	১,১৩৮	৬১

সূত্র ঃইকোনমিক ডিসপ্যারিটিজ বিটুইন ইস্ট এ্যাণ্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান, প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট, ইষ্ট পাকিস্তান, ঢাকাঃ ইষ্ট পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট প্রেস, ১৯৬৩, পৃঃ ১৭

টেবিল ৪

বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বন্টন, ১৯৪৭–৪৮ থেকে ১৯৫৯–৬০ ঃ

	পূর্ব বাংলা		পশ্চিম পাকিস্তান		কেন্দ্রীয় সরকার		কোটির হিসেবে মোট টাকা
	কোটি টাকায়	সমগ্রের শতকরা	কোটি টাকায়	সমগ্রের শতকরা	কোটি টাকায়	সমগ্রের শতকরা	
বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্য	৯৩.৮৯	১৭	৩৩৫.২২	৬২	১১৩.০৩	২১	৫৪২.১৩
মার্কিন পণ্য সাহায্য	১২৯.০০	৩০	২৬২.০০	৬৪	১৮.০০	৬	৪০৯.০০

উৎস ঃ ঐ, পৃঃ ২১।

টেবিল ৫

বৈদিশিক সাহায্যের আসল সম্পদ সরবরাহ ঃ

	পূর্ব বাংলা (মিলিয়ন টাকায়)	পশ্চিম পাকিস্তান (মিলিয়ন টাকায়)	মোট (মিলিয়ন টাকায়)
দ্বিতীয় পরিকল্পনা (৪ বছর) ১৯৬১–১৯৬৫	২,৫৮২	৭,৬৭৩	১০,২৫৫
তৃতীয় পরিকল্পনা ১৯৬৫–১৯৭০	৪,৪৮১	৬,৯০৪*	১১,৩৮৫

*এই অঙ্ক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক লব্ধ ইনডাজ বেসিন রিপ্লেসমেন্ট ওয়ার্কস্-এর ১,৯০০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে বহির্ভূত রাখা হয়েছে।

উৎসঃ রিপোর্টস্ অব দি এডভাইজরি প্যানেল্স্ ফর দি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, ইসলামাবাদঃ প্ল্যানিং কমিশন, গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান, জুলাই, ১৯৭০, ভলিয়্যুম-১, পৃঃ ১১০।

টেবিল ৬

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬০-৬১ঃ

	পূর্ব বাংলা		পশ্চিম পাকিস্তান	
	মোট (কোটি টাকায়)	মাথাপিছু (টাকায়)	মোট (কোটি টাকায়)	মাথাপিছু (টাকায়)
বিনিয়োগ	১৭২	৩৮	৪৩০	১১৭
ঋণ	১৮৪	৪০	২২৪	৬১
সাহায্য বাবদ মঞ্জুরী	৭৬	১৫	১০১	২৮

উৎস ঃ ইকোনমিক ডিসপ্যারিটিজ বিটুইন ইস্ট এ্যাণ্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৮।

টেবিল ৭

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্যিক ভারসাম্য, ১৯৪৭-১৯৫৮ ঃ

(কোটি টাকায়)

বছর	বৈদেশিক ব্যালান্স		আন্তঃ অঞ্চল ব্যালান্স		সামগ্রিক ব্যালান্স	
	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব(−)	পশ্চিম(+)	পূর্ব	পশ্চিম
১৯৪৮-৪৯	১৪.৬৮	−৬৪.৮৩		১২.০৫	২.৬৩	−৫২.৭৮
১৯৪৯-৫০	২৪.৪১	−৩৪.৭০		১৮.৫১	৫.৯০	−১৬.১৯
১৯৫০-৫১	৭৫.৮২	+১৭.৫৪		২০.৮৫	৭৪.৯৭	+৩৮.৩৯
১৯৫১-৫২	৩২.৩১	−৫৫.২০		১৮.৭৭	১৩.৫৪	−৩৬.৪৩
১৯৫২-৫৩	২৭.৬১	−১৪.৯৯		৬.৯২	২০.৬৯	−৮.০৭
১৯৫৩-৫৪	৩৫.১৯	−১৮.৩৩		২৩.৫০	১১.৬৯	+৫.১৭
১৯৫৪-৫৫	৪১.১৪	−২৯.১৬		১০.৬৮	৩০.৪৬	−১৮.৪৮
১৯৫৫-৫৬	৬৮.০৬	−২২.২১		৯.৫৫	৫৮.৫১	−১২.৬৬
১৯৫৬-৫৭	৯.০৯	−৮১.৭৮		১৯.৭৭	−১০.৭৭	−৫২.০১
১৯৫৭-৫৮	২৫.২৫	−৮৮.০৭		৪৩.২৯	−১৮.০৪	−৪৪.৭৮

উৎস ঃ মুহাম্মদ আনিসুর রহমান, ইস্ট এ্যাণ্ড ওয়েস্ট পাকিস্তানঃ এ প্রবলেম ইন দি পলিটিক্যাল ইকোনমি অব রিজিওনাল প্ল্যানিং, ক্যামব্রিজ ঃ সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স,

হার্ভার্ড ইউনির্ভার্সিটি, ১৯৬৮ পৃঃ ১২।

উদ্ধৃতি ঃ রওনক জাহান, পাকিস্তান ঃ ফেইলিওর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন, ঢাকা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এবং ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৭৭, পৃঃ ৩৬।

টেবিল ৮

পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যিক ভারসাম্য, ১৯৫৮–৬৭ ঃ
(চলতি মূল্যে কোটি টাকায়)

বছর	বৈদেশিক ব্যালান্স		আন্ত ঃঅঞ্চল ব্যালান্স		সামগ্রিক ব্যালান্স	
	পূর্ব	পশ্চিম	পশ্চিম (+)	পূর্ব (–)	পূর্ব	পশ্চিম
১৯৫৮–৫৯	৩২.৭২	–৫৮.০২	৩৯.৭১	–৬.৯৯	–১৮.৩১	
১৯৫৯–৬০	৪২.৪৩	–১০৪.২৬	২০.১০	২২.৩৩	–৮৪.১৬	
১৯৬০–৬১	২৪.৪৮	–১৬৩.৩০	৪৫.৫৪	–২১.০৬	–১১৭.৭৬	
১৯৬১–৬২	৪২.৭৮	–১৬৯.৩০	৪৫.০৯	–২.৩১	–১২৪.২৫	
১৯৬২–৬৩	২৩.০৬	–১৮০.২০	৪৮.৪৪	–২৫.৩৮	–১৩১.৭৬	
১৯৬৩–৬৪	–২২.৪৪	–১৯০.৬৬	৩৮.৪০	–৬০.৮৪	–১৫২.২৬	
১৯৬৪–৬৫	–৪৩.৩৭	–২৫২.৬৩	৩৩.৭৪	–৭৭.১১	–২১৮.৮৭	
১৯৬৫–৬৬	১৮.৬১	–১৬৭.৬৭	–	–	–	
১৯৬৬–৬৭	১০.০৪	–১২৬.৭৬				
মোট	+ ৪৮৭.৮৭	– ১,৮০৪.৫৭				

উৎস ঃ ঐ, পৃঃ ৮।

উদ্ধৃতি ঃ রওনক জাহান, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৪।

টেবিল ৯

প্রতিরক্ষা ব্যয় (মিলিয়ন টাকায়)

(উল্লেখ্য যে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের প্রায় সবটাই ব্যয়িত হতো পশ্চিম পাকিস্তানে, কেননা তিনটি ফোর্সের হেড কোয়ার্টার, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদি ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জামাদি বরাবর পশ্চিম পাকিস্তানেই ছিল।

বছর	মোট ব্যয়	প্রতিরক্ষা ব্যয়	শতকরা হার
১৯৪৯–৫০	৮৫৬	৬২৫	৭৩
১৯৫৯–৬০	১,৮৪৭	১,০৪৪	৫৫
১৯৬৫–৬৬	৪,৪৯৮	২,৮৮৬	৬৪
১৯৬৬–৬৭	৩,৭৭৬	২,২৯৪	৬০

উৎস ঃ পাকিস্তান বাজেট ১৯৬৮–৬৯, ইসলামাবাদ ঃ মিনিস্ট্রি অব ফিনান্স, গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান।

টেবিল ১০

পাকিস্তান সরকারের মোট রাজস্ব ব্যয়, ১৯৫০–১৯৭০ ঃ

(কোটি টাকায়)

সময়	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫০–৫৫	১৭১০	৭২০০
১৯৫৫–৬০	২৫৪০	৮৯৮০
১৯৬০–৬৫	৪৩৪০	১২৮৬০
১৯৬৫–৭০	৬৪৮০	২২২৩০
	মোট ১৫০৭০	৫১২৫০

উৎস ঃ রিপোর্ট অব দি প্যানেল অব ইকোনমিস্টস্ অন দি ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, ইসলামাবাদ ঃ প্ল্যানিং কমিশন, গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান, ১৯৭০, টেবিল ২, পৃঃ ৬।

টেবিল ১১

(পাকিস্তানে বৈদেশিক আর্থনীতিক সাহায্যের ব্যবহার, ১৯৪৭–৭০

(কোটি টাকায়)

সাহায্যের ধরন	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান	কেন্দ্র	মোট
প্রকল্প ঋণ	৪১৭	৬০৮	১০৮	১১৩৩
প্রকল্প বহির্ভূত ঋণ	৪০৮	৬৭৩	৫৩	১১৩৪
পি. এল. ৪৮০ খাদ্য	৪৪৫	৭৯১	৫	১২৪১
গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ	৩৫২	৬২৩	১১	৯৮৬
প্রকল্প মঞ্জুরী ও কারিগরী সহায়তা	৫৬	১৪০	২০০	৩৯৬
পণ্যমঞ্জুরী	২৬৩	৫৭৫	১৫	৭৯৩
ইনডাজ বেসিন তহবিল	০	৭৫৬	০	৭৫৬
	১৯৪১	৪১০৬	৩৯২	৬৪৩৯

সূত্র ঃ রিপোর্টস্ অব এডভাইজরি প্যানেলস্ ফর দি ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, ইসলামাবাদ ঃ প্ল্যানিং কমিশন, গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান, ১৯৭০, টেবিল–৩, পৃঃ ২৭৯।

টেবিল ১২

পাকিস্তানের আমদানী ব্যয় (মিলিয়ন টাকায়) :

বছর	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭–৪৮	৪০	৩১৮
১৯৪৮–৪৯	২৮২	১১৭৭
১৯৪৯–৫০	৩৮৫	৯১২
১৯৫০–৫১	৪৫৩	১১৬৭
১৯৫১–৫২	৭৬৩	১৪৭৪
১৯৫২–৫৩	৩৬৬	১০১৭
১৯৫৩–৫৪	২৯৪	৮২৪
১৯৫৪–৫৫	৩২০	৭৮৩
১৯৫৫–৫৬	৩৬১	৯৬৪
১৯৫৬–৫৭	৮১৮	১৫১৬
১৯৫৭–৫৮	৭৩৫	১৩১৪
১৯৫৮–৫৯	৫৫৪	১০২৫
১৯৫৯–৬০	৬৫৫	১৮০৬
১৯৬০–৬১	১০১৪	২১৭৩
১৯৬১–৬২	৮৭৩	২২৩৬
১৯৬২–৬৩	১০১৯	২৮০১
১৯৬৩–৬৪	১৪৪৯	২৯৮১
১৯৬৪–৬৫	১৭০২	৩৬৭২
১৯৬৫–৬৬	১৩২৮	২৮৮০
১৯৬৬–৬৭	১৫৬৭	৩৬২৫
১৯৬৭–৬৮	১৩২৭	৩৩২৭
১৯৬৮–৬৯	১৮৫০	৩০৪৬
১৯৬৯–৭০	১৮১৩	৩২৮৫
১৯৪৭–৭০	২০,৩৬৭	৪৪,৩২৫

উৎস : মান্থলি ফরেন ট্রেড স্ট্যাটিস্টিকস্, করাচী সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস, গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান, জুন ১৯৭০, পৃঃ ১।

টেবিল ১৩

পাকিস্তানে আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্য (মিলিয়ন টাকায়)

	পূর্ব বাংলা থেকে রফতানী	পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানী
১৯৪৭-৪৮	১৯	১৪০
১৯৪৮-৪৯	৫০	২৩৫
৯৪৯-৫০	৬২	২৭২
১৯৫০-৫১	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত
১৯৫১-৫২	১৪৯	২১৮
১৯৫২-৫৩	১৫১	৩৮৭
১৯৫৩-৫৪	১৯৮	৩০৫
৯৫৪-৫৫	২৩৮	৩৩৪
৯৫৫-৫৬	২৪৪	৫৩২
৯৫৬-৫৭	২৬৯	৭০১
৯৫৭-৫৮	২৮৯	৬৮৬
৯৫৮-৫৯	৩৬২	৫৬৯
৯৫৯-৬০	৩৬৩	৮২৬
৯৬০-৬১	৪০২	৮৫৫
৯৬১-৬২	৪৭১	৯৫৭
৯৬২-৬৩	৫১১	৮৯৫
-৬৪	৫৪৪	৮৭৫
৪-৬৫	৬৫৫	১২০৯
৫-৬৬	৭৩৯	১৩২৫
-৬৭	৭৮৫	১২৩৩
৭-৬৮	৮৭১	১৩৮৫
-৬৯	৯৬৬	১৮০০
৭-৬৯	৮,২৩৮	১৫,৭৩৯

উৎসঃ টুয়েন্টি ইয়ারস অব পাকিস্তান, করাচীঃ পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৮, পৃঃ ২৯৫।

স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক ১৯৬৮, করাচীঃ সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিস, গভর্ণমেন্ট পাকিস্তান, ২৮৯। ইকোনমিক সার্ভে অব ইস্ট পাকিস্তান ১৯৬৯-৭০, ঢাকাঃ প্ল্যানিং ডিপার্ট-, গভর্ণমেন্ট অব ইস্ট পাকিস্তান, ১৯৬৯, পৃঃ ২২।

টেবিল ১৪

১৯৭০ এর মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ (মিলিয়ন টাকায়)

	এইচ, বি, এফ, সি,	এ, ডি, বি, পি,	আই, ডি, বি, পি	পিকিক
পূর্ব বাংলা	২৬৬	৫০৮	৯২২	৮৪০
পশ্চিম পাকিস্তান	৩৩১	৬৬২	১০৩৪	১৭৯৮

উৎস : পাকিস্তান ইকোনমিক সার্ভে, ১৯৬৯–৭০, ইসলামাবাদ : মিনিষ্টি অব ফিনান্স, গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান, ১৯৭০, পৃঃ ৭৬, ৭৮, ৮১, ৮৫। উল্লেখ্য যে, পূর্ব বাংলায় মঞ্জুরীকৃত ঋণের ভেতর একটা বিরাট অংশ অবাঙালিরা পেয়েছে।

টেবিল ১৫

পাকিস্তানে উন্নয়ন ব্যয় ১৯৫০–১৯৭০ (মিলিয়ন টাকায়) :

সময়	পূর্ব বাংলা			পশ্চিম পাকিস্তান		
	সরকারী খাত		বেসরকারী খাত	সরকারী খাত		বেসরকারী খাত
	পরিকল্পিত	অপরিকল্পিত		পরিকল্পিত	অপরিকল্পিত	
১৯৫০–৫৫	৭০০	৩০০	২০০০	২০০০		
১৯৫৫–৬০	১৯৭০	৭৩০	৪৬৪০	২৯৩০		
১৯৬০–৬৫	৬২৫০	৪৫০	৩০০০	৭৭০০	২৩১০	১০৭০০
১৯৬৫–৭০	১১০৬০		৫৫০০	১০১০০	৩৬০০	১৬০০০
১৯৫০–৭০	১৯৯৮০	৪৫০	৯৫৩০	২৪৪৪০	৫৯১০	৩১৬৩০

উৎসঃ রিপোর্ট অব প্যানেল অব ইকোনমিষ্টস্ অন ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, ইস–লামাবাদ

প্ল্যানিং কমিশন, গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান, ১৯৭০, পৃঃ ৬।

টেবিল ১৬

পাকিস্তানে জনস্বাস্থ্য সেবাসমূহ

	পূর্ব বাংলায় সংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যা
(ক) হাসপাতাল	৭৬	৩৯৩
(খ) ডিস্পেনসারী	৪৮৯	১,৭৫৪
(গ) হাসপাতাল ও ডিস্পেনসারীতে শয্যা সংখ্যা	৬,৯৮৪	২৬,২০০
(ঘ) জনসংখ্যা–শয্যা অনুপাত	৯,০০০ :১	২,০০০:১

উৎস : টুয়েন্টি ইয়ারস্ অব পাকিস্তান ইন স্ট্যাটিস্টিকস্, ১৯৪৭–৬৭, মিনিষ্ট্রি অব ইকোনমিক এ্যাফেয়ার্স, সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিস।

টেবিল ১৭

পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ঃ

	মোট আয়		পার্থক্য	মাথাপিছু আয়		বৈষম্য
	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	
১৯৪৯–৫০ (জি.এন. পি)	১২৩৬০	১২১০৬	+২৫৪	২৮৭	৩৩৮	১৮%
১৯৫৯–৬০ (জি.ডি.পি)	১৪৪৮৯	১৭২৫৩	–২৭৬৪	২৭৮	৩৩৬	৩১%
১৯৬৭–৬৮	২০২৩৫	২৮৬৫২	–৮৪১৭	৩০২	৫৩০	৭৫%

উৎসঃ ইকোনমিক সার্ভে অব ইস্ট পাকিস্তান ১৯৬৯–৭০ ঢাকাঃ প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট, গভর্ণমেন্ট অব ইস্ট পাকিস্তান, ১৯৬৯।

টেবিল ১৮

পাকিস্তানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৩০৮	৩৯৪১৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০৬৪	৪৪৭২
বিভিন্ন ধরনের কলেজ	১৬২	২৭১
পেশাভিত্তিক কলেজ	৯	১৭
বিশ্ববিদ্যালয়	৪	৬
বিদ্যালয় বৃদ্ধির মাত্রা	৫ গুণ	৩০ গুণ

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, নিউ দিল্লী ঃ এক্সটার্নাল এ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, ১৯৭১, ভলিয়্যুম–১, পৃঃ ১৯।

টেবিল – ১৯

কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে পূর্ব বাংলা–পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিনিধিত্ব, উচ্চতর র‍্যাঙ্ক, ১৯৫৫

পদ	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব বাংলা (সমগ্রের শতকরা)
সেক্রেটারী	০	১৯	০
জয়েন্ট সেক্রেটারী	৩	৩৮	৭.৩
ডেপুটি সেক্রেটারী	১০	১২৩	৭.৫
আণ্ডার সেক্রেটারী	৩৮	৫১০	৭.০

সূত্রঃ কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলী অব পাকিস্তান, ডিবেটস্, অফিসিয়াল রিপোর্ট, সেকেণ্ড এসেম্বলী, ভলিয়্যুম–১, নম্বর, ১–৬৭ (জুলাই ৭, ১৯৫৫–ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৫৬), ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৫৬, পৃঃ ১৮৪৪।

টেবিল ২০

পাকিস্তানের সামরিক অফিসারের সংখ্যা, ১৯৫৫

সার্ভিস	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
সেনাবাহিনী	১৪	৮৯৪
নৌবাহিনী	৭	৫৯৩
বিমান বাহিনী	৬০	৬৪০

উৎস : ডন, করাচী, ৮ই জানুয়ারী ১৯৫৫।

উদ্ধৃতি : রওনক জাহান, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫।

টেবিল ২১

সামরিক সার্ভিসগুলোতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব, ১৯৬৩, (সমগ্রের শতকরা)

সার্ভিস	কমিশণ্ড অফিসার	জুনিয়র কমিশণ্ড অফিসার	ওয়ারেন্ট অফিসার	অন্যান্য পদ
সেনাবাহিনী	৫%	৭.৪%		৭.৪%
বিমান্ বাহিনী	১৭%		১৩.২%	২৮.০%
	ব্রাঞ্চ অফিসার	চীফ পেটি অফিসার	পেটি অফিসার	নাবিক ও নিম্ন পদস্থ
নৌবাহিনী	৫%	১০.৪%	১৭.৩%	২৮.৮%

উৎস : ন্যাশনাল এসেম্বলী, ডিবেটস্, অফিসিয়াল রিপোর্ট, করাচী: গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান ম্যনেজার অব পাবলিকেশন, গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান প্রেস, সেশন–১থেকে ৯ (৮ই জুন ১৯৬২ থেকে ২২শে জানুয়ারী ১৯৬৫), ৮ই মার্চ ১৯৬৩, পৃঃ ৩০–৩১।

টেবিল ২২

সত্তর দশকের শুরুতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব এবং সেসবে বৈষম্য

	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস	১৬%	৮৪%
ফরেন সার্ভিস	১৫%	৮৫%
সামরিক বাহিনী	৫%	৯৫%
সেনাবাহিনীর জেনারেল	১ জন	১৬ জন
সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা	২০,০০০ জন	৫০০,০০০ জন
বিমান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা	২৮০ জন	৭০০০ জন

সূত্র : বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, নিউ দিল্লী: এক্সটার্নাল এ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, ১৯৭১, ভলিয়ুম–১, পৃঃ ২০।

টেবিল ২৩

১৯৬৮-৬৯ সালে সরকারের কতকগুলো বিভাগে প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের ভেতর পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব :

বিভাগ	১৯৬৮				১৯৬৯			
	পূর্ব বাংলা		পশ্চিম পাকিস্তান		পূর্ব বাংলা		পশ্চিম পাকিস্তান	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
ইকনোমিক এ্যাফেয়ার্স	১৬	৩৬.০	২৮	৬৪.০	২০	৪৪.০	২৯	৫৯.০
কমার্স	১৯	৩৮.০	৩৩	৬২.০	২০	৩৩.০	৪১	৬৭.০
ফিনান্স	১০	২৯.০	২৭	৭১.০	১২	৩০.০	৩০	৭০.০
এগ্রিকালচার	৪	১৩.০	২৬	৮৭.০	৬	১৭.০	২৮	৮৩.০
ইণ্ডাস্ট্রিজ	৯	২৮.০	২৩	৭২.০	১০	৩২.০	২১	৬৮.০
কেবিনেট ডিভিশন	৩	১৩.০	২১	৮৭.০	৪	১৬.০	২২	৮৪.০
স্টাবলিশমেন্ট ডিভিশন	১২	৩২.০	২৫	৬৮.০	১১	৩০.০	২৫	৭০.০
প্ল্যানিং	২১	৩০.০	৫১	৭০.০	২৮	২৯.০	৬৭	৭১.০
ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং	৫	২৫.০	১৫	৭৫.০	৬	২৬.০	১৭	৭৪.০
লেবার এ্যাণ্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার	৪	২৮.০	১০	৭২.০	৫	৩৩.০	১০	৬৭.০
ডিফেন্স	৪	১০.০	৩৫	৯০.০	৫	১৩.০	৩১	৮৭.০

এই টেবিলে শতকরা হিসাব রাউণ্ড ফিগার করা হয়েছে।

উৎসঃ গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান, স্ট্যাবলিশমেন্ট ডিভিশন। সিভিল লিস্ট অব ক্লাস ওয়ান অফিসার্স সার্ভিং আণ্ডার গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান, ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯।

ওপরে প্রদত্ত টেবিলগুলো থেকে তৎকালীন পাকিস্তানে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার বৈষম্যমূলক সম্পর্কের স্পষ্ট তুলনামূলক অবস্থা লক্ষণীয়। টেবিল-১ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের পুরো সময়টা জুড়ে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হারের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা বেশী অবদান রেখেছে। যেমন, ১৯৪৭-৫৫ সময়ে পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হার ছিল ৬% অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ১.৭%। ১৯৫৫-৬০ পর্যায়ে এটা ছিল যথাক্রমে ৭.৬% এবং ৪%। ১৯৬০-৬৫ পর্যায়ে এটা ছিল ৪.৩% এবং মাত্র ০.৯%। অথচ এই দীর্ঘ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলা অপেক্ষা সবকিছুই বেশী পেয়েছে। টেবিল-২ অনুযায়ী ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সময়টাতে পূর্ব বাংলা রফতানী

থেকে আয় করেছে ২৫,৫৫৯ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যদিকে ঐ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান আয় করেছে ২১,১৩৭ মিলিয়ন টাকা। এভাবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, রফতানী আয়সহ প্রায় ক্ষেত্রে অধিক অবদান রাখা সত্ত্বেও শতকরা ৫৬ ভাগ জনসংখ্যাবিশিষ্ট সংখ্যাগুরু পূর্ব বাংলা ভয়ানকভাবে শোষিত হয়েছে, বৈষম্য–বঞ্চনার শিকার হয়েছে।

যেমন, টেবিল–৩ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারে রাজস্ব ব্যয়ের বন্টন দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে ১৯৪৭–৪৮ থেকে ১৯৬০–৬১ পর্যায়ে বাণিজ্যিক বিভাগগুলোর কার্যনির্বাহ ব্যয়সহ রাজস্ব ব্যয় হিসেবে পূর্ব বাংলা যথাক্রমে সমগ্র খরচের শতকরা ১২ ভাগ ও ৫ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তান সমগ্র খরচের যথাক্রমে শতকরা ৪৫ ভাগ ও ৩৪ ভাগ পেয়েছে। টেবিল–৪ অনুযায়ী ১৯৪৭–৫৮ থেকে ১৯৫৬–৬০ পর্যায়ে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বন্টনের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্য হিসেবে পেয়েছে সমগ্রের শতকরা ১৭ ভাগ এবং মার্কিন পণ্য সাহায্য সমগ্রের শতকরা ৩০ ভাগ। এসময় পশ্চিম পাকিস্তান বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্য হিসেবে পেয়েছে সমগ্রের শতকরা ৬২ এবং মার্কিন পণ্য সাহায্য সমগ্রের শতকরা ৬৪ ভাগ। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার আলাদাভাবে নিয়েছে সমগ্রের শতকরা ২১ ভাগ বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্য এবং সমগ্রের শতকরা ৬ ভাগ মার্কিন পণ্য সাহায্য। আবার, কেন্দ্রীয় সরকার নিজের অংশ হিসেবে নেয়া সামগ্রের শতকরা ২১ ভাগ বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্য এবং সমগ্রের শতকরা ৬ ভাগ মার্কিন পণ্য সাহায্য পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করায় পূর্ব বাংলার খুব সামান্য প্রাপ্তির তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে আপাতদৃষ্টে প্রদত্ত হিসেব অপেক্ষা আরো অনেক বেশি পেয়েছে। অর্থাৎ, তারা বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্য সমগ্রের শতকরা ৮৩ ভাগ এবং মার্কিন পণ্য সাহায্য সমগ্রের শতকরা ৭০ ভাগ শেষ বিচারে লাভ করেছে। টেবিল–৫ অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যের আসল সম্পদ সরবরাহের ব্যাপারে ১৯৬১–৬৫ এর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলা পেয়েছে ২,৫৮২ মিলিয়ন টাকা, যেক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছে ৭,৬৭৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৬৫–৭০ তৃতীয় পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলা ৪,৪৮১ মিলিয়ন টাকা পেয়েছে ,অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছে ৬,৯০৪ মিলিয়ন টাকা। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক প্রাপ্ত এই অঙ্কের সঙ্গে ইনডাজ বেসিন রিপ্লেসমেন্ট ওয়ার্কস্–এর ১,৯০০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক সাহায্য যা হিসেব বহির্ভূতভাবে রাখা হয়েছিল তা যোগ করলে পশ্চিমাঞ্চলের প্রকৃত প্রাপ্তি যে আরো অনেক বেশী তা সহজেই ধরা পড়ে। টেবিল–৬ অনুযায়ী ১৯৪৭–৪৮ থেকে ১৯৬০–৬১ পর্যায়ে পূর্ব বাংলা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিনিয়োগ হিসেবে পেয়েছে ১৭২ কোটি টাকা, ঋণ বাবদ পেয়েছে ১৮৪ কোটি টাকা এবং সাহায্য বাবদ মঞ্জুরী পেয়েছে ৭৬ কোটি টাকা। অপরদিকে একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান বিনিয়োগ হিসেবে পেয়েছে ৪৩০ কোটি টাকা, ঋণ বাবদ পেয়েছে ২২৪ কোটি টাকা এবং সাহায্য বাবদ মঞ্জুরী ১০১ কোটি টাকা। টেবিল–৭ অনুযায়ী ১৯৪৭–৫৮ পর্যায়ে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্যিক ভারসাম্য

হিসাব থেকে দেখা যায় যে, বৈদেশিক ব্যালান্সের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলায় সর্বদাই উদ্বৃত্ত থাকছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি থাকছে। ওদিকে আন্তঃঅঞ্চল বাণিজ্যের ব্যাপারে অসম নীতির ফলে এবং সামগ্রিক ব্যালান্স-এর প্রশ্নে পূর্ব বাংলার অবস্থা প্রতিকূল হয়ে উঠছে। ৮নং টেবিলে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৫৮-৬৭ পর্যায়ের বাণিজ্যিক ভারসাম্যের হিসেবে দেয়া হয়েছে। এখানেও পূর্ব বাংলার অবস্থা প্রতিকূল হচ্ছে বাণিজ্য ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক এর ওপর চাপিয়ে দেয়া অন্যায্য ও অসম নীতির ফলে। ৯ নং টেবিল প্রতিরক্ষা ব্যয়ের হিসেব দেয়া হয়েছে। ১৯৪৯-৫০ সালে সরকারের মোট ব্যয়ের শতকরা ৭৩ ভাগ, ১৯৫৯-৬০ সালে ৫৫ ভাগ, ১৯৬৫-৬৬ সালে ৬৪ ভাগ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ৬০ ভাগ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের সবটাই প্রায় ব্যয়িত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে, কেননা তিনটি ফোর্সের হেড কোয়ার্টারসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদি, অধিকাংশ সদস্য ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জামাদি বরাবরই পশ্চিম পাকিস্তানেই ছিল। ১০নং টেবিল অনুযায়ী ১৯৫০-৭০ পর্যায়ের পাকিস্তান সরকারের মোট রাজস্ব ব্যয়ের প্রশ্নে বৈষম্যনীতি ছিল প্রবলভাবে কার্যকর। এই কুড়ি বছরে পূর্ব বাংলার জন্যে মোট ব্যয় হয়েছে ১৫০৭০ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় হয়েছে ৫১২৫০ কোটি টাকা। টেবিল ১১ তে দেখানো হয়েছে যে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সালের ভেতর পাকিস্তানে বৈদেশিক আর্থনীতিক সাহায্যের ব্যবহার হয়েছে এরূপঃ পূর্ব বাংলা সর্বমোট ১৯৪১ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তান ৪১০৬ কোটি টাকা। এছাড়া কেন্দ্রের নামে নেয়া আরো ৩৯২ কোটি টাকাও পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছে।

১২নং টেবিলে দেখানো হয়েছে যে পাকিস্তানের আমদানী ব্যয়ের প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ ছিল অনেক বেশী। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ভেতর পূর্ব বাংলা সর্বমোট আমদানী ব্যয় করেছে, ২০,০৬৭ মিলিয়ন টাকা, অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান সর্বমোট আমদানী ব্যয় করেছে ৪৪,৩২৫ মিলিয়ন টাকা। টেবিল-১৩ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৯ সালের ভেতর পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানী করেছে, ৮,২৩৮ মিলিয়ন টাকার পণ্য। অপরদিকে এসময়ে তাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানী করতে হয়েছে ১৫,৭৩৯ মিলিয়ন টাকার পণ্যাদি। ১৪ নং টেবিলে দেখানো হয়েছে যে ১৯৭০ এর মার্চ পর্যন্ত হাউস বিল্ডিং ফিনান্স কর্পোরেশন, এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান, ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন— এ ক'টি প্রতিষ্ঠান পূর্ব বাংলায় সর্বমোট ঋণ মঞ্জুর করেছে ২৪৯৬ কোটি টাকার, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ঋণ মঞ্জুর করেছে ৩৮২৫ কোটি টাকার। ১৬ নং টেবিলে দেখানো হয়েছে যে, পাকিস্তানে জনস্বাস্থ্য সেবাসমূহের প্রশ্নে বৈষম্য ছিল

অত্যন্ত প্রকট। যেমন, ১৯৪৭-৬৭ পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব বাংলায় হাসপাতাল ছিল ৭৬টি, পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৬৯৩ টি। এতে করে জনসংখ্যানুয়ায়ী হাসপাতালে শয্যার অনুপাত ছিল ৯,০০০ জনঃ ১টি শয্যা, অন্যদিকে পশ্চিমাঞ্চলে ছিল ২,০০০ জন ঃ ১টি শয্যা।

১৭ নং টেবিলে পাকিস্তানে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং এর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখানো হয়েছে। ১৯৪৯-৫০ সালে (জি.এন.পি) এই বৈষম্য ছিল ১৮% ১৯৫৯-৬০ সালে (জি. ডি.পি) এই বৈষম্য ছিল ৩১% এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে এই বৈষম্য দাঁড়ায় ৭৫%-এ। ১৮নং টেবিল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, তৎকালীন পাকিস্তানের জীবনকালে পূর্ব বাংলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বেড়েছে ৫ গুণ, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তনে তা বেড়েছে ৩০ গুণ। এখানে উল্লেখ্য যে, পূর্ব বাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানে তা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯ নং টেবিলে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে পূর্ব বাংলার ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব প্রশ্নে প্রকট বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, ১৯৫৫ সালে সেক্রেটারী পর্যায়ে পূর্ব বাংলা ছিল ০ (শূন্য), যেক্ষেত্রে পশ্চিমাঞ্চলের ছিল ১১ জন। ২০নং এবং ২১নং টেবিলে সামরিক বাহিনীতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্বহীনতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ২২ নং টেবিলে সত্তর দশকের শুরুতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব এবং সেক্ষেত্রে প্রকট বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এসময় কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব যেখানে ছিল ১৬% অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৮৪ %। ফরেন সার্ভিসে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল ১৫% পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৮৫%। সামরিক বাহিনীতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল ৫% পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৯৫ %। ২৩নং টেবিল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ১৯৬৮-৬৯ সালে সরকারের কতকগুলো বিভাগের প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের ভেতর পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল নিম্নরূপ ঃ ১৯৬৮ সালে কমার্স ডিভিশনে পূর্ববাংলা ৩৮ % পশ্চিম পাকিস্তান ৬২%। ১৯৬৯ সালে এটা যথাক্রমে ৩৩ % এবং ৬৭ %। ইন্ডাস্ট্রিজ ডিভিশনে ১৯৬৮ সালে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল ২৮% পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৭২%। ১৯৬৯ সালে এটা ছিল যথাক্রমে ৩২ % এবং ৬৮%। ডিফেন্স ডিভিশনে ১৯৬৮ সালে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল ১০ % পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৯০%। ১৯৬৯ সালে এটা হয় যথাক্রমে ১৩ % এবং ৮৭ %।

এছাড়া তারিক আলী 'পাকিস্তান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক' এবং 'পাকিস্তান ইকনোমিক সার্ভে'-এর বিভিন্ন বছরের হিসাবগুলো থেকে একটা বৈষম্য চিত্র তুলে ধরেছেন।[৩]

এতে দেখা যায় ঃ

টেবিল ২৪

বিভিন্ন বিষয়	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
জনসংখ্যা (১৯৭০ সাল)	৭০ মিলিয়ন	৬০ মিলিয়ন
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ		
প্রথম	৩২%	৬৮ %
দ্বিতীয়	৩২%	৬৮%
তৃতীয়	৩৬%	৬৪%
বৈদেশিক সাহায্যের বরাদ্দ	২০–৩০%	৭০–৮০%
রফতানী আয়	৫০–৭০%	৩০–৫০%
আমদানী ব্যয়	২৫–৩০%	৭০–৭৫%
বাঙালি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান	১১%	
সিভিল সার্ভিসে চাকুরী	১৬–২০%	৮০–৮৪%
সামরিক বাহিনীতে চাকুরী	১০%	৯০%
১৯৪৮–৪৯ থেকে ১৯৬৮–৬৯ এর ভেতর পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ হস্তান্তর	৩১,১২০ মিলিয়ন রুপী বা টাকা	
মাথাপিছু আয় (সরকারী হিসাব)		৪১৯.০০ টাকা
১৯৬৪–৬৫	২৮৫.৫ টাকা	
১৯৬৮–৬৯	২৯১.৫ টাকা	৪৭৩.৪ টাকা
মাথাপিছু আয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য (সরকারী হিসাব)		
১৯৫৯–৬০	৩২ %	
১৯৬৪–৬৫	৪৭ %	
১৯৬৮–৬৯	৬২ %	
মাথাপিছু আয়ে প্রকৃত পার্থক্য ১৯৬৮–৬৯		৯৫%
গড় জীবনমানে প্রকৃত পার্থক্য ১৯৬৮–৬৯		১২৬ %
শিল্প শ্রমিকদের দ্বারা আয়কৃত অর্থ খাদ্যের জন্যে	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
ব্যয়ের শতকরা হার (১৯৫৫–৫৬)	৬৯–৭৫ %	৬০–৬৩%

বিশ্লেষিত ২৩টি টেবিল এবং তারিক আলী প্রদত্ত হিসাব (২৪ নং টেবিল) থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের ভেতর পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম

পাকিস্তানের ভেতর আঞ্চলিক আর্থনীতিক বৈষম্য ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এ সময় সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনীতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কম থাকায় যাবতীয় সিদ্ধান্ত, সুযোগ ও বরাদ্দ পশ্চিমাঞ্চলের পক্ষে চলে যায়। এভাবে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা শোষিত হতে হতে পাকিস্তানের কাঠামোয় এক অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় কেবল আঞ্চলিক বৈষম্যই সৃষ্টি হয় নি। আঞ্চলিক বৈষম্যের ভেতর দিয়ে শ্রেণী বৈষম্যও দেখা দেয়। এই শ্রেণী বৈষম্য পাকিস্তানী পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত খাতে আর্থনীতিক উন্নয়নের নীতি এবং লুটেরা পুঁজিপতি শ্রেণী সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে চরম আকার ধারণ করে। শ্রেণীবৈষম্যের বিষয়টি নিয়ে এরপর আলোচনা করা যাবে। এখন বলা যায় যে, পাকিস্তানী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এর চব্বিশ বছরের জীবন প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার ওপর একাধারে আঞ্চলিক ও শ্রেণীগত শোষণ চালিয়েছে। পূর্ববাংলার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও বিকৃত পুঁজিবাদী আর্থনীতিক নীতি সৃষ্ট ব্যবস্থার তাড়নায় শ্রেণীগত শোষণ ও বৈষম্য তীব্রতা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। এর ফলে পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিকের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তারা দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে। এভাবে আঞ্চলিক ও শ্রেণীগত বৈষম্যের যুগপৎ চাপের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার জনমণ্ডলীর জীবনে যে আর্থনীতিক শোষণ-বঞ্চনা নেমে আসে, সে পরিস্থিতি ও বাস্তবতা-সৃষ্ট রাজনীতিতেই সম্পদের পুনর্বন্টন, সাম্যনীতি ও শোষণের চির অবসান দাবীর ভেতর দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের স্বপ্ন এতদঞ্চলের মানুষকে নজীরবিহীনভাবে উজ্জীবিত করে। ১৯৬৮-৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচনী সংগ্রাম, ১৯৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

৩

শ্রেণী শোষণ এবং পূর্ববাংলার কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের অবস্থা

পাকিস্তানের পুঁজিবাদী কাঠামোর যে একচেটিয়া মুনাফা ও মুষ্টিমেয় পোষণ নীতি অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার ফলে উপকৃত হয় ও সমৃদ্ধ হয় মূলত ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ভূস্বামী ও উচ্চ পেশাজীবী শ্রেণীগুলো। আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়—শোষিত অবদমিত এবং দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়, তারা হচ্ছে কৃষক, শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষ।

তৎকালীন পাকিস্তানের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের সর্ববৃহৎ অংশ আসত কৃষি থেকে। শ্রমজীবী শক্তির শতকরা ৭৫ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত ছিল এবং শতকরা ৯০ জন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছিল কৃষি-নির্ভর। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ কৃষি থেকে আসত। ষাটের দশকের শুরুতেও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৪ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত ছিল। পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬৯-৭০ সালেও দেশে ৩ কোটিরও বেশী কৃষক ছিল। এহেন কৃষিভিত্তিক কাঠামোয় পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ববাংলার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। পশ্চিম পাকিস্তানে জমির গড় আয়তন ছিল ৭.৭ একর এবং পূর্ব বাংলায় গড় আয়তন ছিল ৩.২ একর। পূর্ব বাংলায় শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী জমি উপবিভাগ ও ভাঙনের ফলে 'অর্থনৈতিক জোত' বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছিল।[৪]

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামীণ পারিবারিক খরচের প্রায় ৬৩% ব্যয় হত খাদ্য ক্রয়ে। অপরদিকে পূর্ব বাংলায় গ্রামীণ পারিবারিক খরচের প্রায় ৬৭% ব্যয় হত খাদ্য ক্রয়ে। এর ভেতর চাল ক্রয় খাতে খরচই ছিল সর্বোচ্চ অর্থাৎ ৫৭%। এখানকার কৃষক

পরিবারের আয়ের একটা মোটা অংশই চলে যেতো প্রায় চিরস্থায়ী ঋণ পরিশোধ করতে। এক নির্বাচিত জরিপে দেখা যায় এতদঞ্চলের শতকরা ৬৬ থেকে ৮৭ ভাগ পরিবারই ঋণগ্রস্ত। এদের ভেতর ৪১–৪৯% সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এ হার ক্রমবর্ধমান অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।[৫] তদুপরি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ব্যক্তিগত খাতের মাধ্যমে শিল্পায়ন ও আর্থনীতিক উন্নয়নের যে নীতি গ্রহণ করে তার ফলে গরীব কৃষকেরা আরো দুর্দশাগ্রস্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়তে থাকে। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার অবস্থা খুব খারাপ হয়। যেহেতু পাকিস্তানী নতুন উদ্যোক্তাদের এমন কোন পুঁজি ছিল না এবং বিশাল সঞ্চয় জমা করতে সক্ষম এমন কোনো দেশীয় ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানও প্রথম দিকে ছিল না এবং সেই সঙ্গে বৈদেশিক সাহায্য কিংবা অভ্যন্তরীণ কর কোনোদিক থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল না, সেহেতু রাজস্ব ও ব্যবসা বাণিজ্য নীতি মালার মাধ্যমে কৃষকদের বিশেষত পূর্ব বাংলার কৃষকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক উদ্বৃত্ত আদায় করে তা শিল্পপতিদের দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামো অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহৃত তৎকালীন পূর্ব বাংলাকে শোষণ এবং ব্যক্তিগত খাতের আর্থনীতিক নীতির মাধ্যমে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ন ও এর কেন্দ্রীভবনের জন্যে তিনটি লক্ষ্য গ্রহণ করে বলে রিচার্ড ন্যাশনস্ দেখিয়েছেন।[৬] তাঁর মতে নীতিগুলো ছিল প্রথমত, পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার বিদেশে মালামাল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রার বদলে সরকার নির্দিষ্ট হারে পাকিস্তানী মুদ্রা নিতে চাষীদের বাধ্য করে। দ্বিতীয়ত, আবশ্যকীয় আমদানীর মূল্য পরিশোধের জন্যে পূর্ব বাংলার কৃষি কর্তৃক অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার কেন্দ্রীয়করণ। মূলত পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ী শ্রেণীকে আমদানী লাইসেন্স ও সরকারী বৈদেশিক মুদ্রা দেয়া হয়েছিল। এসব লাইসেন্স ভোগ ও শিল্প সরঞ্জাম আনয়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব বাংলা এভাবে সরকারের বিদেশী মুদ্রা কেন্দ্রীয়করণ ও আমদানী লাইসেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তন ও অসম সুযোগের নীতি গ্রহণের ভেতর দিয়ে কেবল ভর্তুকিই দিতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানী আমদানীকারকগণকে। তৃতীয়ত, অভ্যন্তরীণ শিল্পোৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্যে গ্রামীণ পণ্যের পুনরুৎপাদন–প্রক্রিয়া। পূর্ববাংলায় সস্তা শ্রম ব্যবহার করে অধিক মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে পাট, তুলা ইত্যাদি মজুরী শ্রমিক নির্ভর শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করে পাকিস্তানী বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী।

একই রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতর থেকেও পূর্ব বাংলাকে এভাবে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত করার প্রক্রিয়ায় এতদঞ্চলের অর্থনীতিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির অধীনস্থ করা হয়েছে এবং একদিকে পূর্ববাংলার সম্পন্ন কৃষকদের উদ্বৃত্ত ও অন্যদিকে দরিদ্র কৃষকদের সস্তা শ্রম— উভয়দিকেই শোষণ করা হয়েছে। প্রথম দিককার পুঁজি সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠী নিপীড়ক রাষ্ট্র ও সরকারী কাঠামোর সহায়তায় পাকিস্তানী মুদ্রার (রুপী) মূল্যমানের অতিবর্ধন, কৃষি উৎপাদনের অব

মূল্যায়ন, বাধ্যতামূলকভাবে শস্য সামগ্রী সংগ্রহ, কৃষি উৎপাদনের ওপর ব্যাপক হারে রপ্তানী কর আরোপসহ নানা পন্থা অবলম্বন করে। আবার মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, আমদানী লাইসেন্স, শুল্ক সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যবস্থা নিয়ে দেশে তৈরি শিল্প সামগ্রীর জন্যে বহির্বিশ্বের বাজার অপেক্ষা তিন-চারগুণ বেশী মূল্য দিতে কৃষকদের বাধ্য করা হয়। এসবের ফলে মূলত কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করে বিশাল সম্পদ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির হাতে পাচার করার ব্যবস্থা করা হয়। কীথ বি. গ্রিফীন হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, বছরে ৩,৬০০ মিলিয়ন রুপী বা টাকা এভাবে কৃষক সমাজের কাছ থেকে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের হাতে চলে যেত।[৭] অপর একজন গবেষকের মতে কৃষি থেকে এই সম্পদ পাচারের পরিমাণ আরো বহুগুণ বেশী, যদি তা স্থানীয় মূল্যে বিচার না করে বিশ্ববাজারের মূল্যে হিসেব করা হয়। তাঁর মতে এই পাচার বছরে ৫,৮১৫ মিলিয়ন রূপীর কম ছিল না। তিনি আরো বলেন যে, প্রকৃত পাচার কৃষি উৎপাদনের মূল্যের শতকরা ৬৭ ভাগ পর্যন্ত ছিল।[৮] একজন সোভিয়েত গবেষক সের্গেই স্তেপানোভিচ বারানভ তৎকালীন পূর্ব বাংলার অর্থনীতি সম্পর্কিত তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাতেও দেখিয়েছেন যে, পূর্ব বাংলার কৃষি ছিল তৎকালে প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ব্যবসায়ী ও লগ্নি পুঁজিই এই শোষণের কাজটা করত। আর যেহেতু এই ব্যবসা ও লগ্নিপুঁজির কর্তৃত্ব ছিল সেকালে ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে, সেহেতু একদিকে পূর্ব বাংলার কৃষক সমাজ শ্রেণী শোষণের শিকার হয় এবং অন্যদিকে পূর্ববাংলার উঠতি পুঁজিপতিদের নিজস্ব পুঁজি সঞ্চয়ন সম্ভাবনা খর্ব হয় এবং সর্বোপরি এতদঞ্চল শ্রেণী শোষণের সাথে সাথে আঞ্চলিক শোষণের শিকার হয়।[৯]

বস্তুত, তৎকালীন পূর্ব বাংলার অর্থনীতিতে এর কৃষি সমাজের ওপর সংঘটিত শ্রেণীশোষণ এবং কৃষক সমাজ ও এখানকার উঠ্তি বুর্জোয়দের বঞ্চিত করে আঞ্চলিক শোষণ— এই দ্বিবিধ শোষণ ছিল একই মেট্রোপলিটান অর্থনীতির স্বার্থে পরিচালিত। শ্রেণী ও আঞ্চলিক শোষণের মূল চালিকা শক্তি ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলার ওপর চেপে-বসা পাকিস্তানী কাঠামোর অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়াটি।

এর ফলে পূর্ব বাংলার কৃষকদের মাথা পিছু আয় এবং ভোগের পরিমাণ বছরের পর বছর ধরে মারাত্মকভাবে কমে যেতে থাকে। তারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে। একজন গবেষক দেখিয়েছেন যে, পঞ্চাশের দশকে কৃষকদের গড় মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। ষাট দশকে এটা খানিকটা বাড়লেও দেখা যায় যে, ১৯৬৩-৬৪ সালে যা বেড়েছে, ১৯৪৯-৫০ সালেও তার চেয়ে বেশি ছিল। ১৯৫৯-৬০ সালের মূল্য ধরে নিয়ে ঐ গবেষক দেখতে পান যে ১৯৬৩-৬৪ সালে গ্রামীণ মাথাপিছু আয় ছিল ২৬৮ টাকা, অথচ ১৯৪৯-৫০ সালে সেটা ছিল ২৭৫ টাকা।[১০] কে. বি.

ও ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৬৪-৬৫ পর্যায়ের ভেতর কৃষকদের মাথা পিছু আয় ও মাথাপিছু প্রতিদিনকার খাদ্য গ্রহণের (আউন্স হিসেবে) হিসেব থেকে দেখিয়েছেন যে, এ

উভয়টিতে দ্রুত ক্রমহ্রাসমান অবস্থা চলছিলো।[১১] আরেকজন গবেষক দেখিয়েছেন যে, তৎকালীন বছরগুলোতে কৃষকেরা প্রায় অভুক্ত অবস্থায়ই থাকার মতো খাদ্য পাচ্ছিল এবং জাতিসঙ্ঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশের কৃষকদের দৈনন্দিন ক্যালরী গ্রহণের মাত্রা ব্যাপক হারে নেমে এসেছিল।[১২] যদিও পাবলিক ল ৪৮০ এর মাধ্যমে পাকিস্তান ব্যাপক পরিমাণ মার্কিন খাদ্য সাহায্য পেয়েছিল, তথাপি তার খুব কমই পেয়েছিল কৃষক সমাজ, বিশেষত পূর্ব বাংলার কৃষকেরা। পূর্ব বাংলার কৃষকদের আয় অপেক্ষা শহরে বসবাসকারীদের আয় এসময় কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। খাদ্য ও কৃষি কমিশন জানিয়েছিল যে এ সময় (১৯৬০–এ) অ–কৃষক জনতার মাথাপিছু আয় যেখানে গড়ে ছিল ৪৩৩ টাকা, সেখানে কৃষকদের মাথাপিছু আয় ছিল ১৯১ টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও ষাট দশকের শেষ দিকে পঞ্চাশ দশকের তুলনায় তৎকালীন সরকার কৃষিক্ষেত্রে খানিকটা নজর দিয়েছিল এর উন্নতির জন্য, তথাপিও সেসব ব্যবস্থাদি নেয়া হয়েছিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে এবং তথাকার ধনী কৃষকরাই মূলত এর সুফল ভোগ করেছিল। কৃষিসামগ্রী ক্রয়, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, আধুনিক চাষাবাদের জন্যে বৃহদাকারের আর্থনীতিক জোত বা ভূমিখণ্ডের মালিকানা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতি ও ঋণ লাভে ধনী কৃষকদের প্রভাব ইত্যাদি সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হয়েছিল ক্ষুদে, গরীব ও ভূমিহীন কৃষক, বিশেষত তৎকালীন পূর্ববাংলার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সাধারণ।

এদিকে তৎকালীন পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার শিল্পশ্রমিক ও অন্যান্য মজুরী শ্রমিকরাও ব্যাপকভাবে শ্রেণী শোষণের শিকার হয়। ১৯৬৯–৭০ সালে পাকিস্তানের মোট শ্রম শক্তি ছিল ৪২.৩ মিলিয়ন। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী সমগ্র পাকিস্তানে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭.৭ মিলিয়ন। এর ভেতর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৫.১৩ মিলিয়ন এবং পূর্ব বাংলায় ছিল ২.৫৭ মিলিয়ন।[১৩] পাকিস্তানের সমগ্র সময়টাতে এদের মজুরী তেমন একটা বাড়ে নি। উপরন্তু, ১৯৫৯–৬০ এর হিসেবে সাধারণ ভোগের সামগ্রীর দ্রব্যমূল্যমান ১৯৬৮–৬৯ সালে ১০০ থেকে ১৪০ এ উঠে গেলে সত্তর দশকের প্রারম্ভে এসে দেখা যায় যে, শিল্প শ্রমিক ও অন্যান্য মজুরী শ্রমিকদের প্রকৃত আয় পূর্বাপেক্ষা কমে গেছে।[১৪] এসময় একটা গবেষণায় দেখা যায় যে, তৎকালীন পাকিস্তানের মজুরী শ্রমে নিয়োজিত পরিবারগুলোর গড় আয়ের প্রশ্নে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা নীচে ও পিছিয়ে ছিল।[১৫] এ. আর. খান দেখিয়েছেন যে, ষাট দশকের মাঝ নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানে একটা গড় মজুরী আয়কারী পরিবারের মাথাপিছু আয় ছিল ২০৭.৯ টাকা এবং পূর্ব বাংলায় তা ছিল ২০৩.৭ টাকা মাত্র।[১৬]

পূর্ব বাংলায় বিশেষ করে শিল্প শ্রমিকদের এই নিম্ন মজুরী ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাওয়া এবং তাদের ওপর ক্রমবর্ধমান শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীবনমান নেমে যাওয়ার পেছনে মূল কারণগুলির ভেতর এতদঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে ও গ্রামাঞ্চলে বিরাট পরিমাণ

স্থায়ী অব্যবহৃত শ্রম শক্তির উপস্থিতি ছিল অন্যতম। উদ্বৃত্ত শ্রমের এই বিরাট বাহিনী থাকায় শিল্পপতিরা তাদের নিদারুণ প্রয়োজন ও দারিদ্র্যের সদ্ব্যবহার করত এবং অত্যন্ত সস্তায় শ্রম শক্তির যোগান পেত। এতদ্ব্যতীত,তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার ধর্মঘট বন্ধ করে দিয়ে, ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা বিনষ্ট করে দিয়ে মজুরীমান নিম্নে রাখার ব্যাপারে শিল্পপতিদের সাহায্য করেছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী কাঠামোয় পূর্ব বাংলা শ্রেণী ও অঞ্চলগত এই দ্বিবিধ শোষণের এক যৌথ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। এখানকার কৃষক-শ্রমিক তাই প্রায় আড়াই দশক ধরে যেমন নির্মমভাবে শোষিত হয়েছে, তেমনি এতদঞ্চলের ছোট তরফের শোষক উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীও পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজির দ্বারা বঞ্চিত ও শোষিত হয়েছে। এখানকার ক্ষুদে বুর্জোয়াদের বিকাশ ও অগ্রযাত্রা রুদ্ধ হয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের অবাঙালি বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থে। এস. এস. বারানভ বলেনঃ

> পূর্ব পাকিস্তানের খর্বিত পুঁজি সঞ্চয় সম্ভাবনার আর একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, অবাঙালি ব্যবসা ও শিল্প-পুঁজি কর্তৃক গ্রামে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূ-ল্যের বড় একটা অংশের গ্রাস করার ঘটনাকে। এই গ্রাসটা চলত পাটকল এবং পাট রপ্তানীকারক কোম্পানিগুলো কর্তৃক (যাদের অধিকাংশ ছিল অবাঙালি কর্তৃত্বাধীন) পাটের ক্রমমূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে। উদারহণস্বরূপ, ১৯৫৮ সালে সর্ববৃহৎ সাতটি ব্যাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের (যার কোনটাই বাঙালি মালিকের ছিল না) দ্বারা পাট বাণিজ্যের ৫১% সংগঠিত হয়। ১৯৬৩ সালে ১৬টি শিল্প বাণিজ্য সংস্থা পাটের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের প্রায় পুরোটাই দখল করে ফেলে। তার মধ্যে সর্ববৃহৎ ৯টি (সব ক'টির মালিকই অবাঙালি) নিয়ন্ত্রণ করে মোট বাণিজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ। পূর্ব পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের এক বেসরকারী হিসেবমতে ১৯৭০ সালে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানীর মাত্র ১০ ভাগ নিয়ন্ত্রিত হয় বাঙালি কোম্পানি দ্বারা।
>
> ষাটের দশকের শেষের দিকে অভ্যন্তরীণ পাট-বাজারে বাঙালিদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। অবশ্য পাট বাজারের সার্বিক অবস্থা আগের মতোই অবাঙালি শিল্প-মালিক ও বহির্বাণিজ্য কোম্পানীগুলোর ওপর নির্ভরশীল ছিল।
>
> নিম্ন ক্রয়-মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে এই সমস্ত কোম্পানী বাঙালি কৃষকদের প্রকৃত আয় দাবিয়ে রাখার সুযোগ পায় । পাটের নিম্ন মূল্যের জন্যে আরো দায়ী কেন্দ্রীয়

> সরকারের নীতি— যার মূল লক্ষ্য ছিল পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ হ্রাসের মাধ্যমে বহির্বাজারের প্রতিযোগিতায় শিল্পপতিদের শক্তি বৃদ্ধি করা। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এই নীতির বাস্তবায়নের যূপকাষ্ঠে বলি হয় অধিকাংশ কৃষকের স্বার্থ।[১৭]

এভাবে পূর্ব বাংলার কৃষকের ওপর শ্রেণী শোষণ তীব্রতম মাত্রায় হয়েছিল, এখানকার উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ রুদ্ধ হয়েছিল এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্যভাবে পূর্ববাংলার বিশাল সম্পদ পাচারের ভেতর দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে এর বৈষম্য মারাত্মক আকার নিয়েছিল। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর জেনারেল আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার বৈষম্য হ্রাসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব একটি ফিন্যান্স কমিশন নিয়োগ করেন কেন্দ্র ও প্রদেশের ভেতর সম্পদের পুনর্বরাদ্দ সমাধা করার জন্যে এবং পূর্ব বাংলার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করণার্থে সুপারিশ করার জন্যে। পূর্ব বাংলায় কর্মরত একজন বৃটিশ আমলা ডি. কে. পাওয়ারের নেতৃত্বে ৪জন বাঙালি সদস্য জনসংখ্যার অনুপাতে সম্পদাদি বরাদ্দের সুপারিশ করেন। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যের হারের পরিপ্রেক্ষিতেও তাঁরা সমস্যার সমাধানের জন্যে মত প্রকাশ করেন। তাঁরা স্বাধীনতা-পূর্ব প্রাদেশিক সরকারের ঋণ পরিশোধ করারও সুপারিশ করেন। তাঁরা আরো সুপারিশ রাখেন যে, স্বাধীনতা পরবর্তী ঋণের শতকরা ৫০ ভাগও পরিশোধিত হয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের আরো নীতি গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়।[১৮] কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামত-নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও রিপোর্টটি অকার্যকর করে রাখা হয়।

যাহোক, জেনারেল আইয়ুবের শাসনামলে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে আর্থনীতিক উন্নয়নের যে-নীতি অনুসরণ করা হয় তার ফলে ১৯৬৮ সাল নাগাদ আর্থনীতিক ক্ষমতার এত বেশী কেন্দ্রীকরণ ঘটে যে, দেশের সকল শিল্প মুনাফার ৬৬ ভাগ, ইনসিওরেন্স তহবিলের শতকরা ৯৭ ভাগ এবং ব্যাঙ্কসমূহের শতকরা ৮০ ভাগ মাত্র ২০টি পরিবারের নিয়ন্ত্রণের চলে আসে। এরা সবাই ছিল অবাঙালি ও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক।[১৯] এসব শিল্প পরিবারগুলো শ্রেণী শোষণের মাধ্যমে কীভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করে চলে তা বোঝা যাবে ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সময়ের ভেতর করাচী স্টক এক্সচেঞ্জে ইস্যুকৃত তাদের মূলধন বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করলে। নিম্নের টেবিলে এটা দেয়া হলঃ

টেবিল ২৫

শিল্প পরিবারসমূহঃ ১৯৫৪–১৯৬৯ সময়ে তাদের বিকাশের হার–করাচী স্টক ইস্যুকৃত মূলধন

	১৯৫৪–৫৫	১৯৫৬–৫৭	১৯৬০–৬১	১৯৬৪–৬৫	১৯৬৮–৬৯
. সায়গল	–	৩৫	৬৬	১৪৩.৫	১৬৩.৯
২. আদমজী	৮০	–	১৩০	১৪০	১৫০
. হাবীব	২১	–	৩৬	৫২	১০২
. বশীর (ক্রিসেন্ট)	২	–	১৭	৮৪	৮৯
. আমিন	১০	–	১০	৫০	৯০
. ভালিকা	৩১.৯	–	৩২.৮	৮৩.৩	৮৮
. বাওয়ানি	–	–	২৫	৫৬.৩	৬৬.৩
. নাসির	৩.৬	–	–	৫৬.৬	৬৫.৮
বেকো	৫	–	২৯	৩০	৫১
. ক্যাপী	২.১	–	২৬.৭	৩৬.৭	৪৯.২
১. মওলাবক্স	–	–	১৫	২৫	৪৫

উৎসঃ আল ফাতাহ, করাচী, ৯ এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
উদ্ধৃতঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, ব্যুরোক্রেটিক পলিটিক্স ইন সেগমেন্টেড ইকনোমিক গ্রোথ, ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮০, পৃঃ ২১৬।

১৯৬৯– ৭০ সালে এক হিসেবে দেখা যায় যে, পূর্ব বাংলার মোট উৎপাদনের ৫৫% থেকে আসছে। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান কৃষি নির্ভরতা অনেকখানি কমিয়ে ইতিমধ্যে, এবং সে অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন মোট আঞ্চলিক উৎপাদনের ১%। অপরদিকে, শিল্পে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার দ্বিগুণ উন্নতি লাভ করে। শিল্প পশ্চিম পাকিস্তানে পাওয়া যায় ১৬% উৎপাদন, পূর্ব বাংলায় পাওয়া যায় .৫%।[২০] আবার, মনে রাখা দরকার যে, পূর্ব বাংলার শিল্পোৎপাদনের মালিকানার পারটিতে পশ্চিমাঞ্চলের পুঁজিপতির ছিল বিরাট অংশ, কেননা এতদঞ্চলে স্থাপিত বহু শিল্প–কারখানার মালিকানা ছিল অবাঙালি বা পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। যাহোক, পাকিস্তানের ২৪ বছরে শ্রেণী ও অঞ্চলগত শোষণ যে কি ভয়াবহ রূপ এবং দেশের উভয় অঞ্চলের ভেতর বৈষম্য কি প্রকট হয়ে উঠেছিলো, তা কতকগুলো প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যায়। পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক তাঁর এক সমীক্ষায় হিসেব দিয়েছিলেন যে, পূর্ব ৫২ লাখ কর্মক্ষম বেকার রয়েছে। ইকাফের এক আর্থনীতিক সমীক্ষা অনুযায়ী

১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব বাংলার কর্মহীন জনসংখ্যা ছিল ৫৫ লাখ জনবছর। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এ সংখ্যা ছিল ১১ লাখ জনবছর। অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৩৩% ছিল বেকার, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মক্ষম জনসংখ্যার কেবল ৮% ছিল বেকার।[২১] আরেক হিসেব থেকে দেখা যায়, ১৯৬৬-৬৭ সালে মোট পণ্যদ্রব্যের দুই-তৃতীয়াংশ তৈরী হচ্ছে পশ্চিমাঞ্চলে এবং মাত্র এক তৃতীয়াংশ পূর্বাঞ্চলে।[২২] আবার, ১৯৬৯-৭০ সালে ১৯৫৯-৬০ বছরের মূল্যে পূর্ব বাংলার মোট আঞ্চলিক উৎপাদনের মাথাপিছু অংশ দাঁড়ায় ৩১৪ টাকা, যেক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে এটা দাঁড়ায় ৫০৪ টাকায়।[২৩] এদিকে ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব বাংলায় মাথাপিছু গড় আয় ২৮০ টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে হয় ৪১২ টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব বাংলায় এটা হয় ২৯৯ টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৮৩ টাকায়।[২৪] মাথাপিছু গড় আয়ের ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলের বৈষম্য দাঁড়ায় এরূপঃ ১৯৬৪-৬৫ সালে ৩৮.১% ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩৭.৫% ১৯৬৬-৬৭ সালে ৪৩.৭% ১৯৬৭-৬৮ সালে ৪২.৯% ১৯৬৮-৬৯ সালে ৪৬.৭% এবং ১৯৬৯-৭০ সালে ৪৭.১%।[২৫] এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫৯-৬০ থেকে ১৯৬৬-৬৯ পর্যায়ে গড়ে পূর্ব বাংলার জীবন যাপনের ব্যয় পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা ৫% থেকে ৭% বেশি ছিল,[২৬] সেহেতু প্রকৃত আয়ের প্রশ্নে উভয় অঞ্চলের বৈষম্য ছিল অধিকতর।

ভৌগলিকভাবে দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তানে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে আর্থনীতিক উন্নয়নের নীতিগ্রহণ এবং পূর্ব বাংলার ওপর ঔপনিবেশিক শোষণ চাপিয়ে দেবার পরিপ্রেক্ষিতে দু'অঞ্চলের ভেতরকার এহেন বৈষম্য ছিল একান্ত স্বাভাবিক। বারানভ বলেনঃ

> ....১৯৪৭-৭১ সাল সময়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পঞ্চাশের দশকে সৃষ্ট এবং ষাটের দশকে আরো গভীরতাপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক বৈষম্য কেবলমাত্র আরম্ভলগ্নের বৈসাদৃশ্যেরই ফল ছিল না বরং তা ছিল বহুলাংশে দেশের অর্থনৈতিক নীতিরই ফল, যা ধনবাদী উন্নয়নপ্রসূত বৈষম্য দূরীকরণে ছিল অপারগ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কাল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অসন্তোষ এবং সমতা আদায়ের সংগ্রামেরই ইতিহাস।[২৭]

লুসিয়ান পাই-এর মতে নতুন 'রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে আর্থনীতিক উন্নয়নের ওপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ ও সমাজতান্ত্রিক শ্লোগান বন্টনের মৌলিক সংকটের প্রতিফলন'।[২৮] বন্টনের বিষয় হচ্ছে পণ্য সামগ্রী, সেবা এবং উপকরণাদি রাষ্ট্র থেকে কে পাচ্ছে, কতটুকু পাচ্ছে, কীভাবে পাচ্ছে ইত্যাদি। এসবের সুষ্ঠু, সমতাভিত্তিক ন্যায্য ও ভারসাম্যমূলক

বরাদ্দ না ঘটলেই বন্টন সংকট দেখা দেয় এবং ক্রমে তা তীব্রতা লাভ করে আর্থনীতিক সংকটের সীমা ছাড়িয়ে রাজনীতিক সংকটে রূপ নেয়।

তৎকালীন পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার ওপর অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক বৃহৎ পুঁজির সুগভীর শ্রেণী ও আঞ্চলিক শোষণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলার ধনী ভূস্বামী ও উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীও খানিকটা মুনাফা আত্মসাৎ-এর সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু এখানকার গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক কৃষিজীবী মানুষ, শিল্প শ্রমিক ও নিম্নবিত্তহীন সমবায়ে গঠিত জনমণ্ডলী প্রচণ্ড শোষণ ও পরিণামে আর্থনীতিক দুর্গতির শিকার হয়। তারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে। আর এহেন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্যেই ১৯৬৮-৬৯ এর বৈপ্লবিক গণ অভ্যুত্থানকালে এবং ১৯৭০-৭১ সালে আর্থনীতিক শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি লাভ ও বন্টন সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যাপক বাঙালি জনতার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। জনমণ্ডলীর ভেতর সমাজতন্ত্রের এই জনপ্রিয়তা এবং সমগ্র রাজনীতিক আবহাওয়া থেকে এ ব্যাপারে সৃষ্ট প্রভাব ও চাপের কারণেই পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সে সময়কার প্রধান ধারার প্রধানতম সংগঠন আওয়ামী লীগ ও এর নেতৃত্ব আন্দোলন ও জনগণের চেতনাকে ধরে রাখার জন্যে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে নিজেদের দলীয় আদর্শ বলে গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এসময় আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বিপ্লবী ও র‍্যাডিকাল যুব বাম অংশের চাপ এবং অন্যান্য বামপন্থী সংগঠন ও নেতৃত্বের এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বা বিকল্প নেতৃত্বের হাতে আন্দোলন চলে যাবার আশংকাই আওয়ামী লীগকে সমাজতন্ত্রের পক্ষে আওয়াজ তোলায় প্ররোচিত করে। এভাবে পূর্ব বাংলার শ্রেণীক ও আঞ্চলিক শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্ট ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাজনীতিক পরিস্থিতিতেই বন্টন সংকট মোকাবেলা করার লক্ষ্যে প্রথম দশকে পূর্ববাংলা কর্তৃক দাবীকৃত সমাজতন্ত্র তথা শোষণমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার রাজনীতিক আন্দোলন দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে প্রচণ্ড রূপ নেয় এবং এতদঞ্চলে গণ ঐকমত্যে পরিণত হয়।

৪

পূর্ব বাংলায় সমাজতন্ত্রের চেতনা এবং ঐকমত্যের প্রক্রিয়াঃ ১৯৪৭–৬৮

১৯৪৭ সালের ২৯শে এপ্রিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের পক্ষে তৎকালীন বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সেকালের বাংলার রাজনীতিক কর্মী সমাজ,নেতৃবর্গ, সংগঠন ও সাধা–রণভাবে জনচেতনায় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের উপস্থিতির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, "ভারতের বর্তমান বিপ্লবী চিন্তা এর জন্মের জন্যে বাংলার কাছে ঋণী। .... ভারতীয় হোক আর এ্যাংলো–আমেরিকান হোক, একশো ভাগ বাইরের পুঁজি যা বাংলাদেশকে শোষণ করছে তা পশ্চিম–বঙ্গে বিনিয়োজিত। আমাদের ভেতর ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও প্রবণতা দেখে বাইরের এই শোষকেরা তাদের স্বার্থ খোয়া যাবার ভয়ে ভীত। স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলায় তাদের কি অসুবিধা হতে পারে, তা বোঝার মতো চাতুর্য তাদের আছে। বহির্দেশীয় পুঁজির স্বার্থে বাংলাদেশকে বিভক্ত, পঙ্গু ও অক্ষম করা হবে যাতে করে ভবিষ্যতে এর কোনো অংশেরই এই পুঁজিকে প্রতিরোধ করার যথেষ্ট শক্তি না থাকে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোর প্রকৃতি লক্ষ্য করে আমি মত পোষণ করছি যে এগুলো এ্যাংলো ইন্ডিয়ান কায়েমী স্বার্থ ও তাদের ভারতীয় সহযোগীদের দ্বারা পরিকল্পিত ও পৃষ্ঠপোষিত"।[২৯]

বস্তুত, ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে এবং পরবর্তীকালের পূর্ব বঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিক চিন্তা বিদ্যমান ছিল এবং সে জন্যে আন্দোলন–সংগ্রাম চলছিলো। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ওই রাষ্ট্রের কাঠামোয় পূর্ব বাংলার ওপর গোড়া থেকেই যুগপৎ যে ঘৃণ্য শ্রেণী ও অঞ্চলগত শোষণ শুরু হয়, তারই

প্রতিক্রিয়ায় শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রের দাবী নতুনভাবে উঠতে থাকে।[৩০]

৩রা জুন ১৯৪৭-এ মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশ বিভাগের ঘোষণার পরপরই "গণ আজাদী লীগ" নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল রাজনীতিক কর্মীরা 'আশু দাবী কর্মসূচী আদর্শ' শীর্ষক ম্যানিফেস্টোতে বলেন যে:

দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের স্বাধীনতা দুইটি পৃথক জিনিষ। বিদেশী শাসন হইতে একটি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই দেশবাসীরা স্বাধীনতা পাইল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্যই নাই, যদি সেই স্বাধীনতা জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন না করে, কারণ অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়। সুতরাং, আমরা স্থির করিয়াছি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মুক্তির জন্য আমরা সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে থাকিব। এতদুদ্দেশ্যে আমরা দেশবাসীর সম্মুখে আদর্শ ও কর্মসূচী উপস্থিত করিতেছি।[৩১]

ওই ম্যানিফেস্টোতে তাঁরা আরো বলেন:
সত্যিকার পাকিস্তান অর্থে আমরা বুঝি, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি।[৩২]

এসময় (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) "রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন বলেনঃ

দারিদ্র দূর করতে হলে সামাজিক বৈষম্য দূর করা, বৈদেশিক শোষণ থেকে আত্মরক্ষা করা, এবং জাতীয় সম্পদ যাই থাক, শিল্প বাণিজ্যের সাহায্যে তার সুবিনিময়ের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। শুধু প্রভাব কিছুটা খর্ব হলেই হবে না— ইংরেজদের স্থান যেন বৈদেশিক বা অন্য কোন প্রদেশীয় লোকে দখল করে না বসে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। [৩৩]

ওপরের দু'টি উদ্ধৃতি থেকে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত. সেই ৩রা জুন ১৯৪৭-এ আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক মাস পরেই পূর্ব বাঙলার এবং বাঙালিদের শিক্ষিত সচেতন অংশ তাদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয়ত. স্বাধীনতা বলতে এবং রাজনীতিক স্বাধীনতার অর্থপূর্ণ রূপ বলতে সে সময়ই এরা বুঝে নিয়েছেন রাজনীতিক স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে পরিপূর্ণ আর্থনীতিক মুক্তিকে। তৃতীয়ত. এরা পূর্ব বাংলা ও বাঙালি জনগণের ওপর বৃটিশের অবর্তমানে পশ্চিমাঞ্চলের শোষণ নবরূপে চেপে বসার

তাৎক্ষণিক লক্ষণ দেখেই সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধ সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। চতুর্থত এবং সর্বাধিক বড় সত্য এই যে, আর্থনীতিক মুক্তি ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলে এরা সেই গোড়ার যুগেই সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ গ্রহণের অনস্বীকার্য উপযোগিতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখে মোহাম্মদ তোয়াহা, কামরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ, নঈমউদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ প্রমুখ সেই সময়কার প্রগতিশীল রাজনীতিক কর্মীর প্রচেষ্টায় ঢাকায় গণতান্ত্রিক যুব লীগ গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে কেবল গণতান্ত্রিক নয়, বরং আরো এগিয়ে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য নিয়ে। এদের কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপঃ

> (ক) উৎপাদন করা হবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, মুনাফার উদ্দেশ্যে নয়,
> (খ) প্রত্যেকে নিজের সাধ্যানুযায়ী পরিশ্রম করবে এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদি নিজের চাহিদানুযায়ী গ্রহণ করবে,
> (গ) সম্পূর্ণ উৎপাদন শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং সমষ্টির মালিকানায় ন্যস্ত হবে,
> (ঘ) জনগণের মুক্তি অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে:
> (১) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও জায়গীরদারী প্রথার উচ্ছেদ, (২) সকল জাতির শান্তি আর স্বাধীনতার জন্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা, (৩) প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার ও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এমন এক শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের ব্যবস্থা করা যাতে করে সাধারণ মানুষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও মৌলিক আর্থনীতিক অধিকারের নিশ্চয়তা থাকে, (৪) কমনওয়েলথ ছেড়ে পূর্ণ ও সত্যিকার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা [৩৪]

এদিকে ১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ তারিখে তৎকালীন পূর্ববাংলা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট–বিতর্কে অংশ নিতে গিয়ে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী যে বক্তব্য রাখেন তাতে নব পাকিস্তানে পূর্ববাংলার দুর্দশা–দুর্গতি ও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণী চরিত্র যেমন ফুঠে ওঠে, তেমনি সে সম্পর্কে পূর্ব বাংলা বিরোধী নেতৃবর্গের সচেতনতা ও বিক্ষোভ এবং তাদের দ্বারা পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে বাছাই করে নেয়ার যৌক্তিকতাও খুঁজে পাওয়া যায়। ভাসানীর বক্তব্যের খানিকটা ছিল নিম্নরূপ:

> দীর্ঘদিন যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ গভর্নমেন্টের শাসন ও শোষণ হ'তে মুক্তি লাভ করে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ আশা করেছিল যে তারা স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে

স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে, স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবে, তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে, তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতি লাভে সক্ষম হবে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বড় আফসোসের বিষয় যে এই হাউসে জনাব অর্থ সচিব যে বাজেট পেশ করেছেন তা তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে করেন নি। গভর্ণর জেনারেলের মনোনীত মেম্বর হিসাবে করেছেন। স্বাধীন দেশে, স্বাধীন পাকিস্তানে স্পেশাল পাওয়ারের মন্ত্রী দ্বারা বাজেট পেশ হবে তা আমরা কখনও আশা করি নি। জনসাধারণের মনের কথা, মনের দুঃখ ও বেদনা বুঝবার তাঁর শক্তি নাই কারণ জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর মনের কোন মিল নাই। বিংশ শতাব্দীর এই গণতান্ত্রিক যুগে এই স্বাধীন দেশে গভর্ণর জেনারেল স্পেশাল পাওয়ার ব্যবহার করবেন এটা আমাদের ধারণার অতীত।

তারপর তিনি যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে আমলাতান্ত্রিক ভোগবিলাসের জন্য সব কিছুই করেছেন। কিন্তু দেশের মেরুদণ্ড কৃষক মজুর যারা দিবারাত্র হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রাজস্ব যোগায় তাদের জন্য কিছুই করেন নাই। শতকরা ৪জন লোক শহরে বাস করে তাদের পানীয় জলের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন কিন্তু ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ গ্রামবাসীদের পানীয় জলের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নি। যুক্তবঙ্গে ১৯৪৩–৪৪ সালে পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩ কোটি ২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা আর আমাদের মাননীয় অর্থ সচিব যে বাজেট উপস্থিত করেছেন তাতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পুলিশের খাতে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন ৩,০৩,৭৭,০০০ টাকা ...... পুলিশের ব্যয় বৃদ্ধি করে স্বাধীন পাকিস্তানকে রক্ষা করার চেষ্টা অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। ...... মাননীয় অর্থ সচিব সাহেব সেদিন বলেছেন যে জমিদারী প্রথা তাড়াতাড়ি উচ্ছেদ করলে এক কোটি লোক মারা যাবে বা তাদের জীবন বিপন্ন হবে। তাঁর ফিগার বুঝতে পারলাম না। পূর্ব বাঙলার মোট ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন কৃষিজীবী। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করলে ১ কোটি লোক কি ক'রে মারা যায় ? এটা তিনি কি ক'রে আবিষ্কার করলেন? গরীব কৃষকদের উপর জুট লাইসেন্স ফী বাবদ ২০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। কিন্তু আপনারা জেনে অবাক হবেন যে এই প্রদেশে জমিদারদের কাছে ২ কোটি টাকা সেস্ বাকি আছে। এক ময়মনসিংহ জেলায় ২৬ লক্ষ টাকা সেস্ বাকি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত দিন ঘুমান আর সন্ধ্যার সময় গিয়ে দস্তখত করেন। এই বাকি সেস্ আদায়ের কোন ব্যবস্থা করছেন না। যে সমস্ত গরীব কৃষক কৃষি ঋণ নিয়েছে এবং শোধ করতে পারছে না, মাননীয় অর্থসচিব সার্টিফিকেট দ্বারা তাদের বাড়িঘর নীলাম এবং জোতজমি ক্রোক করে উক্ত ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু প্রবল প্রতাপশালী জমিদারদের হাতে কড়া লাগিয়ে ২ কোটি টাকা বাকি সেস্ আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। এই হাউসে অনেক মিনিস্টারের কাছেও লক্ষ লক্ষ টাকা সেস্ বাকি পড়ে আছে। স্বয়ং অর্থ সচিব মাননীয় হামিদুল হক সাহেবেরও হয়ত অনেক সেস্ বাকী আছে। যদি মন্ত্রীরা গরীব কৃষকদের মেরে মন্ত্রিত্ব করতে চান তাহলে তারা আর বেশিদিন

মন্ত্রিত্ব করতে পারবেন না।[৩৫]

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগ তাদের সংগঠনের বক্তব্য ও আদর্শ-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে যে পুস্তিকা প্রকাশ করে তাতে নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ও এর শাসকগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড, শ্রেণী চরিত্রের স্বরূপ, পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার অবস্থা, শ্রমিক-কৃষক জনগণের ওপর সামন্ত-পুঁজিবাদী শোষণ এবং এসবের বিরুদ্ধে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সংগঠনের কর্মসূচী তুলে ধরা হয়। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ভিত্তিতে জীবন, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রকে নূতনভাবে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে সংগঠনটির সুস্পষ্ট চেতনা ও দাবী এসব থেকে বেরিয়ে আসে। গণতান্ত্রিক যুব লীগের পুস্তিকায় বলা হয়:

পাকিস্তান আজও বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে আসিয়া পূর্ণ আজাদী ঘোষণা করে নাই। পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতার কবর দেওয়া হইয়াছে। সভাসমিতির অধিকার হরণ, বিনা বিচারে আটক, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং অর্ডিন্যান্স রাজের স্টিমরোলার আজ পাকিস্তানে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। রাজনৈতিক এবং আর্থিক গণতন্ত্র অর্থহীন হইয়াছে দাঁড়াইয়াছে। কৃষকদের ভাগ্যে জমি মিলে নাই। মজুরের মজুরী বাড়ে নাই। ছাঁটাইয়ের কবলে পড়িয়া লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকাহীন হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্য সংকট গভীর হইয়া দেখা দিয়াছে। স্বাধীন পাকিস্তানে খাইয়া পরিয়া বাঁচিবার আকাঙ্খা ধূলিস্মাৎ হইয়া গিয়াছে, পূর্ণ আজাদী, গণতন্ত্র এবং সুখী জীবনের পরিবর্তে নূতন দাসত্ব এবং অনাহারের শৃংখলে জনগণ শৃংখলিত হইতেছে।[৩৬]

পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগের ওই পুস্তিকায় আরো বলা হয় :

গত ঢাকা সম্মেলনে যে "গণদাবীর সনদ" গৃহীত হয় তাহাতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, আর্থিক গণতন্ত্র, কৃষি পুনর্গঠন, শিল্প বিপ্লব প্রভৃতি মূল দাবীর কথা বলা হইয়াছে। এই সনদের অর্থই হইল পরাধীন দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন বুনিয়াদের উপর দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করা। কিন্তু বর্তমানে সরকার পুরাতন সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই কায়েম রাখিতে যে বদ্ধপরিকর গত এক বছরের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিলেই তাহা ধরা পড়ে।[৩৭]

উল্লিখিত পুস্তিকায় প্রদত্ত গণতান্ত্রিক যুব লীগের ইশতেহারে বলা হয়:

কোন দেশের রাজনৈতিক কাঠামো কিরূপ তাহা ভালভাবে বুঝিতে হইলে সেই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রথমে লক্ষ্য করিতে হয়। যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শোষণ ও জুলুমের ভিত্তিতে গঠিত অর্থাৎ দেশের শতকরা ৯৫ জন

লোককে শতকরা মাত্র ৫ জন লোকের স্বার্থেই খাটিয়া মরিতে হয়, যে দেশে বড় বড় মোটা বেতনের আমলা পুষিয়া গরীব কেরাণী ও মজুরকে ছাঁটাই করা হয়— এক কথায় বলিতে গেলে যে দেশে অর্থনৈতিক সাম্য বলিয়া কোন জিনিষ নাই সে দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না। ইংরাজ সরকার তাহার শোষণ ও শাসন বজায় রাখিবার জন্য আমাদের দেশে একদিকে জমির উপর একদল পরগাছা সৃষ্টি করিয়াছে অপর দিকে শিল্পের দিক দিয়া আমাদের দেশকে অনগ্রসর করিয়া রাখিয়াছে। মুষ্টিমেয় জমিদারের স্বার্থে কোটি কোটি কৃষককে শোষণ করা হইতেছে এবং অপরদিকে বেকারের দল সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য আমাদের আজাদীর লড়াইয়ের মূল কথাই ছিল ইংরাজের তৈরী অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া সেই স্থলে নূতন গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করা। আমাদের নূতন অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তিই হইবে বিনা খেসারতে জমিদার প্রথা ধ্বংস করিয়া কৃষককে জমির মালিক বলিয়া ঘোষণা করা এবং যে সকল ক্ষেত্রে একজন লোকের হাতে অধিক পরিমাণে আবাদী জমি একত্রীভূত হইয়াছে সে সকল ক্ষেত্রে সমস্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা গরীব কৃষক ও দিন মজুরদের মধ্যে বিতরণ করা। যাহারা চাষের হাল-বলদ কিনিতে পারিতেছে না, জমিতে সার দিতে পারিতেছে না তাহাদিগকে সরকার হইতে সাহায্য করা। অথচ বর্তমান সরকার জমিদারী উচ্ছেদের যে বিল আনিয়াছেন তাহাতে "শিশু রাষ্ট্রের" পকেট হইতে ৪০ কোটি টাকা খেসারত ব্যবস্থা হইয়াছে, জোতদারকে ২০০ শত বিঘা জমি রাখিতে দেওয়া হইয়াছে, জমিদারের ঋণ লাঘবের ব্যবস্থা হইয়াছে, জমিদার জোতদারের জন্য সকল রকমেরই রক্ষা কবচের ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু এই বিলের ফলে কৃষক কি পাইবে, আধিয়ার ও দিন মুজুরের ভাগ্যের কি পরিবর্তন হইবে শুধু সেইটাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে এই বিল কৃষকদের স্বার্থে রচিত হয় নাই—জমিদারের স্বার্থেই রচিত।

কর্মচারী, কেরাণী, শিক্ষক প্রভৃতি সম্বন্ধে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নীতির অর্থ এই যে, যে দেশের কোটি কোটি লোকের পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই, ঘরে বাতি নাই সে দেশের মন্ত্রী বা উচ্চ অফিসারদের কখনও মাহিনা, ভাতা প্রভৃতি দিয়া চার পাঁচ হাজার টাকা মাসিক আয় বরদাশ্ত করা চলে না। যাহারা একজন রেলমজুরকে ও একজন প্রাইমারী শিক্ষককে ১৫/২০ টাকা মাহিনা দিতে লজ্জা বোধ করে না তাহারা নিজেরাই বা পাঁচ হাজার টাকা লয় কিভাবে ও ইংরাজ আমলের অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের হাজার হাজার টাকা বেতন দিয়া পুষিতেছে কিভাবে ? বর্তমান অবস্থায় কোন মজুর ও কর্মচারীর বেতন ও ভাতা ১০০ টাকার কম হইতে পারে না এবং কোন উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরই বেতন ৫০০ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। অথচ আমাদের সরকার মুখে ইস-

লামী সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ইংরাজ আমলের শোষণ ও অসা-ম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই কায়েম রাখিতেছে। ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা বৃটিশ আমলকেও লজ্জা দেয়।

শিল্প বিস্তারের ব্যাপারে সোভিয়েত সরকার মজুর ও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিয়াছে অপরদিকে তেমনি মুষ্টিমেয় বণিকের হাতে না জমিয়া কোটি কোটি টাকা সরকারের হস্তগত হইয়াছে, যাহা দিয়া নূতন শিল্প গড়িয়া তোলা, পুরাতন শিল্পকে প্রসার করার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই পথেই তাহারা জনসাধারণের আয় বাড়াইয়াছে, জিনিষের দর কমাইয়াছে এবং বেকার সমস্যার সমাধান করিয়াছে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে মুষ্টিমেয় ধনিক, রাজা, জমিদার ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী তাহাদের শত্রু হইয়াছে বটে। কিন্তু দেশের কোটি কোটি মজুর, কৃষক ও মধ্যবিত্ত রাশিয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিয়াছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছে। সেই জন্যই দেখা যায় যুদ্ধের নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করা সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশসমূহ কেবলমাত্র নিজ শক্তির ভরসা করিয়া পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করিয়া অতি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নিতর পথে অগ্রসর হইতেছে। আর মার্কিন ধনকুবেরগণের সাহায্য লাভ করিয়া পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, চিয়াংকাইশেকের চীন পভৃতি কেবল সম্মেলন করিয়া বেড়াইতেছে ও অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাইতেছে।

যাহারা নিজের দেশের ধনিকদের তোষণ ও লালন পালন করে অর্থের জন্য তাদেরই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে হাত পাতিতে হয় এবং তদ্বারা অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও বিদেশী প্রভুদের হস্তক্ষেপ ডাকিয়া আনিতে হয়। এইভাবে অর্থনৈতিক গোলামী হইতে রাজনৈতিক গোলামীর সৃষ্টি হয়।

সেইজন্য পাকিস্তান সরকার অভ্যান্তরীণ ব্যাপারে ধনিক তোষণ ও কৃষক মজুর আন্দোলনে ধ্বংসের পথ গ্রহণ করিয়াও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বৃটিশ ও আমেরিকার লেজুড়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফলেই নেতারা বৃটিশ সম্পর্কচ্ছেদের বদলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভুর্ক্ত থাকিবার কথা বলিতেছেন, রাজার জন্ম দিবস পালন করিতেছেন। ইহা আজাদীর পথ নয়, গোলামীর পথ, শিল্প বিস্তারের পথ নয়, বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে দেশের শিল্পবিস্তার বন্ধ রাখার পথ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বদলে অর্থনৈতিক দাসত্বের পথ।

সত্যিকারভাবে, আজাদীর শিল্প বিস্তার ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথে বর্তমানে শাসকমণ্ডলী অগ্রসর হইতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে কৃষক, মজুর ও গরীব মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করিয়া মিল মালিক, জমিদার, জোতদার, বিদেশী পুঁজিপতি, মুনাফাখোর বড় ব্যবসায়ী ও মোটা বেতনের দেশী-বিদেশী অফিসারদের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করিতে হইবে। দুই নৌকায় পা দিয়া চলা আজ অসম্ভব। হয় ধনিকের শাসন ধ্বংস করিয়া মেহনতকারী জনসাধারণকে বাঁচাইতে হইবে আর না হয় মেহনতকারী

জনসাধারণকে বুভুক্ষ রাখিয়া ধনিকের ধন-দৌলত বাড়াইতে হইবে। কোন দেশ কোন পথে যাইবে তাহা নির্ভর করে সেই দেশের শাসনশ্রেণী কোন দলের প্রতিনিধি তাহার উপর। সোভিয়েত রাশিয়া ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশসমূহে কৃষক, মজুর ও গরীব মধ্যবিত্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করিয়াছে সেই জন্যই সেখানকার জনগণ আজ খাঁটি আজাদী গণতন্ত্র ও সুখ ভোগ করিয়াছে, আর উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। গত এক বৎসরের কার্যকলাপের ফলে একথা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবেই কাজ করিতেছে এবং সেই জন্যই দেশবাসীর জীবনে দুঃখ-দুর্দশা নামিয়া আসিয়াছে। সরকার বলে "সময় দাও" কিন্তু আমাদের প্রশ্ন যে এক বৎসর সময় আমরা দিলাম তাহা কাহার স্বার্থে কিভাবে ব্যবহার করা হইল ? এই এক ব ৎসরে কি তাহারা বৃটিশ সম্পর্কচ্ছেদ, ধনিক শ্রেণীর উচ্ছেদ, চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরী ধ্বংস ও কৃষক মজুর মধ্যবিত্তের উন্নতির কাজে ব্যয় করিয়াছে, না দেশী বিদেশী ধনিক তোষণ ও গরীব হত্যার কাজে ব্যয় করিয়াছে? সময় পাই-লেই যদি ধনিক শ্রেণীর উচ্ছেদ হইত, জনসাধারণ পেটে ভাত পরনে কাপড় পাইত তাহা হইলে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে আজ কোটিপতিরা দেশের মালিক কেন ? সেখানকার মজুরদেরও মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করিতে হয় কেন ? আর মাত্র ২/৩ বৎসর সময়ের মধ্যেই আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ তাহাদের ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পারিল কেন ?.........

বর্তমান শাসক শ্রেণী খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না অথচ খবরের কাগজে বিবৃতি দিতেছে যে দেশে খাদ্য সমস্যা নাই। কোন জিনিষেরই দর কম-াইতে পারিতেছে না। সকল রকমের কুটির শিল্প ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। ছাঁটাই প্রভৃতির ফলে বিরাট আকারের বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে লোকের আয় ক্রমেই কমিতেছে আর ব্যয় বহুলাংশে বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ সরকারী কর্তৃপক্ষ ইহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নাই। কিন্তু রেল শ্রমিক, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি যখন নিজ নিজ ইউনিয়ন মারফৎ বর্তমান ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য আন্দোলন, ধর্মঘট প্রভৃতির দিকে আগাইয়া আসে তখন সরকার ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তার, বরখাস্ত, বদলী, ১৪৪ ধারা জারী প্রভৃতি দ্বারা ইহার জবাব দেয়। কাপড় ও চিনির কলের মালিকরা যখন উৎপাদক মজুর শ্রেণী, ক্রেতা ও মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করিয়া কোটি কোটি টাকা লুট করে তখন সরকার নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় সবই মুখ বুজিয়া সহ্য করে। অথচ মজদুর শ্রেণী যখন বাধ্য হইয়া জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী, ছুটি প্রভৃতির দাবী লইয়া আন্দোলন ও ধর্মঘটের পথে অগ্রসর হয়, তখন সরকার মিল মালিকের পক্ষেই হস্তক্ষেপ করাকে পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করে। আমরা আজাদী পাইয়াছি, কিন্তু এখনও রেল শ্রমিক ও যাত্রীদের শোষণ করিয়া কোটি কোটি টাকা ইংরাজ পুঁজিপতিদের জন্য বিলাতে পাঠাইতে হয়। যে সকল ইংরাজ অফিসার আমাদের দেশে চাকুরী করার নামে শোষণ ও শাসনের যন্ত্র হিসাবে

কাজ করিয়াছে, আমাদের দেশের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের বুকের রক্ত দিয়া হাত রাঙাইয়াছে, সেলামী স্বরূপ তাহাদের পেনসনের টাকা বিলাতে পাঠাইতে হয়। অথচ আমাদের দেশেরই গরীব মজুর ও শিক্ষকের দল না খাইয়া থাকে। আমরা দাবী করিয়াছিলাম অর্থনৈতিক গণতন্ত্র, শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসান। অথচ আমরা পাইতেছি একদিকে মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের অর্থনৈতিক একাধিপত্য, মোটা বেতনভোগী, ভোগবিলাস ও অপরদিকে অন্নহীন দরিদ্র জনসাধারণ- ইহাই কি ইসলামী সমাজতন্ত্র? না সমাজতন্ত্রের নামে প্রবঞ্চনা?[৩৮]

গণতান্ত্রিক যুব লীগের ইশতেহারে আরো বলা হয়:

গত এক বছর হইল সরকারী মহল হইতে আশার বাণী শুনান হইতেছে যে পাকিস্তানে শিল্প বিস্তারের সম্ভাবনা প্রচুর। এক বিশেষ কমিটি গঠিত হইতেছে, ইংরেজ বিশেষজ্ঞদিগকে মোটা টাকা দিয়া পরামর্শ দিবার জন্য আনা হইতেছে, কিন্তু অবস্থার একচুলও পরিবর্তন হয় নি। বাস্তব কর্মপন্থার ভিত্তিতে একটি কাজও শুরু হয় নি। আমাদের সরকার যতদিন বৃটিশ ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণ করিয়া পাকিস্তানের শিল্প বিস্তারের চেষ্টা করিবে ততদিন পর্যন্ত বর্তমান অবস্থাই চলিতে থাকিবে। কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজ স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে এক ধাপও অগ্রসর হইবে না। পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রয়োজনের চেয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনই তাহাদের কাছে ঢের বড় কথা এবং এইদিকে নজর রাখিয়াই তাহারা সবকিছু করিবে। মার্শাল পরিকল্পনা মারফৎ পশ্চিম ইউরোপের শিল্প প্রধান দেশগুলিকে যেভাবে পদানত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, এই সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধরেরা পাকিস্তানের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিতে মোটেই ছাড়িবে না। অথচ আমাদের কর্তৃপক্ষ তাহাদের দুয়ারে ধর্না দিতেছে। আমেরিকার কাছ হইতে তাহাদের শর্তে টাকা ধার করা বা আমেরিকার পুঁজিপতিগণকে দেশে শিল্প বিস্তারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যে খাল কাটিয়া কুমীর আনিবারই সামিল হইবে একথা যে কোন সাধারণ লোকেই বুঝিতে পারে। অথচ চোখের উপরই দেখিতেছি পূর্ব ইউরোপের নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্বসুলভ শর্তে দেওয়া ঋণ ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজ নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই অনেক দ্রুতগতিতে শিল্প বিস্তার করিতেছে। ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের দেশের মত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে মাথা বিকাইয়া না দিয়া নিজ শক্তির উপর ভরসা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা যদি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও অতি দ্রুত শিল্প বিস্তার করিতে পারে তাহা হইলে আমাদের সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণ করিয়াও গত এক বছরে এক ধাপও অগ্রসর হইতে পারে নাই কেন?

> সোভিয়েত রাশিয়া পরাধীন দেশ শোষণ করিয়া বা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ হইতে ঋণ করিয়া শিল্প বিস্তারের টাকা যোগাড় করে নাই। তাহারা টাকা যোগাড় করিয়াছে সকল কারখানা, খনি, যানবাহন, ব্যস্ত ও অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ধনিক শ্রেণীর হাত হইতে দখল করিয়া রাষ্ট্রের হাতে আনিয়া জারের আমলের সকল ধার-দেনা অস্বীকার করিয়া। দেশী ও বিদেশী ধনিকদের হাতের মুঠো হইতে অর্থনৈতিক আধিপত্য কাড়িয়া লওয়ার ফলে একদিকে যেমন শ্রমিক শ্রেণীর মজুরী বাড়িয়াছে ও জিনিসের দর কমিয়াছে—এককথায় বলিতে গেলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল দিক দিয়াই আমরা যেন আরও পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হইতেছি। অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ জোর করিয়া আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে ইহাই হইল আমাদের গত এক বছরের অভিজ্ঞতা। ৩৯

অতঃপর গণতান্ত্রিক যুব লীগের ইশতেহারে পাকিস্তানের গণতন্ত্র নিধনযজ্ঞের ব্যাখ্যা দিয়া 'আমাদের ভবিষ্যৎ' শিরোণামক অংশে বলা হয়েছে:

> গত এক বছরের অভিজ্ঞতা আগামীকালের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটেই আশান্বিত করিয়া তুলিতেছে না। বরং এই আশংকাই আমাদের মধ্যে প্রবল যে, বর্তমান অবস্থার গতিরোধ করিতে না পারিলে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক ঘোরতর বিপর্যয় দেখা দিবে। মাত্র কয়েকজন লোকের স্বার্থে পাকিস্তানের কোটি কোটি জনসাধারণের সকল অধিকার হরণ করিয়া একটি মাত্র গোষ্ঠীর একনায়কত্ব জাঁকিয়া বসিবে। ইহাদেরই স্বার্থে এবং খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের সকলের স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাদেরই সুখ বৃদ্ধির জন্য আমাদের সকলের সুখ বিসর্জন দিতে হইবে। ইহাদেরই অধিকার কায়েম রাখিতে আমাদের সকলের অধিকার হরণ করা হইবে। পাকিস্তানের যুব সমাজ শাসকমণ্ডলীর এই গণবিরোধী নীতি, গণতন্ত্রের প্রতি উপেক্ষা ও শোষণমূলক ব্যবস্থা কখনো মুখ বুজিয়া মানিয়া লইতে পারে না। সরকার যদি মনে করিয়া থাকে একমাত্র দমননীতির সাহায্যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করিয়া দিব, কৃষক, মজুর, ছাত্র ও যুব সংগঠন ধ্বংস করিয়া দিব, তাহা হইলে তাহারা চরম ভুল করিয়াছে, ইতিহাস হইতে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করে নাই। ৪০

ওই ইশতেহারে সবশেষে কৃষক মজুর নির্যাতন বন্ধ করা, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা, প্রাপ্ত বয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকার, ভাষার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার ইত্যাদিসহ কৃষক-শ্রমিকের মৌলিক স্বার্থ সম্বলিত কতকগুলো দাবী উত্থাপন করা হয় এবং এসবের

ভিত্তিতে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে যুব সমাজ ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। কতিপয় উল্লেখযোগ্য দাবী ছিল :

(ক) বিনা ক্ষতি পূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করে কৃষককে জমির মালিক করতে হবে। কৃষকের ঋণ মওকুফ করতে হবে। ক্ষেত-মজুরদের ন্যায্য মজুরী দিতে হবে।

(খ) বড় বড় শিল্প, বড় ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলো জাতীয়করণ করতে হবে। শ্রমিকদের খাটুনির সময় আট ঘন্টা বেঁধে দিতে হবে এবং বাঁচার মতো মজুরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) ব্যাঙ্ক, চা বাগান, খনি ইত্যাদি বড় বড় ব্যবসায় নিয়োজিত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত করতে হবে। মার্শাল প্ল্যান অথবা কোনো বিদেশী মূলধন জাতীয় স্বার্থ বিরোধী শর্তে গ্রহণ করা চলবে না।

(ঘ) বিনা ব্যয়ে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে।

(ঙ) রাষ্ট্রের খরচে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

(চ) জনগণকে সামরিক শিক্ষা দিতে হবে এবং জনগণের সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে।

(ছ) নারীদের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করতে হবে।[৪১]

বস্তুত, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বছর থেকে ১৯৫১ সাল অবধি পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বত্র দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি—খাদ্যাভাব, তীব্র লবণ সংকট ও অন্যান্য দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি বিরাজমান থাকার ফলে এবং সেই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী শোষণ পূর্ব বাংলার ওপর দ্রুততার সঙ্গে চেপে বসার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব বাংলায় নবার্জিত স্বাধীনতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলায় বামপন্থী-কমিউনিস্ট গ্রুপের কর্মতৎপরতা ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে দাবী ছাড়াও সাধা-রণভাবে সে সময় "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়, সাচ্ আজাদী ছিনকে লো" শ্লোগান ওঠে। এ সময় পূর্ববাংলার গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র কৃষক সংগ্রাম শুরু হয়। সিলেটের নানকার প্রথা বিরোধী আন্দোলন, ময়মনসিংহের হাজং অঞ্চলে লেভী বিরোধী আন্দোলন এবং অন্যান্য অঞ্চলে জমিদারী ও টঙ্ক প্রথা বিরোধী আন্দোলন, রাজশাহীর নাচোলে কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদি আন্দোলন-বিদ্রোহ সর্বাধিক তীব্রতা লাভ করে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সালের ভেতর খুলনা জেলার শোভনা, ডুমুরিয়া ধানিবুনিয়া, কালশিরা, মৌভাগ, ঘাটভোগ, ডোবা, চিতলমারী ও মোল্লারহাটে কৃষক আন্দোলন সশস্ত্র আকার ধারণ করে। ১৯৪৮ সালের দিকে যশোহরের নড়াইল মহকুমার কৃষক সমাবেশ ও আন্দোলন, ১৯৪৮-৪৯ সালে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে কৃষকদের কর্ডন বিরোধী

আন্দোলন এবং এছাড়া দিনাজপুর, রংপুর, ঢাকা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম জেলার নানাস্থানে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত হয়। চট্টগ্রামের মাদোরাশায় আন্দোলনকারী কৃষকেরা ফসল রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে পুলিশের গুলীতে ১২ জন কৃষক মৃত্যুবরণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কৃষকদের উপরোক্ত প্রতিটি আন্দোলনের পেছনে রাজনীতিক চিন্তা, কর্মসূচী ও সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরি করেছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি ও এর কর্মীরা কমিউনিস্ট পরিচালিত কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে। এতদ্ব্যতীত ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালের ভেতর পূর্ব বাংলার বামপন্থী কমিউনিস্টদের উদ্যোগে এখানকার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে ও রেলওয়েতে বিভিন্ন মাত্রায় ধর্মঘট ও আন্দোলন পরিচালিত হয়। এ সময় সংঘটিত হয় বামপন্থী–কমিউনিস্টদের উদ্যোগে জেল ধর্মঘট ও জেল সংগ্রাম। রাজশাহী, ঢাকা ও খুলনা কারাগারে অনশন ধর্মঘট ও আন্দোলনের প্রসার সর্বাধিক তীব্রতা প্রায়। রাজশাহী জেলের খাপরা ওয়ার্ডে এই জেল সংগ্রামের এক পর্যায়েই গুলীবর্ষণ, নির্মম পীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হন বামপন্থী ও কমিউনিস্ট নেতা কর্মীরা।

পূর্ব বাংলার সর্বত্র এই কৃষক সংগ্রাম, বিভিন্ন স্থানের শ্রমিক আন্দোলন এবং বামপন্থী কমিউনিস্টদের অন্যান্য আন্দোলন–সংগ্রামের কতকগুলো প্রতিক্রিয়া ও ফল লক্ষণীয়। প্রথমত, এসব আন্দোলন–সংগ্রামের ফলে পাকিস্তানের অর্জিত তথাকথিত স্বাধীনতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়। পাকিস্তান যে পূর্ববাংলা ও এর সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক শ্রমিক জনগণের জীবনে আর্থনীতিক শোষণমুক্তি ও প্রকৃত উন্নতি আনতে সক্ষম নয় তা অনেকাংশে স্পষ্ট হয়। যুগপৎ শ্রেণীক ও আঞ্চলিক শোষণের চারণভূমি হিসেবে পূর্ববাংলা যে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে, পশ্চিমাঞ্চলের শোষণ–নিগ্রতই যে পূর্ব বাংলার বঞ্চনা ও দুর্গতি–দূরবস্থার মূলে–এই আর্থনীতিক চেতনা জাগ্রত হয়। ফলে ধর্মীয় সমাজ গঠন, মুসলমানী তমুদ্দুন ও পাকিস্তানী জাতীয়তার মোহ অনেকখানি দূরীভূত হয়ে আর্থনীতিক শোষণ বিরুদ্ধতা, রাজনীতিক, শৃংখলমুক্তি, বাঙালিত্বের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার ভাষা–সংস্কৃতি–স্বাধিকার ইত্যাদির প্রশ্ন উঠে আসে। অর্থনীতিতে ন্যায্য হিস্যা এবং রাজনীতিক স্বাধীনতা পূর্ববাংলার রাজনীতিক আন্দোলন–সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় বিবেচনা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। এসময় এই পটভূমি সঞ্জাত সমান্তরাল ধারায় পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের বিষয়টি প্রসঙ্গত স্মর্তব্য,কেননা এর মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার ও প্রকৃত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে শোষণ বিরোধী সমবন্টনের সমাজ কায়েমের সম্ভাবনা দেখেছিল পূর্ব বাংলা। ১৯৪৮–৫২ এর ভাষা আন্দোলন, মূলনীতি রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন ও বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব, উপনির্বাচন সংগ্রামসহ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী সংগ্রাম—এসবই ওপরে বর্ণিত আর্থনীতিক–শ্রেণীক ও আঞ্চলিক শোষণ–বঞ্চনা সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া।

এসবের ভেতর দিয়েই পূর্ব বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং ধীরে ধীরে ব্যাপকভাবে

জনমণ্ডলীর মধ্যে শোষণমুক্ত ও প্রকৃত স্বাধীন গণতান্ত্রিক নব সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষায় সমাজতন্ত্রের চেতনা জাগ্রত হয়। এসময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা চিত্র পাওয়া যায় যে ১৯৪৮-এ প্রকাশিত মুসলীম লীগ সমর্থক সাপ্তাহিক নওবেলাল' পত্রিকার 'বাঁচিবার পথ' শীর্ষক সম্পাদকীয় থেকে। সমস্যার প্রকৃত কারণ তথা শ্রেণীক ও আঞ্চলিক আর্থনীতিক শোষণ, রাজনীতিক স্বাধীনতাহীনতা, পূর্ববাংলার ঔপনিবেশীকরণ —এসব সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে উচ্চবাচ্য না থাকলেও দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আর্থনীতিক সংকটের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপে এবং বিভাগের জন্য পাকিস্তানের আর্থিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা সাধারণভাবে নীচে নামিয়া আসিতেছে এবং দ্রব্য মূল্য দ্রুত বাড়িতে থাকিয়া দেশ জুড়িয়া এক অবিশ্বাস, ভয়, সন্দেহ এবং অসন্তোষের বিষ ছড়াইতেছে। এই অবস্থাকে অধিক দিন চলিতে দিলে দেশের অসন্তুষ্টি আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য—যাহা হয়ত বা গণবিপ্লবের পর্যায়েও নামিয়া আসিতে পারে। এই অবস্থা না দেশের পক্ষে না জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক, বরং ইহাতে পাকিস্তানের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।
>
> পাকিস্তান সরকারও যে অনুরূপ সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত নহেন তাহা নহে, বরং মধ্যে মধ্যে দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের বিবৃতি ও বক্তৃতা হইতে ইহা স্বাভাবিকভাবেই ধরিয়া লওয়া যায় যে দেশ দ্রুত এক গণবিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং পাকিস্তান বিপন্নের, ইসলাম বিপন্নের ধূয়া তুলিয়া সেই বিপ্লবের পথ রোধের চেষ্টা চলিতেছে। ঘন ঘন কমিউনিস্ট বিরোধী বিবৃতির ইহাই সার কথা।
>
> আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি এই সকল বিবৃতি জনজণের মনে কোন ক্রিয়াই করিতে পারিতেছে না। বরং স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানীরা আজ প্রশ্ন করিতেছে বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা পাকিস্তানে সম্ভবপর কিনা ?[৪২]

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে "দমননীতি" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' বলে:

> .... এক শ্রেণীর লোক যাহারা কঠোর দমননীতি চালাইয়া যাইবার জন্য সরকারকে চাপ দিতেছেন তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজমের কাজ আগাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা যদি সত্যসত্যই কমিউনিজম বিরোধী হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত দেশের প্রধান প্রধান সমস্যা যথা—শিক্ষা সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, মানুষ মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার সমস্যা ইত্যাদির আশু ও উপযুক্ত সমাধান করিবার জন্য সরকারকে বাধ্য করা। [৪৩]

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসেই শাসক সমর্থক 'দৈনিক আজাদ'–এর একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> আমাদের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিতে চাই যে, আতঙ্কগ্রস্ততা ও দমননীতির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল না হইয়া তাঁরা দেশ হইতে দারিদ্র, অশিক্ষা ও সামাজিক ভেদ বৈষম্য দূর করিবার কাজকে ত্বরান্বিত করুন। ইহা করিতে পারিলেই পাকিস্তানে কমিউনিজমের দূরতম ও ক্ষীণতম সম্ভাবনাও চিরদিনের জন্য দূর হইয়া যাইবে। ৪৪

তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও মুসলিম লীগ সরকার সমর্থক সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' ও 'দৈনিক আজাদ'–এর ওপরে উদ্ধৃত তিনটি সম্পাদকীয় থেকে কতকগুলো বিষয় স্পষ্ট বেরিয়ে পড়ে:

প্রথমত, তৎকালীন শোষক–শাসকগোষ্ঠী এত নির্লজ্জভাবে আর্থনীতিক শোষণ চালাচ্ছিল এবং সেকারণে খাদ্য সমস্যা, দারিদ্র্যসহ জনগণের জীবনমানের ভয়াবহ অবনতি ঘটেছিল যে তাতে করে বিশেষত পূর্ব বাংলার জনগণের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিলো। তারা শোষণ–বঞ্চনা ও অভাবসৃষ্ট প্রচণ্ড হতাশা থেকে সেজন্যে বিক্ষোভ–আন্দোলন–সংগ্রামের পথে এগিয়ে এসেছিল।

দ্বিতীয়ত, বামপন্থী–কমিউনিস্টদের কার্যক্রম ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি আকর্ষণ তাদের মধ্যে অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করছিলো। আর্থনীতিক শোষণমুক্তি, মানুষের মতো বাঁচার আগ্রহ ও প্রকৃত স্বাধীনতা হাসিলের আকাঙ্ক্ষা তাদের বিকল্প সম বন্টনের সামাজিক ব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্র–কমিউনিজমের প্রতি উৎসাহী করে তুলতে থাকে।

তৃতীয়ত, পূর্ব বাংলার জনগণের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের চেতনাকে ধর্মীয় ভাবাবেগের জোয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ধাবিত করে যে, 'ইসলাম বিপন্ন' 'পাকিস্তান বিপন্ন' ইত্যাদি বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ধূয়া ব্যাপকাকারে সরকারীভাবে তোলা হলেও, তা জনগণের কাছে প্রশ্রয় পায় নি। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বেড়াজাল থেকে পূর্ব বাংলা ও এর জনমণ্ডলীর এত শীগ্গীর মুক্তির মূলে কাজ করেছে পাকিস্তানে নতুনভাবে আর্থনীতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবার বিষয়ে উপলব্ধি এবং সেই সঙ্গে রাজনীতিক স্বাধীনতার অনুপস্থিতি–জাত যন্ত্রণা। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামো সৃষ্ট আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থার কারণে যুগপৎ শ্রেণীক ও আঞ্চলিক যে শোষণ, বৈষম্য ও অসম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, তার ফলেই ব্যাপক জনজীবনে ওঠে নাভিশ্বাস। আর আন্দোলন–সংগ্রামের রাজনীতি, পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য–স্বাধিকার ও বাঙালিত্ব এবং শোষণমুক্ত নতুন

সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ এভাবেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই এতদঞ্চলের নেতৃবর্গ, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ছাত্র সমাজ এবং জনগণের ভেতর শেকড় গাঁথে।

১৯৪৯ সালের জুন মাসে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালে এর সম্পাদক শামসুল হক কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব ও দলের প্রথম ম্যানিফেস্টোতে যেসব সমাজতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন দাবী, প্রস্তাব ও কর্মসূচী ছিল তা নিম্নরূপঃ

১. জমিদারী প্রথা ও জমির ওপর অন্যান্য কায়েমী স্বার্থ বিনা খেসারতে উচ্ছেদ করতে হবে।

২. সমস্ত কর্ষিত ও কৃষি উপযোগী অকর্ষিত জমি কৃষকদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দিতে হবে।

৩. তাড়াতাড়ি অর্ডিন্যান্স জারী করে 'তেভাগা' দাবী মেনে নিতে হবে।

৪. রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে অবিলম্বে সমবায় ও যৌথ কৃষি প্রথা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. সেঁচ, সার, উন্নত বীজ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কৃষি ঋণ, খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল করা, সমবায় সমিতিকে উৎসাহ দান, খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ইত্যাদি সুবিধা কৃষকদের সাহায্যে অবিলম্বে বাস্তবায়ন।

৬. কালে সমস্ত ভূমিকে রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে এবং সরকারের অধিনায়কত্ব ও তত্ত্বাবধানে যৌথ ও সমবায় কৃষিপ্রথা চালু করা।

৭. প্রাথমিক শিল্পগুলোকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে যেমন–যুদ্ধ শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, যানবাহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনি, বন–জঙ্গল ইত্যাদি, এবং অন্যান্য ছোটখাটো শিল্পগুলোকে পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে সরাসরি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আনতে হবে।

৮. পাট ও চা শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে এবং পাট ও চা ব্যবসা সরকারের হাতে একচেটিয়া থাকবে।

৯. বিল, হাওর ও নদীর ওপর থেকে কায়েমী স্বার্থ তুলে দিয়ে সরকারের কর্তৃত্বাধীন মৎস্যজীবীদের মাঝে যৌথ উপায়ে বন্টন করে দিতে হবে এবং সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্যের চাষ ও মৎস্য ব্যবসার পত্তন করতে হবে।

১০. শিল্প ও ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত একচেটিয়া অধিকার থাকবে না।

১১. বৃটিশের নিকট থেকে স্টার্লিং পাওনা অবিলম্বে আদায় করতে হবে এবং সেটা দ্বারা যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

১২. দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করবার ভার রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে।

১৩. সমস্ত বৃটিশ ও বৈদেশিক বাণিজ্যকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে।

১৪. শিল্পে বৈদেশিক মূলধন খাটানো বন্ধ করতে হবে।

১৫. শিল্পে মুনাফার হার বন্ধ করতে হবে। ৪৫

১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলার সকল সংগঠন ও সর্বস্তরের জনগণের তরফ থেকে গণপরিষদে শাসনতন্ত্র তৈরীর পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ সরকারের মূলনীতি কমিটির গণবিরোধী রিপোর্টের বিরুদ্ধে ঢাকায় যে গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়, সেক্ষেত্রে উত্থাপিত দাবীর মধ্যে বলা হয় যে:

পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র হবে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ৪৬

১৯৫১ সালের ১৬,১৭ এবং ১৮ই জানুয়ারী ঢাকার আরমানীটোলা ময়দানে এক সম্মেলনের ভেতর দিয়ে হাজী মোহাম্মদ দানেশের নেতৃত্বে গঠিত গণতন্ত্রী দল সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করে।৪৭

১৯৫১ সালের ২৭শে ও ২৮শে মার্চ 'পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ' নামে যে আরেকটি প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন গড়ে ওঠে, সেটার উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীও ছিল সমাজতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন। এই যুব সংগঠনের প্রথম ঘোষণা পত্রে পাকিস্তানের চরিত্র উন্মোচন করে বলা হয় :

আমরা কি চাহিয়াছিলাম এবং কি পাইয়াছি ?

আমরা পাকিস্তানের যুব সমাজ আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছি। প্রথম যেদিন পাকিস্তান কায়েম হয় সেদিন আমরা সমস্ত যুবক-যুবতী তরুণ-তরুণী আশা করিয়াছিলাম যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুইশত বছরের লুণ্ঠনে ও অত্যাচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত আমাদের সোনার দেশ আবার শিল্পে, শিক্ষায়, ধনে, সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে আমাদের সমাজের অর্থনীতি বৃটিশ পুঁজির কলঙ্কময় দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। এবং বৃটিশ সৃষ্ট জমিদারী প্রথার অবসান হইবে, কৃষক জমি পাইবে, এবং আমাদের সমাজ জীবনে নূতন প্রাণের জোয়ার আসিবে।

কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হওয়ার প্রায় সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পরেও আমরা গভীর লজ্জার সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, আমাদের দেশ এখনও বৃটিশ কমনওয়েলথ - এর শিকলে বাঁধা। এখনও পাকিস্তানে ধন-সম্পদ, যেমন-পাট, চা প্রভৃতি ব্যবসার উপর সেই বৃটিশ পুঁজির কর্তৃত্ব অব্যাহত। আজও মুষ্টিমেয় বিদেশী ও দেশী ধনিক আমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া ভোগ-বিলাসে কাল কাটাইতেছেন। ৪৮

যুবলীগের এই ঘোষণা ও দাবী বেকারত্বের সম্পূর্ণ অবসান, জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক যুবক–যুবতীর চাকুরী ও সৎভাবে জীবিকার্জনের নিশ্চয়তা, বেকারদের জন্যে সরকারী ভাতা দেয়ার দাবী তোলে। বিনা খেসারতে জমিদারী, জায়গীরদারী উচ্ছেদ ও কৃষকের হাতে জমি ছিল যুব লীগের দাবী। শ্রমিকের জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী, দৈনিক ৮ঘন্টা ও সপ্তাহে ৪৪ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ এবং অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা করার কথা কর্মসূচীতে বলা হয়। সমস্ত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্তকরণ এবং বড় বড় শিল্পগুলোর জাতীয়করণ ছিল তাদের অপর একটি দাবী।৪৯

১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি নাগাদ শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির পুনর্গঠন করে যে নতুন কৃষক–শ্রমিক পর্টি গঠন করা হয়, সে দলের কর্মসূচীর ভেতর ছিল: সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, বিনা খেসারতে জমিদারী ও জায়গীরদারী উচ্ছেদ করা, পাট ও তুলা ব্যবসা জাতীয়করণ ইত্যাদি। ৫০

এভাবে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩–৫৪ সালের ভেতর পূর্ববাংলায় প্রতিষ্ঠিত ও ক্রিয়াশীল প্রায় সব ক'টি প্রতিষ্ঠান কি রাজনীতিক, কি সাংস্কৃতিক, কি যুব সংগঠন, দেশে নতুন শোষণমুক্ত সমাজ তথা সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে এবং সে লক্ষ্যে দাবী ও কর্মসূচী দিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ওই সময় বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের এবং সাধারণভাবে প্রগতিশীলদেরকেও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ও পূর্ববঙ্গ সরকার গঠনকারী সহযোগীরা এবং তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক মোসাহেবগণ সন্দেহের চোখে দেখত, ভারতের চর, পঞ্চম বাহিনী, রাশিয়ার চর, ইসলামের শত্রু, পাকিস্তানের শত্রু ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িত করে জনতাকে বিভ্রান্ত করতে চাইত এবং এভাবে জনতা ও সচেতন প্রগতিশীল সংগঠন–কর্মী–নেতৃত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরীর অপচেষ্টা চালাত। তদুপরি জরিমানা, ক্রোক,লাঠি, গুলী, জেল, জুলুম, হুলিয়া, চাকুরীচ্যুতি ইত্যাদিসহ যাবতীয় নিপীড়ন সমাজতন্ত্রের চেতনাসম্পন্ন নেতা–কর্মীদের ওপর চালানো হত। মনে রাখা দরকার যে, সেই দুঃসহ পরিবেশের ভেতর পূর্ব বাংলার বিভিন্ন ছাত্র,সাংস্কৃতিক, যুব ও রাজনীতিক সংগঠন আর্থনীতিক শোষণ ও রাজনীতিক পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, সমাজতন্ত্রের দাবী উঠিয়েছে।

পূর্ব বাংলার ওপরে শোষণকে স্থায়ী ও নির্বিঘ্ন করার জন্যে এবং এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিক্ষোভ–প্রতিবাদ–প্রতিরোধ–আন্দোলন–সংগ্রামকে বিভ্রান্ত ও নস্যাৎ করার জন্যে যে ভাষাগত নিপীড়ন ও সংস্কৃতিগত চক্রান্ত একালে চালানো হয়, সেটার পেছনে যে ঔপনিবেশিক শোষণ ও জাতিগত নিপীড়ন ক্রিয়াশীল, তা উপলব্ধি করতে পেরেই বাঙালী মানবমন্ডলী শোষণ বিরোধী সংগ্রামকে প্রথমবারের মতো জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম বলে বিবেচনা করে। এভাবে তৎকালীন পূর্ববাংলায় ১৯৪৮ এবং ১৯৫২–এর দুই পর্যায়ের ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ

বিকাশের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ প্রভাব পড়ে। এ ব্যাপারে এককালের বামপন্থী কর্মী সরদার ফজলুল করিম মন্তব্য করেন, "৫২-এর বিস্ফোরণ পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক জীবনে বামপন্থী ও সমাজবাদী চিন্তার নতুন এবং অধিকতর শক্তিশালী এবং ব্যাপক পর্যায়ের সূচনা ঘটিয়েছে।"৫১

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচনে তৎকালীন শাসক মুসলিম লীগ এর মুখ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভার সকল সদস্য হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের কাছে নজীরবিহীনভাবে পরাজয় বরণ করে। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়লাভের প্রশ্নে যে ২১ দফা কর্মসূচী ক্রিয়াশীল ছিল, সেই কর্মসূচীতেও বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ, পাট ব্যবসা জাতীয়করণসহ নানাবিধ প্রগতিশীল সমাজতন্ত্র অভিমুখী কর্মসূচী ছিল।৫২

১৯৫৬ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মওলানা ভাসানী তৎকালীন পূর্ব বাংলার ওপর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক শোষক-শাসকগোষ্ঠীর চাপিয়ে দেয়া শ্রেণী ও অঞ্চলভিত্তিক শোষণের চিত্র তুলে ধরেন। ১৬ই জানুয়ারী থেকে ২২শে জানুয়ারী ১৯৫৬ পর্যন্ত ৭ দিন ওই অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। মওলানার নেতৃত্বে ওই সময় আওয়ামী লীগ, গণতান্ত্রিক দল, ছাত্র লীগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদ ও যুব লীগ ইত্যাদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা জনসভা অনুষ্ঠান করে। সভায় বক্তাগণ খসড়া শাসনতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করেন এবং ঐ শাসনতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ রাজনীতিক, আর্থনীতিক জীবনের কথা উল্লেখ করে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। আতাউর রহমান খান এই শাসনতন্ত্রকে 'কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের মুখে রচিত পূর্ববাংলার মৃত্যুপরওয়ানা' বলে অভিহিত করেন।৫৩ সভায় তাঁর ভাষণে মওলানা ভাসানী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলাকে নিদারুণভাবে শোষণের অভিযোগ আনেন এবং শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে :

> আমি আশঙ্কা করিতেছি, পূর্ব বাংলার উপর যদি নির্যাতন ও শোষণ অব্যাহত থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে এ প্রদেশের জনসাধারণের ভবিষ্যৎ বংশধর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে চিন্তা করিবে।৫৪

১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী কাগমারীতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানী তাঁর প্রদত্ত ভাষণে পুনরায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব বাংলার ওপর পরিচালিত আর্থনীতিক শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র বক্তব্য রাখেন। তিনি পাকিস্তানের দু'অংশের আর্থনীতিক সম্পূর্ণ ভিন্নতা ও

স্বাতন্ত্র্য কার্যত স্বীকার না করার জন্যে শাসকগোষ্ঠীকে অভিযুক্ত করেন। মওলানা বলেন যে, পূর্ব বাংলাকে 'লুণ্ঠনের জন্যে উভয় পাকিস্তানকে এক অর্থনীতির জোয়ালে আবদ্ধ' করেছে শাসকগোষ্ঠী। ভাসানী আরো বলেন যে, ধর্মের জিগীর তুলে শোষণ করে পূর্ব বাংলাকে ভিখারীর দেশে পরিণত করা হয়েছে। ভাসানী তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট ঘোষণা দেন যে: "মোট কথা পূর্ণ পার্লামেন্টারী শাসন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে আমাদের লক্ষ্যস্থল।"[৫৫] দৈনিক আজাদে কাগমারীর সম্মেলনে ভাসানীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় ঃ

> তিনি বলিয়াছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ যদি বন্ধ না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে, যখন পূর্ব পাকিস্তান হয়ত পশ্চিম পাকিস্তানকে জানাইবে 'আসসালামো আলায়কুম'। অর্থাৎ পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হইয়া যাইবে।[৫৬]

২৬শে মার্চ ১৯৫৭ তারিখে মওলানা ভাসানী এক রাজনীতিক–সাংগঠনিক বক্তব্য সম্বলিত প্রচারপত্রের মাধ্যমে সাড়ে চার কোটি বাঙালিকে ক্রীতদাস বানানোর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। [৫৭]

১৯৫৭ সালের ১লা ও ৩রা এপ্রিল তারিখে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় এতদঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব উত্থাপনকারী সদস্য মহীউদ্দীন আহমদ বলেন যে, গত নয়–দশ বছর ধরে পূর্ব বাংলাকে লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সৃষ্টি হয়েছে।

পরিষদের সদস্য শেখ মজিবুর রহমান বলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের দাবী কেবল পরিষদের নয়,নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই জনসাধারণ এই দাবী জানাতে বাধ্য হচ্ছে। এ দাবী আমাদের বাঁচার দাবী, জনসাধারণের বাঁচার দাবী। অপর একজন সদস্য আহসাবউদ্দীন আহমদ পূর্ব বাংলার ওপর পরিচালিত শোষণ ও এর স্বাতন্ত্র্যের কারণে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সমর্থন করে বলেন যে, যদি যুক্তফ্রন্টের ২১–দফার "১৯ নং দফার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায় করতে না পারি তাহ'লে আজকে এই আইন পরিষদে যারা সদস্য হয়ে এসেছি জনসাধারণ তাদের দফা রফা করে দেবে"। আহসাবউদ্দীন আহমদ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানী শোষক–শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব বাংলার ওপর চাপিয়ে দেয়া ঔপনিবেশিক শোষণের একটি চিত্র তুলে ধরেন।[৫৮] এ সময়টাতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ব্যয় ছিল নিম্নরূপ:

টেবিল ২৬
(কোটি টাকার অঙ্কে)

	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব খাতে	১৮৮	১,০০৮
কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতি	৫৪	২১৯
সাহায্য খাতে	১৮	৫৪
বিদেশী সাহায্য	১৫	৭৩
কৃষি খাতে	৯	৯৭
পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় সামরিক খাতে	৩৭	৬১২
ডাক ও তার	৩	১৩
আমদানী	২৮৯	৭৭১

এভাবে দেখা যাচ্ছে শ্রেণী ও আঞ্চলিক শোষণের ফলে একদিকে পাকিস্তানের প্রথম দশকেই পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন যেমন দাবী করা হয়েছে, তেমনি পূর্ব বাংলার স্বার্থে 'দুই অর্থনীতির তত্ত্ব' উঠে এসেছে এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে শোষণমুক্ত সুখী গণতান্ত্রিক জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীও জোরালোভাবে সামনে এসেছে। লক্ষণীয় যে, ১৯৫৭ সালের ২৬শে জুলাই মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা 'ন্যাপ' নামক যে অসাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার রাজনীতিক সংগঠনটি গড়ে ওঠে, সেটির কর্মসূচীর ভেতর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে জড়িয়ে ছিল।

জেনারেল আইয়ুবের শাসনামলে গোড়া থেকেই পূর্ব বাংলার ওপর শোষণ এত ভয়াবহ অবস্থার দিকে যেতে থাকে যে ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে 'দি পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকা বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যদিও চল্লিশের দশকের শেষভাগ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের ঐক্যের প্রধান সূত্র ছিল ইসলাম, কিন্তু ষাটের দশকে সংহতিকারী এই শক্তিটি বাতিল হয়ে গিয়ে তদস্থলে এসে গেছে উপযোগবাদী বা আর্থনীতিক শক্তি।[৫৯] পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর সহযোগী পূর্ব বাংলার অর্থমন্ত্রী পর্যন্ত বলেছিলেন যে, যদি দু'অংশের ভেতর বিরাজমান আর্থনীতিক বৈষম্য বেড়েই চলতে থাকে, তাহলে কেবল ইসলামি আধ্যাত্মিকতার বন্ধনের জোরেই আমরা আমাদের ওপর চাপানো সকল আর্থনীতিক বৈষম্যের বিষয় ভুলে যাবো, এটা আশা করা সঙ্গত হবে না।[৬০]

অবশ্য ওপরের এ দু'টি বক্তব্যে পূর্ব বাংলার ওপর চেপে বসা আঞ্চলিক

শোষণবৈষম্যের স্বীকৃতি থাকলেও শ্রেণী শোষণ ও বৈষম্যের কোনো উল্লেখ নেই। অথচ তৎকালীন পূর্ব বাংলার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ যুগপৎ আঞ্চলিক ও শ্রেণীক—এই দ্বিবিধ শোষণের শিকার হচ্ছিল। আর সমাজতন্ত্রের চেতনা উভয়বিধ শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলা ও এর জনমণ্ডলীর যে নাজুক ও বিপর্যস্ত অবস্থা, তা থেকেই উৎসারিত। যদিও একথাও সত্য যে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের আদর্শবাদী লক্ষ্য হিসেবে আইয়ুব শাসনের পূর্বে তথা পাকিস্তানের প্রথম দশকে এবং এমনকি পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে ও পূর্বে এতদঞ্চলের বাম কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল নেতা-কর্মী-সংগঠনের ভেতর তো বটেই, এমনকি সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলো এবং তাদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে থেকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী অগ্রাধিকার পেয়েছিল। যাহোক, আঞ্চলিক ও শ্রেণীক— এই দ্বিবিধ শোষণের প্রক্রিয়াতেই যে পূর্ব বাংলা তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল এবং এ প্রতিক্রিয়াতেই যে পূর্ব বাংলায় সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তা এত বিপুল হয়েছে, সে সত্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ দানেশের 'জনাব আইয়ুব খাঁর জবাবে' শীর্ষক পুস্তিকায় লক্ষণীয়। এতে বলা হয় :

> জনাব আইয়ুব খাঁর শাসনের আমলে দেশের নানাবিধ 'উন্নয়ন' করা হইয়াছে বলিয়া রেডিও, সরকারী দলের সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চ হইতে অহরহ প্রচার করা হইতেছে।
>
> স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে দেশের শিল্পের অগ্রগতি হইয়াছে এবং কলকারখানার সংখ্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৭ বৎসরেই ইহা ঘটিয়াছে। ইহা বিশেষ কোন সরকারের কৃতিত্ব নহে। তবে এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, গত ১৭ বৎসরে দেশে শিল্পের যে অগ্রগতি সম্ভব ছিল তাহা হয় নাই। আজও ইস্পাত শিল্প ও যন্ত্র নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। দেশের মূল সম্পদ এখনও আসে কৃষি হইতে। আজও দেশ অনগ্রসর কৃষি প্রধান দেশই রহিয়াছে।
>
> ইহা ছাড়া, শুধু সারা দেশের কলকারখানার সংখ্যা দ্বারা পাকিস্তানের মত দেশের উন্নয়নের পরিমাপ করা চলে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে— দেশের এই উভয় অংশে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলেও একই পর্যায়ে উন্নয়ন কার্য চলিতেছে কিনা তাহা একটি প্রধান বিচার্য বিষয়।
>
> এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, যদিও পূর্ব পাকিস্তান সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে তথাপি উহার অধিক অংশ পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত না হইয়া উহার সিংহভাগ ব্যয় করা হয় আদমজী, দাউদ, সায়গল, গান্ধারা প্রমুখ মুষ্টিমেয় বড় ধনিকের স্বার্থে। পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব এখানে গণনির্বাচিত সরকারের হাতে না দিয়া রাখা হইয়াছে সুদূর রাওয়ালপিন্ডিতে—বড় ধনিক গোষ্ঠীর পেটোয়া একটি

চক্রের হাতে। তদুপরি, পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, ব্যাংক, ব্যবসা প্রভৃতির উপর অবাধ অধিকার আদমজী, দাউদ, সায়গল, গান্ধারা প্রভৃতি মুষ্টিমেয় বড় ধনিকের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এসবের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন আজ অবহেলিত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর বৈষম্য বিরাজ করিতেছে।

দ্বিতীয়ত: দেশের উন্নয়নের প্রধান নিরীখ হইল জনগণের জীবন ধারণের উন্নয়ন। এদিকে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, আদমজী, দাউদ,গান্ধারা, সায়গল প্রমুখ সামান্য কয়েকটি ধনিক পরিবার শ্রমিকদিগকে শোষণ করিয়া বৎসরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করিতেছে। ইহাদের মুনাফার হার হইল শতকরা ২০০–৩০০ ভাগ, যা সভ্য দুনিয়ার কোন দেশেই নাই, কোন কোন কোম্পানী—যেমন গান্ধারা ইন্ডাষ্ট্রিজ গত ৪/৫ বৎসরে কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়াছে। অপরদিকে সমস্ত কলকারখানা যাহাদের শ্রমে চলে, সেই শ্রমিক শ্রেণী থাকে উপবাসী।

মুষ্টিমেয় বৃহৎ ব্যবসায়ী বাজারের কারসাজি দ্বারা জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়াইতেছে। এই ফটকাবাজী দ্বারা ইহারা কোটি কোটি টাকা লাভ করে। অপরদিকে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী হওয়ার ফলে জনগণের ঘরে ঘরে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।

ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গণ–বিরোধী আইয়ুব সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বড় বড় জোতদারদের জমির সিলিং ১০০ বিঘা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩৭৫ বিঘায় স্থির করিয়াছে। অপরদিকে, কৃষকের ভিতর শতকরা ৭৬ জন হইল ভূমিহীন ও গরীব।......

ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গণ–বিরোধী সরকারের এই সব নীতি ও কাজের ফলে আমাদের দেশের কৃষকগণ, যাহারা জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ, তাঁহারা অভাব, উপবাস ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া আছেন।

ইহাই হইল আইয়ুবী 'উন্নয়নের' আসল চেহারা। গ্রামের ওয়ার্কস প্রোগ্রাম হইয়াছে দুর্নীতির এক আখড়া। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা আসে পি.এল. ৪৮০ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত আমেরিকার দেওয়া গম বিক্রী হইতে। ইহাতে গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন যতটুকু হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী 'উন্নতি' হয় কতকগুলি দুর্নীতিপরায়ণ লোকের। এই দুর্নীতিপরায়ণ লোকগুলিই হইতেছে গ্রামে গ্রামে আইয়ুব সরকারের সমর্থক। প্রকৃতপক্ষে, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা ছড়াইয়া দুর্নীতির মাধ্যমে সরকার গ্রামে গ্রামে তাহার সমর্থক একদল টাউট সৃষ্টি করিয়াছে।

বস্তুত আইয়ুব সরকারের 'উন্নয়নে'র বদৌলতে সারা পাকিস্তানে আজ আদমজী, দাউদ, সায়গল প্রমুখ গুটিকয়েক ধনিক পরিবারের শোষণের সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিতেছে। বড় বড় ভূস্বামীরা অবাধে কৃষকদের শোষণ করিতেছে, ব্যবসায় মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের অবাধ কর্তৃত্ব কায়েম হইয়াছে এবং গ্রামে গ্রামে

দুর্নীতিপরায়ণ টাউটদের রাজত্ব চলিতেছে। পক্ষান্তরে শ্রমিক, কৃষক ও জনগণ দিন যাপন করেন অভাবে ও উপবাসে"। [৬১]

হাজী দানেশের ঐ পুস্তিকায় আরো বলা হয় :

আইয়ুব সরকারের আমলে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে মার্কিন পুঁজির শোষণও বিন্দুমাত্র কমে নাই। বরং মার্কিনী পুঁজির অনুপ্রবেশ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে এবং বর্তমানে মার্কিনী ঋণের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে উঠিয়াছে। দু'এক বৎসরের মধ্যে ইহার সুদ হিসাবে বৎসর বৎসর প্রায় ৫০ কোটি টাকার মুদ্রা খরচ করিতে হইবে। দেশটাই যেন মার্কিনী ঋণের নিকট বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

দেশের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন হইতে যে বৃটিশ পুঁজি নিয়োজিত ছিল তাহা এখনও রহিয়াছে। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিও নতুন করিয়া অনুপ্রবেশ করিতেছে। ইহারাও দেশের সম্পদ শোষণ করিয়া নিতেছে।[৬২]

একইভাবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ১৯৬৫ সালের ৪ঠা, ৫ই, ৬ই ও ৭ই জুনে অনুষ্ঠিত দলীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত 'ন্যাপের ১৪ দফা—জাতীয় মুক্তির কর্মসূচীতে শোষিত, নির্যাতিত, দরিদ্র এবং রাজনীতিক অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত জনগণের মুক্তির জন্যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি পরিহার—পূর্বক সম—সুযোগের অধিকার প্রদানকারী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। পার্টির কর্মসূচী আকারে গৃহীত দলিলে 'রাজনৈতিক বিশ্লেষণ'—এ বলা হয় :

মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের হাতে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ দ্রুত ও ক্রমবর্ধমানভাবে পুঞ্জিভূত হইয়া ওঠা এবং আমলাতন্ত্রের একটি নতুন ও শক্তিশালী ভূস্বামী ও শিল্প অভিজাত শ্রেণীতে রূপান্তর এমন এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে ছাড়া যাহার মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। [৬৩]

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার 'বাঁচার দাবী' হিসেবে তাঁর যে ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচী দেন তাতে পূর্ব বাংলাকে 'প্রদেশ' না বলে এটাকে 'স্টেট'—এর মর্যাদা দান এবং ছ'টি অত্যন্ত শক্তিশালী দাবীর মাধ্যমে এতদঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলে ধরলেও সেক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্রের চেতনা প্রচ্ছন্ন ছিল। ছয় দফায় শেখ মুজিব যেমন পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম

পাকিস্তানে সম্পদ পাচার ও স্তূপীকৃত হচ্ছে বলে আঞ্চলিক শোষণ-বৈষম্যের সত্য উন্মোচন করেছিলেন, তেমনি দেশের অর্থনীতিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিরও উল্লেখ করেছিলেন। মুজিব বলেছিলেন :

> "যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না"। [৬৪]

আবার ১৯৬৬ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে মওলানা ভাসানী ছয় দফা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন দাবীর সঙ্গে সঙ্গে 'দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাও প্রতিফলিত করিতে হইবে'। [৬৫]

১৯৬৬ সালের ৮ই জুন হাজী মোহাম্মদ দানেশ, মহীউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, দেওয়ান মাহবুব আলী, পীর হাবিবুর রহমান, মোজাফফর আহমদ, হাতেম আলী খান, ওসমান গণি, গোলাম মর্তুজা, নূরুল ইসলাম, ডঃ এম. এ. ওয়াদুদ প্রমুখ রাজনীতিক নেতা এক প্রচারপত্রে ৭ই জুন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে গণহত্যার প্রতিবাদে 'স্বায়ত্তশাসন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক' সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে জনগণকে আহ্বান জানান। তারা একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজি, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-এই ত্রিবিধ শোষণের ভিত্তিমূলকে উৎপাটন করার কথা বলেন। তাঁরা আরো বলেন যে, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া সুবিধাভোগী বড় ধনিক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে অনুন্নত রেখে চিরকাল শোষণ করার গরজে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী নস্যাৎ করতে চায়। ফলস্বরূপ, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আজ পর্বত প্রমাণ আর্থনীতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কতকগুলো আশু দাবী তোলেন (১) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ও জনগণের মালিকানায় মূল ও ভারী শিল্পসমূহ গড়ে তোলা। (২) ডলার ঋণ বর্জন করে জাতীয় সম্পদের ওপর ভিত্তি করে স্বাধীন অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ। (৩) সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি, ব্যাঙ্ক ,বীমা ও পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ। (৪) কৃষকের বিভিন্ন অধিকার ও সুযোগসহ তার হাতে জমি এবং (৫) শ্রমিকের যাবতীয় অধিকারসহ বাঁচার মত মজুরী। [৬৬]

১৯৬৭ সালের ৩০শে নভেম্বর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী রংপুরে অনুষ্ঠিত ন্যাপের বিশেষ অধিবেশনে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, দেশী বড় বুর্জোয়া এবং সামন্তবাদ'-এই ত্রিশক্তির শোষণে নিপতিত পূর্ব বাংলার জনগণকে স্বায়ত্তশাসন ও শ্রেণী শাসন মুক্তির অবিভাজ্য দাবীতে 'কৃষক-শ্রমিক তথা সর্বহারা মেহনতী মানুষের মুক্তির কর্মসূচী' বাস্তবায়নের সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহবান জানান। [৬৭]

৫

১৯৬৮–৬৯ এর বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান, শ্রমিক কৃষক সাধারণ জনতার অগ্রসরমানতা এবং সমাজতন্ত্রের ঐকমত্য

১৯৬৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সমগ্র পাকিস্তানে জেনারেল আইয়ুবের একনায়কতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এক নজীরবিহীন গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। তৎকালীন পূর্ব বাংলায় এ অভ্যুত্থান প্রচণ্ড বৈপ্লবিক গণ অভ্যুত্থানের রূপ নেয় এবং জেনারেল আইয়ুব ও তার শাসনের উচ্ছেদের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ক্ষমতা দখল ও ২৫শে মার্চ ১৯৭১-এ সামরিক আইন জারীর পরও এখানকার শিল্পাঞ্চল ও গ্রামে গ্রামে শ্রমিক-কৃষক জনতার বিক্ষোভ, ঘেরাও ও বৈপ্লবিক কার্যক্রম পুরোপুরি স্তিমিত না হয়ে দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকে। ১৯৬৮–৬৯ এর এই বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কিত কতিপয় দিক এখানে তুলে ধরতে চাই।

প্রথমত, এই অভ্যুত্থান তৎকালে সমগ্র পাকিস্তানে তথা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়ক্ষেত্রে সংঘটিত হলেও পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে এটা ছিল জেনারেল আইয়ুবের স্বৈরাচার ও একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সেকারণে তাঁকে ও তাঁর শাসনের উচ্ছেদের আশু লক্ষ্যের মধ্যে সীমিত, সেখানে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় এটা কেবল আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয় নি। এতদঞ্চলে এ অভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব শাসনের উচ্ছেদের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজির ঔপনিবেশিক শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভের সংগ্রাম। পূর্ব বাংলায় এ আন্দোলন-সংগ্রাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজি ও আমলা-সামরিক চক্র, মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্ত অবশেষের দ্বারা একযোগে পরিচালিত শ্রেণীক ও আঞ্চলিক শোষণের দ্বিবিধ প্রক্রিয়া সৃষ্ট ঔপনিবেশিক যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট এতদঞ্চলের আপামর শ্রমিক–কৃষক নিম্নবিত্ত সাধারণ জনতার বৈপ্লবিক গণসংগ্রাম। সুতরাং এ অভ্যুত্থানের যেমন আশু উদ্দেশ্য ছিল, তেমনি সুদূর প্রসারী লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষাও ছিল।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে ১৯৬৮–৬৯ এর বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান তাই কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। ১৯৪৭ সাল থেকে এতদঞ্চলের ওপর যে শোষণ–শাসন–নিপীড়নভিত্তিক ঔপনিবেশিক কাঠামো চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, তারই বিরুদ্ধে একটানা এবং একের পর এক প্রতিবাদ–বিক্ষোভ–প্রতিরোধ–আন্দোলন–সংগ্রামের একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে, একটা দ্বান্দ্বিক পথ পরিক্রমার ভেতর দিয়ে বিকাশের একটা পরিপক্ক অবস্থায় ১৯৬৮–৬৯ এর বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। কাজেই, তৎকালীন পাকিস্তানে এ অভ্যুত্থান কেবল আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও, পূর্ব বাংলায় সেটা ছিল শেষ বিচারে পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোর বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রাম। পূর্বের সংগ্রামগুলোর ধারাবাহিকতায় এ সংগ্রাম সংঘটিত হলেও এটা তাই সেগুলো অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপকতা নিয়ে, বৈপ্লবিক শক্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল। গুণগতভাবে এ অভ্যুত্থান তাই ছিল পূর্বাপেক্ষা ভিন্নতর এবং এটা পূর্ব বাংলার জনচেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল ও শেষাবধি দু'বছরের ভেতর এতদঞ্চলে পাকিস্তানকে ধ্বংস করেছিল। এ অভ্যুত্থান তাই স্বেচ্ছাচার ও অগণতান্ত্রিকতা, শোষণ ও ঔপনিবেশিকতা এবং বিজাতীয় বলে বাঙালী জনমণ্ডলীর কাছে প্রতিভাত ধর্মের ধূম্রজালে অস্তিত্ব রক্ষাকারী পাকিস্তানী রাষ্ট্র চেতনার (থিসিস) বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় কালে কালে বিকশিত ও শক্তিসঞ্চয়কারী একটা সম্পূর্ণ বিপরীত চেতনার (এ্যান্টিথিসিস) স্মারক।

তৃতীয়ত, কয়েকটি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনের সমবায়ে গঠিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (স্টুডেন্টস্ এ্যাকশন কমিটি বা এস. এ. সি) তাদের প্রদত্ত ১১–দফা কর্মসূচীর ভেতর দিয়ে নভেম্বর ১৯৬৮–তে শুরু হওয়া এ আন্দোলনকে১৯৬৯–এর জানুয়ারীর গোড়ার দিকে সংগঠিত রূপ দিতে চেয়েছিল এবং আন্দোলনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছিল। অতঃপর এতদঞ্চলের গণতান্ত্রিক দলগুলোও যথা আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মস্কোপন্থী) পি. ডি. এম. একত্রিত হয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (ডিমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি বা 'ডাক') গঠন করে তাদের ৮দফার মাধ্যমে আন্দোলনে নামে।

আন্দোলন শুরু করেছিল পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ। তাদের ১১–দফা কর্মসূচীতে ব্যাঙ্ক, বীমা ,ইনসিওরেন্স ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ,কৃষক–শ্রমিককে শোষণমুক্ত করার ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নানাবিধ দাবী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা–– এসবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের চেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একারণেই আন্দোলনে অতি দ্রুত

শ্রমিক–কৃষক নিম্নবিত্ত মেহনতি জনতা বিপুল সংখ্যায় ও ক্রমবর্ধমান আকারে যোগ দিয়েছিল এবং একে একটা অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানে রূপ দিয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'ডাক'–এ যোগদানকারী ন্যাপের ১৪–দফা কর্মসূচীতে বৃহৎ পুঁজি, সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ—এই তিন শত্রুকে জনগণের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে গণতন্ত্র ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ছিল। যাহোক, যদিও ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করেছিল এবং রাজনীতিক সংগঠনগুলো তাদের পেছনে পেছনে এতে যোগ দিয়েছিল, তথাপি অতি দ্রুত তা শহরের নিম্নবিত্ত, বস্তিবাসী, ভাসমান শ্রমজীবী জনতার আন্দোলনে পরিণত হয় এবং একই দ্রুততার সঙ্গে এখানকার শিল্পাঞ্চলগুলোর শ্রমিক শ্রেণী এতে জড়িয়ে পড়ে এবং একযোগে ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ায় এযাবৎ ভয়ঙ্করভাবে শোষিত কোটি কোটি কৃষক জনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে আন্দোলন যেমন শহরের সীমা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি ছাত্র সমাজ ও রাজনীতিক সংগঠনের চেয়েও শ্রমিক–কৃষক মেহনতি জনতা বেশী মাত্রায় এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ফলে আন্দোলন বিশালতা, ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করে। বস্তিবাসী, নিম্নবিত্ত, শ্রমিক–কৃষক এবং সাধারণ মেহনতি জনতার ব্যাপক অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে আন্দোলন অভাবিতপূর্ব জঙ্গীত্ব লাভ করে এবং বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। সেই সঙ্গে অতি দ্রুত নেতৃত্ব চলে যায় প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়া শ্রমিক–কৃষক মেহনতি জনতার হাতে। নিয়মতান্ত্রিকতার নিগড়ে আবদ্ধ গণআন্দোলন এভাবে চলে যায় অনিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র সংঘর্ষের পথে। কিন্তু, নির্দিষ্ট কোনো সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে না যাওয়ায়, মেহনতি জনতার নিজস্ব সংগঠনগত যথোপযুক্ত নেতৃত্ব না থাকায় এ অভ্যুত্থান স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর ভর করে এগিয়ে চলে এবং স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে।

তথাপি এ অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়েঃ (১) শ্রেণী ও অঞ্চলগত দ্বিবিধ শোষণের বিরুদ্ধে চেতনা বলিষ্ঠতম অভিব্যক্তি লাভ করে। (২) পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার আপামর জনতার গণরায় পরিষ্কার হয়।(৩) শ্রেণী শোষণ ও অগণতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোর ভিত্তি প্রকম্পিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শোষণমুক্ত শ্রমিক–কৃষকরাজ কায়েমের দাবী ওঠে। সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবী স্পষ্টতম ঐকমত্য হিসেবে সামনে আসে।

১৯৬৮–৬৯–এর আন্দোলনের ব্যাপকতা, বস্তিবাসী ও শহরে নিম্নবিত্ত– বিত্তহীন গোষ্ঠী এবং শ্রমিক–কৃষক জনতার অংশগ্রহণ ও দ্রুত নেতৃত্বে চলে আসা, আন্দোলন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে রূপ পাওয়া এবং শহর ছাড়িয়ে শিল্পাঞ্চল ও বিস্তীর্ণ গ্রাম জীবনে প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে ছড়িয়ে পড়া, নিয়মতান্ত্রিক পথ ছাড়িয়ে অনিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র পথে মোড় নেয়া এবং ঐতিহাসিক 'ঘেরাও আন্দোলন'–এর ব্যাপকতা, এবং সর্বোপরি শ্রেণী শোষণ ও অন্যায্য রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামো উৎখাত অভিমুখী পরিস্থিতি—ইত্যাদি

দৃষ্টে শেষাবধি কেবল পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজি ও শোষক–শাসক–সামরিক–আমলা গোষ্ঠীই নয়, বরঞ্চ পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণী, সামন্ত শ্রেণী ও বুর্জোয়া নেতৃত্বও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিমাঞ্চলের এবং পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দালাল–সহযোগীদের কথা বাদ দিলেও তৎকালে এতদঞ্চলের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতিক নেতৃত্ব এমনকি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলোও 'শান্তি প্রতিষ্ঠা'র দাবী তোলে, 'সহিংসতা' ও 'ঘেরাও' –এর বিরুদ্ধাচারণ করে। আর এ পটভূমিতেই ২৫শে মার্চ ১৯৬৯–এ সামরিক শাসন জারী হয়। এতদসত্ত্বেও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ১৯৬৮–৬৯–এর বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়েই তৎকালীন পূর্ব বাংলায় শ্রেণী শোষণের উৎখাত প্রয়াস মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ও ঐকমত্য বলিষ্ঠতম বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং বাম–কমিউনিস্ট–প্রগতিশীল সংগঠনের কর্মসূচীতে তো বটেই, এমনকি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দল–সংগঠন ও ছাত্র–সাংস্কৃতিক সংগঠনের দাবী–কর্মসূচীর ভেতরও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এভাবে সমাজতন্ত্র তৎকালীন পূর্ব বাংলায় জনমণ্ডলীর ঐকমত্যে পরিণত হয়।

৬

বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান ঃ মেহনতি জনতার অংশগ্রহণ ঘেরাও ও শ্রেণীচেতনা

পূর্ব বাংলায় ১৯৬৮–৬৯ এর বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান ছিল ১৯৪৭ সাল থেকে এতদঞ্চলের ওপর পরিচালিত পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজির ঔপনিবেশিক শোষণের ফল। এ অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী এবং রাষ্ট্র কর্তৃত্বধারী সামরিক–আমলাচক্রের বিরুদ্ধেও সংঘটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা বৃহৎ পুঁজি, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, আমলা–সামরিক চক্র—এগুলো একযোগে একই অন্যায্য কাঠামো চাপিয়ে রেখে জনগণকে শোষণ–শাসন করছিল। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারী করে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে জেনারেল আইয়ুব যে একনায়কত্ব কায়েম করেন, সেসময় ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে আর্থনীতিক উন্নয়নের নামে পূর্ব বাংলার ওপর শ্রেণী ও অঞ্চলগত শোষণ মারাত্মকভাবে চেপে বসে। পুঁজির মারাত্মক কেন্দ্রীভবন ঘটে এবং পশ্চিমাঞ্চলের ২২টি পরিবার শোষণের প্রতীকে পরিণত হয়। এসবের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ একটানা আন্দোলন–সংগ্রাম করে আসছিলো এবং অকাতরে আত্মাহুতি দিচ্ছিল। এক অসম্পূর্ণ হিসেবে৬৮ (সকল খবর না পাওয়ায় এবং সরকার কর্তৃক চেপে যাওয়ার কারণে) দেখা যায় যে, ১৯৬০ সালে ঢাকায় ১ জন, চট্টগ্রামে ২ জন ও কুমিল্লায় ৫ জন শাসকগোষ্ঠীর পুলিশ–মিলিটারীর গুলীতে আন্দোলনকালে নিহত হয়েছে। ১৯৬১ সালে রংপুরে ২জন নিহত হয়েছে। ১৯৬২ সালে ঢাকায় নিহত হয়েছে ৫ জন। ১৯৬৩ সালে সিলেটে ২ জন, নোয়াখালীতে ২ জন, যশোরে ৬ জন, কুমিল্লায় ৩ জন, কুষ্টিয়ায় ১ জন,

রাজশাহীতে ২ জন নিহত হয়েছে। ১৯৬৪ সালে খুলনায় ৫ জন, কুমিল্লায় ২ জন নিহত হয়েছে। ১৯৬৬ সালে কুমিল্লায় ১ জন, এবং পূর্ব বাংলার সর্বত্র ১১ জন নিহত হয়েছে। ১৯৬৭ সালে পাবনায় ১ জন ও রংপুরে ১ জন নিহত হয়েছে। ১৯৬৮ সালে ঢাকায় ৫ জন, বগুড়ায় ২ জন এবং চট্টগ্রামে ১ জন নিহত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৪ সালের দাঙ্গায় নিহতদের এবং ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন আহুত হরতাল চলাকালে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশ মিলিটারির গুলীতে নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা ধরলে এ ক'বছরে আন্দোলন-সংগ্রামে নিহতদের সংখ্যা ছিল আরো অনেক বেশী।

স্বেচ্ছাচারের নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত স্থাপনের এবং পূর্ব বাংলাকে উনিশ শতকীয় কায়দায় ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনের পরও ১৯৬৮ সালে জেনারেল আইয়ুবের সরকার সমগ্র পাকিস্তানে এই সরকারের ক্ষমতা দখলের এক দশক পূর্তি পালনের প্রয়াস পায় এবং উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দেয়ার কল্পকাহিনী ফেঁদে সর্বৈব মিথ্যাচার শুরু করে। আইয়ুব সরকার এই উৎসবকে "ডিকেড অব রিফর্মস্" বা উন্নয়নের দশক বলে আখ্যায়িত করে। আইয়ুব-মোনায়েমের এই কর্মকাণ্ড পূর্ব বাংলার জনগণের চেতনায় 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা'-এর মতো যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। পূর্ব বাংলার জনমনে এর প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক। তারা প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়ে। এভাবেই প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৮-৬৯-এর বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়। অবশ্য কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ আন্দোলন-অভ্যুত্থানের শুরুতে সহায়ক হয়। ১৯৬৮ সালের নভেম্বরের গোড়ার দিকে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে পুলিশের গুলীতে ছাত্র হত্যার[৬৯] প্রতিবাদে ১৯শে নভেম্বর সংগ্রামী ছাত্র সমাজের নামে ঢাকায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে এক ছাত্র গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এতে গৃহীত প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদসহ গ্রেফতারকৃত ছাত্র ও রাজবন্দীদের মুক্তি ও তাদের বিরুদ্ধে দেয়া মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও ভোটাধিকার ইত্যাদি দাবী করা হয়।[৭০]

২২শে নভেম্বর ঢাকায় বারো জন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট নাগরিক এক যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্রহত্যার প্রতিবাদ করেন এবং জনসভা, সংবাদপত্র ও মতামত প্রকাশের অলংঘনীয় গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবী জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন: কবি জসীমউদ্দীন, কবি সুফিয়া কামাল, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, মালিক আব্দুল বারী, কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, শহীদুল্লাহ কায়সার, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, সিরাজুদ্দীন হোসেন, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, ফজল শাহাবুদ্দীন, শামসুর রাহমান ও হাসান হাফিজুর রহমান।[৭১]

২৯শে নভেম্বর ১৯৬৮তে ঢাকা হাইকোর্ট বার সমিতির সদস্যরা এক বিক্ষোভ

মিছিল করেন।[৭২] ১লা ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখে পূর্ব বাংলার সাংবাদিকরা ঢাকার রাজপথে প্রতিবাদমুখর হয়ে নেমে আসেন। এর পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতির (ই.পি.ইউ.জে.) সভাপতি শহীদুল্লাহ কায়সারের সভাপতিত্বে প্রেসক্লাবে পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক ইউনিয়ন, সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারী এবং হকারদের যৌথ উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী আতাউস সামাদ, প্রেসক্লাবের সভাপতি এ. বি.এম. মুসা, সাংবাদিক আলী আশরাফ এবং পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী মিনহাজ বার্ণা। প্রতিবাদ সভায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সাংবাদিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র ও জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপিত হয়।[৭৩]

এ সময় পূর্ব বাংলার বিরোধী দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনীতিতে বন্দীমুক্তির ইস্যুটি বিশেষ প্রাধান্য পায়। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারীর পর পর কিংবা পরবর্তী পর্যায়ে আইয়ুব বিরোধিতার কারণে অনেক রাজনীতিক নেতা-কর্মী ও ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন ঃ ছাত্রনেতা মোঃ মনিরুজ্জামান (তারা) মছলাই, বদিউজ্জামান বড় লস্কর,মাহমুদ শেখ কামরুজ্জামান, পীযুষ কান্তি ধর, রেজোয়ান আজিজ, নূরে আলম সিদ্দিকী, রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, রাজনীতিক নেতা লালা শরদিন্দু, অজয় ভট্টচার্য, ননী চৌধুরী, মন্মথ নাথ দে, অমল সেন, আশু ভরদ্বাজ, সন্তোষ ব্যানার্জী, সুধাংশু বিমল দত্ত, মনি সিংহ,শেখ মুজিবুর রহমান, অমূল্য লাহিড়ী, তোফাজ্জল হোসেন, সত্যেন সেন, রণেন মৈত্র, জ্যোতিষ বোস, অজয় রায়, আব্দুল হালিম, আবদুল হাই, নগেন সরকার, পূর্ণেন্দু দস্তিদার , রতন সেন, শান্তি রঞ্জন সেন, মৃণাল কান্তি বারুরী, হীরালাল ভট্টাচর্য, শংকর বোস, আসদ্দর আলী, মোতাস্সের আলী, তাজউদ্দীন আহমদ, মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ, রনেশ দাশ গুপ্ত, হানিফ খান, আমজাদ হোসেন, রবি নিয়োগী, বিষ্ণু চ্যাটার্জী, মনিকৃষ্ণ সেন, সত্য রঞ্জন মৈত্র, ফণীভূষণ চক্রবর্তী, শ্রী চিত্তরঞ্জন সূতার, নূরুল ইস-লাম, মহিউদ্দিন আহমদ, সুলতান আহমেদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মণি, ওবায়দুর রহমান, হারুনর রশীদ, প্রতাপউদ্দীন, শফিকুর রহমান, রুহুল আমীন প্রমুখ। এতদ্ব্যতীত, সুখেন্দু রায়, সুখেন্দু দস্তিদার, নলিনী দাস, আবদুস সাত্তার, চৌধুরী হারুনর রশীদ, হেমন্ত সরকার,শচিন বোস, অনিল মুখার্জী, জ্ঞান চক্রবর্তী, আবদুল বাকী প্রমুখের নামে ছিল গ্রেফতারী পরোয়ানা। এঁদের বেশীর ভাগই গণঅভ্যুত্থানের কারণে মুক্তি পান। তবে কয়েকজন কোর্টের রায়ে বা শারীরিক কারণে আগেই ছাড়া পেয়েছিলেন।[৭৪]

১৯৬৮ সালের শেষ দিকে এভাবে আইয়ুবের স্বৈরাচার ও একনায়কত্বের বিরুদ্ধে রাজবন্দীদের মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, পূর্ব বাংলার ওপর এযাবৎ পরিচালিত ঔপনিবেশিক শোষণ ও বৈষম্য চিরতরে বন্ধ করার জন্যে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে এতদঞ্চলের জনগণ গণঅভ্যুত্থানের পথে এগোয়।

১লা ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখে ৬ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ন্যাপ ভাসানী, কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের যৌথ জনসভার ব্যাপারে প্রচারের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী, মশিউর রহমান, শ্রমিক ফেডারেশনের সিরাজুল হোসেন খান, কৃষক সমিতির আবদুল হক ঢাকার বিভিন্নস্থানে পথ সভায় বক্তৃতা করেন। এর আগে ন্যাপের কাপ্তান বাজার অফিস থেকে পথসভার জন্যে একটা মিছিল বের করা হয়। ওই দিন লাইসেন্স ও ভাড়ার প্রশ্নে বিরোধে পুলিশ ঢাকার অটোরিকশা চালকদের প্রহার করলে ক্ষুব্ধ অটোরিকশা চালকগণ এর প্রতিবাদে ২রা ডিসেম্বর ধর্মঘট ডাকে। তারা ভাসানীর বায়তুল মোকাররম জনসভায় যোগদান করে এবং ভাসানী ন্যাপ তাদের পরের দিনের ধর্মঘটকে সমর্থন করে। এদিকে ৬ই ডিসেম্বর জুলুম বিরোধী দিবস পালনার্থে ভাসানী ন্যাপ, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করে।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখে ঢাকার পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন ন্যাপ সভাপতি মওলানা ভাসানী। তিনি এ সভায় সভাপতিত্বও করেন। এতে আরো ভাষণ দেন ন্যাপের সেক্রেটারী মোহাম্মদ তোয়াহা, কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবদুল হক এবং শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল হোসেন খান। সভায় মওলানা ভাসানী বলেন যে, জনগণের দাবীগুলো মেনে না নেয়া হলে দেশব্যাপী তীব্র গণবিক্ষোভ দেখা দেবে। জনগণকে অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাধ্যমে কাবু করা যায় না। দেশব্যাপী গণআন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করে মওলানা ভাসানী আইয়ুবকে পদত্যাগের আহ্বান জানান। তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও গভর্ণর মোনায়েমকে তাদের ভবিষ্যৎ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করে দেন এবং বলেন যে, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবীর প্রতি উপেক্ষা চলতে থাকলে এ অঞ্চলের জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন পূর্ব বাংলা গঠন করবে।

পল্টনের জনসভার পর সেখান থেকে এক বিশাল মিছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলায় স্বৈরাচারের দুর্গ বলে চিহ্নিত কুখ্যাত গভর্ণর আবদুল মোনায়েম খানের সরকারী বাসভবন গভর্ণর হাউজ ঘেরাও করে।[৭৫] এই ঘেরাও কালে পুলিশের সাথে জনতার ইট পাটকেল বিনিময় হয় এবং সংঘর্ষ বাঁধে। অতঃপর গণমিছিল ইফতার বিরতির জন্যে বায়তুল মোকাররমের সম্মুখে আসে। ওই সময় ধর্মঘটী অটো রিকশা চালকেরা ৭ই

ডিসেম্বর হরতাল ঘোষণার দাবী উত্থাপন করে। যদিও মওলানা ভাসানী ইতিপূর্বে ১২ই ডিসেম্বর হরতালের কর্মসূচী দিয়েছিলেন, তথাপি তিনি অটোরিকশা চালকদের দাবী মেনে নিয়ে ৭ই ডিসেম্বর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমস্ত ঢাকা শহরে সর্বাত্মক হরতাল পালনের ঘোষণা দেন। অতঃপর হাজার হাজার জনতার এক মিছিল হরতালের কর্মসূচী জানিয়ে দেবার জন্যে শহরের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।

৭ই ডিসেম্বর সমগ্র ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। সরকার হরতাল নস্যাৎ করার জন্যে এদিন ১৪৪ ধারা জারী করেছিল। কিন্তু তাতেও জনতা বাধ মানে নি। সকল যানবাহন বন্ধ ছিল। দু'একটা স্টেট বাস জোর করে চালানোর চেষ্টা করায় নগরীর বিভিন্ন এলাকায় জনতা মারমুখী হয়ে ওঠে এবং উত্তেজনা চরমে ওঠে। নীলক্ষেত এলাকায় পুলিশের গুলী বর্ষণে একটি ইলেকট্রনিক্স দোকানের বন্ধ দরজার ভেতরে অবস্থানকারী ইসহাক (২৮) এবং ওয়াপদার কর্মচারী মজিদ (৩০) গুলীবিদ্ধ হন। মজিদ হাসপাতালে দুপুরের দিকেই মারা যান। এতে সারা নগরীতে উত্তেজনা তুমুল আকার নেয়। সন্ধ্যায় পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। জনতার সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয় যেখানে-সেখানে।

৭ই ডিসেম্বর গুলী বর্ষণের প্রতিবাদ করে বিবৃতি প্রদান করেন পূর্ব বাংলা হাইকো-র্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এস. এম. মুর্শেদ এবং ন্যাপের নেতৃবৃন্দ। জাতীয় পরিষদের এই দিনের অধিবেশনে ন্যাপের সদস্য মশিউর রহমান পুলিশের গুলীবর্ষণের ঘটনা জানালে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের ভেতর ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক আরম্ভ হয়। প্রতিবাদ করে বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ পরিষদ থেকে ওয়াক আউট করেন এবং মিছিল করে পুলিশের গুলীতে নিহত মজিদের লাশ দেখার জন্যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গমন করেন।[৭৬]

এদিকে ১১ই ডিসেম্বর সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকার সাংবাদিকরা ধর্মঘট পালন করেন। এদিন শহীদুল্লাহ কায়সারের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রেসক্লাবে।

১২ই ডিসেম্বর সমগ্র পূর্ব বাংলায় অভূতপূর্ব হরতাল পালিত হয়। এই হরতালের আহবান জানান ন্যাপ ভাসানী, আওয়ামী লীগ, মস্কোপন্থী ন্যাপসহ অন্যান্য সংগঠন। এছাড়া বিচারপতি মুর্শেদ, ২০ জন পরিষদ সদস্যসহ আরো অনেকে হরতাল পালনের পক্ষে বিবৃতি দেন। হরতাল চলাকালে ঢাকায় ভাসানীর নেতৃত্বাধীন একটি মিছিলে পুলিশ আক্রমণ চালায়।[৭৭] হরতালের দিন চট্টগ্রামে পরিস্থিতি চূড়ান্ত আকার নেয়। তথায় পুলিশ দু'টি স্থানে গুলী বর্ষণ করলে ১২ ব্যক্তি আহত হয়। সরকার এক প্রেসনোটে এ ঘটনা সম্পর্কে বলে :

চট্টগ্রামের কাছে ফৌজদারহাট রেলস্টেশনে সকাল সাড়ে ছটায় ক্ষিপ্ত জনতা খাদ্য শস্য বাহী একখানি মালগাড়ি আক্রমণ করে। স্টেশনে উপস্থিত রেলপুলিশ ট্রেনটিকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। তখন জনতা পুলিশকে আক্রমণ করে। পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করায় আত্মরক্ষার্থে পুলিশ গুলীবর্ষণ করে। এখানে তিন ব্যক্তি আহত হয়।...... পাহাড়তলীতেও আত্মরক্ষার্থে পুলিশ গুলী বর্ষণ করলে ৯ ব্যক্তি আহত হয়।[৭৮]

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষ থেকে মশিউর রহমান ঘোষণা করেন যে, মওলানা ভাসানী ২৯শে ডিসেম্বর হতে ঘেরাও আন্দোলন আরম্ভ করবেন। তিনি বলেন, ন্যাপ কর্মীগণ শান্তিপূর্ণভাবে থানা, মহকুমা এবং ডি. সি.-দের ঘেরাও করে তাদের দাবী দাওয়া পেশ করবে। এই আন্দোলনে থাকবে শ্রমিক, কৃষক এবং সাধারণ মানুষ।

বস্তুত, ১৯৬৯ সালের বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানকালে মওলানা ভাসানী তৎকালীন পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরে প্রথম সফল ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা ঘটান। এসময় তাঁর উদ্‌যোগে পাকশী, মহীপুর, সন্তোষ, শিবপুর এমনকি খোদ ঢাকায় অনেকগুলো বিশাল কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালে এগুলোকে লাল টুপি সমাবেশ নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৭৮ক]

২৯শে ডিসেম্বর ১৯৬৮-তে পাবনায় ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। সেখানকার টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় ভাসানী বলেন, 'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যবস্থার অধীনে তাঁর দল আগামী সাধারণ নির্বাচন বর্জন করবে। তিনি বলেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে নয়, বরং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে এক বিরাট গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি সকল বিরোধী দলের ঐক্য কামনা করেন। এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন পাবনা জেলা ন্যাপের সভাপতি মীর্জা আবদুল আওয়াল। বক্তৃতা করেন পাবনা জেলা ন্যাপের সেক্রেটারী আবদুল মতিন ও কৃষক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক আলাউদ্দিন আহমদ। এই সভার শেষেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঐতিহাসিক 'ঘেরাও আন্দোলন'-এর সূচনা ঘটে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সভাস্থল থেকে একটি জঙ্গী মিছিল পাবনার ডেপুটি কমিশনারের বাড়ি ঘেরাও করে। ২৯শে ডিসেম্বরে শুরু হওয়া ঘেরাও আন্দোলন কেবল পাবনা জেলাতেই সীমিত ছিল না। ওই দিনই ঢাকা জেলার নরসিংদী থানার হাতিরদিয়ায় ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা ঘটান পরবর্তীতে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শহীদ আসাদুজ্জামান। হাতিরদিয়ায় তাঁর নেতৃত্বে যে শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে উঠেছিল, ওই সংগঠনই কৃষকজনতাকে নিয়ে ঘেরাও আন্দোলন সংঘটিত করে।[৭৯]

২৯শে ডিসেম্বর তারিখে যশোরের নড়াইলেও জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়।

এখানে কয়েকজন কৃষককর্মী আহত হয় এবং বহু সংখ্যক গ্রেফতার হয়।

২৯শে ডিসেম্বরে হাতিরদিয়ায় আসাদের নেতৃত্বে কৃষকেরা সার্কেল অফিসারের অফিস ঘেরাও করেছিল। কৃষকদের হটাবার জন্য পুলিশ বেপরোয়া গুলী বর্ষণ করে। সেসময় এই ঘটনা সম্পর্কে এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়েছিল:

> ২৯শে ডিসেম্বর ঢাকা জেলার মনোহরদী থানাতে হাতিরদিয়া বাজারে বিকেল বেলা স্বাভাবিক বেচাকেনা চলতে থাকাকালে ছাত্রসহ কিছু লোক বাজারে আসে এবং বলপূর্বক দোকানপাট বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করে। তারা বাজারে পাট ও অন্যান্য মালামাল বয়ে আনা গরুর গাড়িগুলোও আক্রমণ করে। সেখানে উপস্থিত একদল পুলিশ এতে বাধা দেয় এবং দোকান ও ব্যবসার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার জন্য তাদের অনুরোধ করে। তারা পুলিশের অনুরোধে কর্ণপাত না করলে গোলমাল থামানোর জন্য পুলিশ ৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের রমিজউদ্দীন ব্যাপারীর দোকান কাম গুদামে নিয়ে আটক করা হয়। অচিরেই ছাত্রসহ দু'শ লোকের এক জনতা উক্ত দোকান আক্রমণ করে এবং দোকানের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। এমনকি তারা দোকানে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে। এবং দোকানের মধ্যে অবস্থানকারী পুলিশের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে তিন জন পুলিশ আহত হয়। এরপর তারা দোকান ভেঙ্গে ঢুকে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের পুলিশের হেফাজত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। নিজেদের সম্পূর্ণ পরাভূত দেখতে পেয়ে আত্মরক্ষার্থে এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের নিজেদের হেফাজতে রাখার জন্য পুলিশ গুলী বর্ষণ করে। গুলী বর্ষণের ফলে ৩ ব্যক্তি নিহত হয় এবং অপর ১ জন আহত হয়।[৮০]

এই সময় হাজী মোহাম্মদ দানেশসহ বহুনেতা স্থানে স্থানে কৃষক জনতার ওপর অত্যাচার ও গুলীবর্ষণের প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেন।

১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে 'কৃষক সমিতির ডাক' শিরোনামায় কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র, জনতা ও রাজনীতিক সংগঠনগুলোকে স্বৈরাচারী জুলুম বন্ধ করা, মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং পুঁজিবাদ সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে খতম করে শ্রমিকরাজ হিসেবে সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখ্য যে, এ সময়ে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনীতিক সংগঠন নির্বাচনভিত্তিক এবং কেবলই শহরকেন্দ্রিক যে আন্দোলন সংগঠন ও সংঘটনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তেমন আন্দোলন দ্বারা যে জনতার প্রকৃত স্বার্থ ও অভিষ্ট লক্ষ্য শেষাবধি হাসিল হবে না সে ব্যাপারেও প্রচারপত্র মারফৎ সচেতন করে দেয়া হয়। প্রচারপত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

৮ই জানুয়ারী হইতে ১৫ই জানুয়ারী গ্রামে গ্রামে হাতিরদিয়া ও নড়াইলে গণহত্যা, ধরপাকড় ইত্যাদি জুলুমের বিরুদ্ধে জনসভা ও ঘেরাও মিছিল করুন।

শুধু শহরের আন্দোলনে —

স্বৈরাচারী সরকারের জুলুম বন্ধ হইবে না — সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের দুর্নীতি, দৌরাত্ম ও ঘুষ বন্ধ হইবে না—সার্টিফিকেট প্রথা, মালক্রোক, বডিওয়ারেন্ট বন্ধ হইবে না--আখ ও পাটের ন্যায্য মূল্য কৃষকেরা পাইবে না—নদী শিকস্তি জমির খাজনা মওকুফ হইবে না—নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমান যাইবে না—বিড়ি শ্রমিক, ফ্যাক্টরী শ্রমিক ও ভূমিহীন মজুরদের জীবন রক্ষার জন্য ন্যায্য মজুরী পাওয়া যাইবে না—বন্যা পীড়িত এলাকায় ও গ্রামে গ্রামে পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা চালু করা যাইবে না এবং খাজনা ও লোনের টাকা মাফ পাওয়া যাইবে না—কৃষির উন্নতির জন্য পানি সেঁচের ব্যবস্থা হইবে না—বাস্তুহারা মোহাজেরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইবে না—জেলে, মাঝি, তাঁতি, কুমার, কামারদের উন্নতির ব্যবস্থা হইবে না—মুসলমানদের জন্য হজ্বের কার্ড পাওয়া যাইবে না—

—মাথাভারী শাসন কমাইয়া গরীব কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না—বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা যাইবে না—স্কুল কলেজের ছাত্রদের বেতন, পরীক্ষার ফিস, পুস্তকের দাম কম হইবে না—বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল হইবে না—প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও সার্বজনীন ভোটাধিকার কায়েম হইবে না—

পূর্ব বাংলার সাড়ে ছয় কোটি মানুষের জীবনমরণ সমস্যা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রচলন করা সম্ভব হইবে না—ভয়াবহ বন্যার স্থায়ী প্রতিরোধের ব্যবস্থা হইবে না—রাজবন্দীদের মুক্ত করা সম্ভব হইবে না—পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সেন্টো, সিয়াটো যুদ্ধ চুক্তি বাতিল হইবে না—সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ খতম হইয়া কৃষক মজুর রাজ সমাজতন্ত্রবাদ কায়েম হইবে না। ততদিন—যতদিন পর্যন্ত পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাড়ে ছয় কোটি মানুষের বাষট্টি হাজার গ্রামে চারি হাজার ইউনিয়নে আন্দোলনের ঢেউ ছড়াইয়া পড়িবে না, ততদিন মুক্তি নাই।

তাই আজ দল মত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দলের, ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবর্গ ও কর্মীদের নিকট আমার আকুল আবেদন কৃষক সমিতির সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া হাতে হাত মিলাইয়া এই জুলুম বিরোধী দিবস সাফল্যমন্ডিত করিয়া তুলিতে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করুন।

আমি, আমার ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক সমিতি যে কোন রাজনৈতিক দলের সহিত বর্তমান স্বৈরাচারী সরকারের জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে কোন আন্দোলনে পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া সর্ব প্রকার ত্যাগ বরণ করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করিব না—একমাত্র নির্বাচনের (ইলেকশনের) জন্য কোন যুক্ত ফ্রন্টে

যোগদান করিব না।[৮১]

কৃষক সমিতি কর্তৃক জনগণের অধিকার, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে শহরের সঙ্গে পূর্ব বাংলার সর্বত্র গ্রামাঞ্চলে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানের পর পর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী আসে ছাত্র সমাজের কাছ থেকে। ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৬৯ তারিখে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ, ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপ এবং ছাত্রলীগ—এ তিনটি ছাত্রসংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডাকসু' কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও নানাবিধ সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী সম্বলিত তাদের ঐতিহাসিক '১১-দফা' দাবী উত্থাপন করেন। এই ১১-দফা কর্মসূচী অনতিকালের মধ্যেই আন্দোলনের প্রাণবস্তুতে পরিণত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাদের উত্থাপিত কর্মসূচীতে বলেন ঃ

> স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘদিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসনে শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র জনতা আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই অবস্থায় সরকার বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের দিকে আগাইয়া আসিতেছে না। সম্প্রতি দুই একটি দিবস ঐক্যবদ্ধভাবে পালন করা হইলেও কর্মসূচী ভিত্তিক কোন ঐক্যফ্রন্ট গড়িয়া উঠিতেছে না।
> আমরা ছাত্রসমাজও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত দাবীসমূহের ভিত্তিতে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করিয়া ব্যাপক গণআন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিবার জন্য সকল সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি। [৮২]

ছাত্রদের প্রদত্ত ১১-দফা কর্মসূচী ৪ঠা জানুয়ারী ঘোষিত হওয়ার পর পর ৮ই জানুয়ারী ৮টি রাজনীতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে ''গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ'' (ডাক) গঠনপূর্বক তাদের আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে।[৮৩]

জানুয়ারী মাসের শুরু থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ-প্রতিবাদ, মিটিং-মিছিল চলতে থাকে। ১৭ই জানুয়ারী থেকে ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিদিন ছাত্র ধর্মঘট, সমাবেশ, বটতলায় সভা এবং বিক্ষোভ-মিছিল চলে। প্রতিদিনই পুলিশ ও ই.পি.আর-এর সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ হয়। বহু ছাত্র ও সাধারণ লোক গ্রেফতার হয়, লাঠি-গুলি-টিয়ার গ্যাসে আহত হয়, অসংখ্য গ্রেফতার হয়।

২০শে জানুয়ারী ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের

বটতলায় হাজার হাজার লাঠিধারী জঙ্গী ছাত্র সমবেত হয়ে সভা অনুষ্ঠান করে পূর্বের দিনগুলোর পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে। অতঃপর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের হয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সম্মুখ দিয়ে গিয়ে মিছিলটি যখন রশীদ বিল্ডিং অতিক্রম করছে তখন পুলিশ গতিরোধ করলে মিছিল দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রথম অংশ পুরনো ঢাকার সড়ক পার হয়ে বাহাদুর শাহ্ পার্কে শেষ হয়। এদিকে মিছিলের শেষাংশ রশীদ বিল্ডিং-এর নিকটেই পুলিশের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কোনোরকম সতর্কবাণী না দিয়েই পুলিশ গুলী ছোঁড়ে এবং খুব কাছে থেকে করা গুলীতে আসাদুজ্জামান মারাত্মক আহত হন। ছাত্ররা তাকে মেডিকেল কলেজের জরুরী বিভাগে বয়ে নিয়ে যাবার আগেই তিনি মারা যান (দুপুর দু'টো সময়)। ওই সময় পুলিশের গুলীতে আরো পাঁচজন আহত হন।[৮৪] আসাদ ছিলেন আইনের ছাত্র এবং মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা। তিনি হাতিরদিয়ায় মাত্র ক'দিন পূর্বে কৃষক সমিতির উদ্যোগে সংগঠিত ও সংঘটিত 'ঘেরাও আন্দোলন'-এ নেতৃত্ব দেন। হাতিরদিয়ায় তিনি কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেন। এই আসাদের মৃত্যুর খবর চারদিকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং অভূতপূর্বভাবে ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব বাংলার জনগণকে আন্দোলিত করে। তাদের এযাবৎকার পরিচালিত আন্দোলন এবার প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে।

আসাদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে সারা ঢাকা নগরীতে শোক নেমে আসে। চারদিক থেকে দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী ও জনতা মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হন। বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গও হাসপাতালে আসেন। দুপুর ২-৩০ মিনিটে অশ্রুসজল নয়নে ছাত্র-ছাত্রীরা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে এক শোক সভা করেন। দুপুর তিনটায় বিশাল এক শোক মিছিল বের হয়। দুই মাইল লম্বা এই মিছিল ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে শত শত ই.পি.আর-এর বাধা ও তাদের তাক করা রাইফেলের ব্যুহ অতিক্রম করে। মিছিল শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

আসাদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সমগ্র পূর্ব বাংলায় তিনদিনের শোক ঘোষণা করে। এতদ্ব্যতীত, ২১শে জানুয়ারী হরতাল, ২২শে জানুয়ারী শোক মিছিল এবং ২৩শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় মশাল মিছিল।[৮৫] এই হত্যাকাণ্ডে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দাজ্ঞাপন করে প্রতিবাদ জানায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং অনেকগুলো রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।

২১শে জানুয়ারী ভোর চারটায় ট্রাকে করে আসাদের লাশ নিয়ে যাওয়া হয় হাতিরদিয়ায়। এদিন অত্যন্ত সফলভাবে হরতাল হয় ঢাকায়। সকল স্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। এদিন পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় শহীদ আসাদের গায়েবানা জানাজা। জানাজার পর লাখো মানুষের মিছিল বের হয় ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে। মিছিলের অগ্রভাগে বাঁশের আগায় আসাদের রক্তমাখা শার্ট বহন করা হয়।[৮৬] আসাদের

হত্যাকাণ্ডে সমাজের সর্বস্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সে সময় সংবাদপত্রগুলির সংবাদ পরিবেশনেও বেদনা ও ক্রোধ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[৮৭]

এসময়কার জনচেতনা ও আবেগ ধরা পড়েছে বাংলাদেশের তরুণ প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিশীল সব কবির লেখায়। শামসুর রাহমান তাঁর 'আসাদের সার্ট' কবিতায় লেখেন :

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের সার্ট
উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায়।

....

ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রৌদ্দুর শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে সার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি-চুড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচে-কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়
আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক,
আসাদের সার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।[৮৮]

২৩শে জানুয়ারী যে মশাল মিছিল বের হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণের বটতলা থেকে,তা ছিল 'পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বৃহত্তম মশাল মিছিল'। বিশ্ববিদ্যালয় বটতলা থেকে শুরু হয়ে এই মিছিল ঢাকা নগরী ঘুরে এসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শেষ হয়। সেখানে ২৪শে জানুয়ারী হরতালের কর্মসূচী ঘোষিত হয়। উল্লেখ্য যে,এই মশাল মিছিলে সকল স্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়।

২৪শে জানুয়ারী হরতাল বানচাল করার জন্যে ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বেপরোয়া গুলীবর্ষণসহ অভূতপূর্ব তাণ্ডব চালায়। এদিন ঢাকায় জনতার ঢল নামে পথে পথে। সেক্রেটারিয়েট আক্রমণ করে জনতা এবং এর একটি অংশ পুড়িয়ে দেয়া হয়। ন্যাশনাল ট্রাস্ট পেপারের অফিস, যেখান থেকে মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান প্রকাশিত হতো, সেটা জনতা পুড়িয়ে দেয় এবং সেই সঙ্গে পরিষদের সরকার দলীয় সদস্য এন.এ. লস্করের বাড়িও পোড়ানো হয়। সেক্রেটারিয়েটের সামনে সেনাবাহিনীর গুলীতে প্রথমে মারা যায় রুস্তম। আরেকস্থলে পরে শহীদ হয় নব কুমার

স্কুলের ছাত্র মতিয়ুর। এতে করে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পল্টন ময়দানে দুপুরে অনুষ্ঠিত জানাজায় জনসমুদ্র সৃষ্টি হয়। জানাজা শেষে পল্টন থেকে লাখো মানুষের মিছিল পুরনো ঢাকার রাস্তা ঘুরে এসে সমবেত হয় তৎকালীন ইকবাল হলের (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) মাঠে।

এই ২৪শে জানুয়ারীই পরবর্তীকালে গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসেবে আখ্যায়িত হয়।

২৪শে জানুয়ারী ঢাকা শহরে, আদমজীনগরে, নারায়ণগঞ্জ শহরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের গুলীবর্ষণে, টিয়ার গ্যাস ও ব্যাটন চার্জে ২ জন নিহত এবং নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজের ক'জন অধ্যাপকসহ কমপক্ষে ৩০ জন আহত হন। খুলনার খালিশপুর ও দৌলতপুর এলাকায় ঐদিন পুলিশের গুলীতে ৩ জন নিহত এবং বহু সংখ্যক আহত হয়।

ঢাকায় ২৪শে জানুয়ারী সন্ধ্যার দিকে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভর্ণর আবদুল মোনায়েম খানের প্রাদেশিক সরকার সেনাবাহিনীকে তলব করে তাদের হস্তে ঢাকা শহরের নিয়ন্ত্রণভার ছেড়ে দেয় এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী ও বলবৎ রাখার কথা জানায়। মোনায়েম খান নিজে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে ঘোষণা দেন।

২৫শে জানুয়ারী ঢাকায় সেনাবাহিনী ও ই.পি. আর. বেপরোয়া গুলী বর্ষণ করে জনতার ওপর। এদিন নাখালপাড়ায় বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় গৃহবধু আনোয়ারা বেগম নিহত হন।

২৫শে জানুয়ারী থেকে ৩০ শে জানুয়ারী ১৯৬৯ পর্যন্ত ঢাকা নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ বন্দর, ডেমরা, খুলনাসহ পূর্ববাংলার আরো বিভিন্ন স্থানে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। প্রত্যেকদিন ঢাকাসহ সর্বস্থানে মানুষ সান্ধ্য আইন লংঘন করে এবং সেনাবাহিনী, ই পি আর ও পুলিশের গুলীতে অকাতরে প্রাণ দেয়, অসংখ্য আহত হয়। এছাড়া গ্রেফতারও হয় বহুসংখ্যক। এ সময় প্রতিদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালের তরফ থেকে সান্ধ্য আইনের বিরতির ফাঁকে ফাঁকে অগণিত আহতের জন্যে ব্লাড ব্যাংকে রক্তদানের আহ্বান জানানো হয় বারংবার জনগণের প্রতি। [৮৯]

এরপর কয়েকদিনে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে ছিল গণঅভ্যুত্থানের মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত আইয়ুব সরকার কর্তৃক ৬ই ফেব্রুয়ারী জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের বিষয়ে আশ্বাস প্রদান এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী 'দেশ রক্ষা আইন ও অর্ডিন্যান্সের ' প্রয়োগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দী অবস্থায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলী করে হত্যা করা হয়। কিন্তু সরকারী ভাষ্যে বলা হয় যে, তিনি পালাতে গিয়ে প্রহরীর হাতে নিহত হয়েছেন। জনগণ এই ভাষ্য বিশ্বাস করেনি। তাদের মনে অবিশ্বাস ও ঘৃণা তীব্রভাবে সৃষ্টি হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী এক

ভয়ানক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ঢাকায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জনসভায় লাখো মানুষের সমাগম হয়। সভায় মওলানা বলেন, প্রয়োজন হলে ফরাসী বিপ্লবের মতো জেলখানা ভেঙ্গে শেখ মুজিবকে মুক্ত করে আনব। ভাসানী আরো ঘোষণা দেন যে দু'মাসের মধ্যে ১১-দফা কায়েম ও রাজবন্দীদের মুক্তি না দেয়া হলে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হবে। এই সভার প্রারম্ভে সার্জেন্ট জহরুল হকের জন্যে গায়েবী জানাজা পড়া হয়। জনতার বিশাল মিছিল আজিমপুরের দিকে রওয়ানা হয়। পথে বিক্ষুব্ধ জনতা প্রাদেশিক সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী সুলতান আহমদ এবং পূর্তমন্ত্রী মংশুপ্রু'র আবদুল গণি রোডস্থ সরকারী বাসভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতদ্ব্যতীত উত্তেজিত জনতা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস.এ. রহমানের অস্থায়ী বাসস্থান রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। বিচারপতি রহমান এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী মনজুর কাদের কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পালাতে সক্ষম হন। উত্তেজিত জনতা কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের পরিবাগস্থ বাসভবন এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নবাব খাজা হাসান আসকারীর বাসভবনেও অগ্নিসংযোগ করে। জনতা পুলিশের কাছ থেকে বন্দুকও ছিনিয়ে নেয়। চট্টগ্রামেও উত্তেজিত জনতা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এম.এন. এর. বাড়ি আক্রমণ করে এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে সেনাবাহিনী তলব করা হয় এবং সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। অন্যদিকে উন্মত্ত জনতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে জেনারেল আইয়ুব দেশ থেকে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী রাজশাহীতে পুলিশের গুলীতে নিহত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর ডঃ শামসুজ্জোহা ও নূরুল ইসলাম। এ সংবাদ ঢাকায় জানাজানি হওয়ার পর ঐ তারিখ রাত এগারোটায় চারদিক থেকে সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে জনতা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। কারফিউ বা সান্ধ্য আইন প্রথমে ভঙ্গ করা হয় মালিবাগে এবং অতঃপর তেজগাঁও। নাখাল পাড়া হতে কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল আসে নিউ মার্কেট পর্যন্ত। ওই রাতে সেনাবাহিনী বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে। আজিমপুর এলাকায় কারফিউ ভঙ্গকারী জনতার ওপর বারংবার গুলী চালায় সেনাবাহিনী ও ই.পি.আর.। এতেও বহু সংখ্যক ব্যক্তি হতাহত হয়। ওই রাতে অস্ত্রের জন্যে জনতা ঢাকার ইস্কাটনে সাইদুল হাসানের বাড়িতে অবস্থানকারী মওলানা ভাসানীর নিকট যায়। কিন্তু ভাসানীর পক্ষে অস্ত্র যোগান দেয়া সম্ভব ছিল না। সেনাবাহিনীর গুলীকে মোকাবেলা করার জন্যে সে রাতে জনতা ঢেউটিনকে ব্যারিকেড হিসেবে ব্যবহার করেছিল।৯০

১৮ই ফেব্রুয়ারী রাতে কারফিউ ভঙ্গকারী জনতা " কারফিউ মানিনা", "আমাদের সংগ্রাম/ চলবেই চলবে", "জ্বালো জ্বালো/ আগুন জ্বালো", "জেলের তালা ভাঙ্গবো/ শেখ

মুজিবকে আনবো", " জাগো জাগো/বাঙালি জাগো", "শ্রমিকরাজ কৃষক রাজ/ কায়েম কর কায়েম কর" ইত্যাদি শ্লোগানে ঢাকায় রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়েছিল। ৯১

২০ শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে হঠাৎ করে সান্ধ্য আইন উঠিয়ে নেয়া হয়। অবশ্য ইতিমধ্যেই সর্বত্র কার্যকরভাবে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে জনতা একে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছিলো। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখেই ঢাকায় গুজব রটে যায় যে শেখ মুজিব মুক্তি পেয়েছেন। হাজারো মানুষ তৎকালীন ইকবাল হলে দৌড়ে আসে প্রকৃত সংবাদ জানার জন্যে। ২০ তারিখ সন্ধ্যাতেই ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রস্তুতি স্বরূপ এক ঐতিহাসিক মশাল মিছিল বের হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারী জনরোষের মুখে বাধ্য হয়ে আইয়ুব সরকার আগরতলা মামলা উঠিয়ে নেয় এবং শেখ মুজিবসহ নিরাপত্তা আইনে বন্দী ওই মামলায় অভিযুক্ত আরো ৩৪ জনকে মুক্তি দেয়। মুক্তিলাভের পরপরই মুজিব ঘোষণা দেন যে, সংগ্রামী ছাত্রদের ১১–দফার প্রতি তার পূর্ণাঙ্গ সমর্থন রয়েছে। ওই সময় একটি পত্রিকা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিনাশর্তে উঠিয়ে নেয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য করেঃ "পূর্ববাংলার মাটিতে অবশেষে বাস্তিলের কারাগার ধ্বসিয়া পড়িয়াছে।জনতার জয় হইয়াছে"।৯২ এদিকে শেখ মুজিব তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে "ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা" নামে অভিহিত করার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।৯৩

৭

মেহনতি জনতার অংশগ্রহণ ও অগ্রসরমানতাঃ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও সংঘাত এবং 'ঘেরাও'-এর চিত্র

আলোচনার বর্তমান অংশে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় মেহনতি জনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও সংঘাত এবং মূলত তাদের কর্তৃক পরিচালিত 'ঘেরাও আন্দোলন'-এর চিত্র তুলে ধরা হবে সেকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে। ১৯৬৮-৬৯ এর বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের এ দিকগুলো সেসময়, তার পরপর এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে শ্রেণীক ও আঞ্চলিক বৈষম্য ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে পূর্ব বাংলায় পৃথক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংগ্রামে এবং এতদক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐকমত্যের ব্যাপারে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রভাব রেখেছিল।

১. ১৯৬৯ সালের ২রা জানুয়ারী পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে দেখা যায় যে, খুলনা জেলার আশাসুনি থানার এক গ্রামে ধান কাটা নিয়ে সশস্ত্র জনতার সাথে পুলিশের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়। তথায় জনতা একজন পুলিশ কনস্টেবলকে আটকে রাখে এবং তার রাইফেল ছিনিয়ে নেয়।[৯৪]

২. সাপ্তাহিক জনতা ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনারের বরাত দিয়ে খবর প্রকাশ করে যে, টাঙ্গাইল মহকুমার নাগরপুরের রাজস্ব বিভাগের সার্কেল অফিসার ১৬ই ফেব্রুয়ারী ক্রুদ্ধ জনতার হাতে নিহত হন।[৯৫]

৩. দৈনিক আজাদ-এর একটি সংবাদ। 'খুলনায় শহীদ দিবসের মিছিলে গুলীবর্ষণঃ জনতার হাতে জনৈক পুলিশের মৃত্যু'- এই শিরোনামে দেয়া স্টাফ রিপোর্টারের খবরের একাংশ হচ্ছে ঃ

> খুলনা হইতে টেলিফোন যোগে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, গতকাল শুক্রবার খা-লিশপুর ও খুলনায় বিক্ষুব্ধ জনতার সহিত পুলিশের সংঘর্ষে ৮ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একজন পুলিশ রহিয়াছে। এই সংঘর্ষে অপর ৫০ ব্যক্তি

আহত হয়। পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, ১ জন পুলিশসহ খুলনায় ৮ ব্যক্তি নিহত হয়। প্রায় ২০ হাজার লোকের এক জনতা কেন্দ্রীয় যোগাযোগ উজির খান এ. সবুরের বাসভবনে অগ্নি সংযোগ করিলে পুলিশের গুলীবর্ষণে ২ ব্যক্তি নিহত হয়। এই পর্যায়ে জনতার হাতে একজন পুলিশ মারা যায়। শহরে ৪২ ঘন্টা সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে। এডিসির বাড়িতে ও শিক্ষা উজির আমজাদ হোসেনের বাড়িতেও অগ্নি সংযোগ করা হয়।

অতঃপর আজ অপরাহ্নে ২ টা হইতে রবিবার ৮টা পর্যন্ত ৪২ ঘন্টার জন্য খুলনা শহরে কারফিউ জারী এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্য সেনাবাহিনী তলব করা হইয়াছে। ....[৯৬]

৪. দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত খবর। ফরিদপুর জেলার ঝিলটুলী নির্বাচনী এলাকায় মৃত্যুজনিত কারণে একটি মৌলিক গণতন্ত্রী (বি.ডি.) সদস্যপদ শূন্য হলে উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু, সেসময় আইয়ুব সরকার ও মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল গণ ঘৃণা ও রোষের পরিস্থিতিতে একটি মনোনয়ন পত্রও জমা হয়নি। দু'এক ব্যক্তি মনোনয়ন পত্র জমা দেবার চিন্তা করলেও সংগঠিত ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের ফলে সেটা সম্ভব হয়নি।[৯৭]

৫. ১৯৬৮-৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানকালে প্রশাসনিক কাঠামোর নিম্নতমস্তর ইউনিয়ন কাউন্সিল শ্রেণী শোষণের প্রতিষ্ঠানগত ভিত্তি হিসেবে জনচোখে চিহ্নিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ তারিখে কুষ্টিয়ার জুনিয়াদহতে গণপিটুনিতে একজন ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান মারা যান।[৯৮]

৬. ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ তারিখে খুলনার দৌলতপুরে বিক্ষুদ্ধ জনতা তহশিল অফিসে আক্রমণ চালায় এবং অগ্নি সংযোগ করে।[৯৯]

৭. আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত খবর। শিরোনাম ঃ ' কিশোরগঞ্জের পল্লীতে কৃষক জনতার লাঙ্গল জোয়াল কাঁধে মিছিল'। খবরের একাংশ ঃ

সভাশেষে দনাইল, কামালিয়ার চর ও বুড়ির চর গ্রামত্রয়ের কৃষকবৃন্দ লাঙ্গল-জোয়াল কাঁধে প্রায় দুই মাইল লম্বা একটি বিরাট মিছিলে মিলিত হইয়া দীর্ঘ চার মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া কিশোরগঞ্জ শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণের পর কিশোরগঞ্জ ষ্টেডিয়ামের প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক জনতার এক বিরাট জনসভায় যোগ দেয়। মিছিলে শ্লোগানের ধ্বনি ছিল দালালদের খতম কর, ১১-দফা মানতে হবে, স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, খাজনা-ট্যাক্স কমাতে হবে, বকেয়া খাজনা বাতিল কর, সার্বজনীন ভোটাধিকার দিতে হবে ইত্যাদি"।[১০০]

৮. ১লা মার্চ ১৯৬৯ এর মর্নিং নিউজ পত্রিকায় তিনটি সংবাদ বেরোয়। প্রথমটিতে বলা হয়, রাজশাহীর সদর মহকুমার অন্তর্গত পবা থানাধীন পারিল্লা ইউনিয়ন পরিষদের

অফিসটি উন্মত্ত জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং জনতা এই অফিসের মালামাল ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয় সংবাদে বলা হয় যে, রাজশাহীর চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ মহকুমার শিবগঞ্জে ও নাটোর মহকুমার বাগাতি পাড়ায় জনতা সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)–এর অফিস আক্রমণ করে এবং এক পর্যায়ে আগুন দিয়ে ওই অফিস দু'টি ভস্মীভূত করে। তৃতীয় সংবাদটিতে বলা হয় যে, চাঁপাই নওয়াবগঞ্জের গোদাবাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা বিভিন্ন সরকারী অফিস আক্রমণ করে। তারা অফিসগুলোর রেকর্ডপত্র ও আসবাব–পত্রাদি বিনষ্ট করে। অতঃপর জনতা অফিসগুলোতে অগ্নি সংযোগ করে।[১০১]

৯. স্বৈরাচারী আইয়ুবের শাসক দল কনভেনশন মুসলিম লীগের কর্মী ও উগ্র ধর্মান্ধ মোল্লাগণ একযোগে বগুড়া জেলায় শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলায় ক্রুদ্ধ ছাত্রজনতার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষ দ্রুত ব্যাপকতা পায় এবং এক পর্যায়ে উত্তেজিত জনতা কোতোয়ালী পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে।[১০২]

১০. আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত খবর। প্রথম পৃষ্ঠার প্রধান শিরোনাম ঃ 'প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ঃ কনভেনশন লীগ সম্মেলনে কান্নার রোল'।

আজাদ–এর রাওয়ালপিন্ডি অফিস থেকে প্রেরিত খবরের এক স্থানে বলা হয় ঃ "গতকল্যকার কনভেনশন লীগের এই সভায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বক্তৃতা বিদায়ী ভাষণ বলিয়া মনে হইয়াছিল। বহু সদস্য অশ্রুসজল চোখে প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

প্রেসিডেন্ট তাহার একুশে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক ঘোষণার পটভূমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, তিনি একটি নতুন পদ্ধতি চালু করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ তাহা গ্রহণ করে নাই। তিনি দেশের ক্রমবর্দ্ধমান জনদাবী ও মারমুখী পরিস্থিতির প্রতি পার্টি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, "পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলেও বিপ্লব শুরু হইয়া গিয়াছে"।

> প্রেসিডেন্ট বলেন যে, সুদীর্ঘ তিন বছর ধরিয়া তিনি কনভেনশন লীগকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কনভেনশন লীগের কোনই অগ্রগতি হয় নাই। এখন তিনি মনে করেন যে, একাকী সংগ্রাম করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়।[১০৩]

১১. আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত খবর। এ. পি. পি. পরিবেশিত খবরের শিরোনাম ঃ 'চাঁদপুরের ২জন মৌলিক গণতন্ত্রী হত্যার পরিণতি'। খবরের একাংশ ঃ

> "চাঁদপুর শহরের প্রায় দশ মাইল দক্ষিণপূর্বে একটি গ্রামে ক্রুদ্ধ জনতা চেয়ারম্যান ফজর আলী পণ্ডিত ও তাহার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া আজ এখানে প্রাপ্ত

খবরে জানা গিয়াছে। নিহত চেয়ারম্যান ও তাহার পুত্র ইতিপূর্বে পদত্যাগকারী দুইজন মৌলিক গণতন্ত্রী হত্যা করিয়াছিল বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। মা-রমুখী জনতা রাইহেরি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফজর আলী পণ্ডিতের বাড়িও পোড়াইয়া দেয়"। ১০৪

১২. ফেব্রুয়ারী মাসের শেষদিকে পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগ ৪০ হাজার শ্রমিক কর্মচারীর স্বাক্ষরসহ একটি দাবীনামা কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করে এবং সেই সঙ্গে ধর্মঘটের নোটিশ দেয়। উত্থাপিত দাবীসমূহের মধ্যে ছিল ঃ

প্রথমত, ১৯৬৫ সালের ধর্মঘটের কারণে চাকুরীচ্যুত সকল কর্মচারীকে জ্যেষ্ঠতাসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল এবং সেজন্যে প্রদত্ত যাবতীয় শাস্তি বাতিল করা।

দ্বিতীয়ত, চলতি বাজার দরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতনের বৃদ্ধি সাধন এবং যতদিন পর্যন্ত সেটা না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত প্রস্তাবিত এ্যাডহক ভাতাকে বৃদ্ধি করে মাসিক পঞ্চাশ টাকা হারে প্রদান এবং স্বল্প মূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের বন্দোবস্ত করা।

তৃতীয়ত, ডিয়ারনেস এ্যালাউন্স ও ইন্টারিম রিলিফ প্রদানের ব্যবস্থা করা, ভ্রমণভাতা, মাইল প্রতি হারের বৃদ্ধি সাধন, ১৯৬৩,৬৫ ও ৬৮ সালে বন্যা ঘূর্ণিঝড়ের জন্যে দেয়া ঋণ মওকুফ, যারা সরকারী বাসগৃহ পাননি এমন সকল কর্মচারীর জন্যে বাড়ি ভাড়া প্রদান; ওয়ার্কশপ, লোকো ও ট্রাফিক বিভাগের কর্মচারীদের সমস্যাসমূহ সমাধান ইত্যাদি।১০৫

১৩. ঢাকা নগরীর মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকগণ তাদের ৭-দফা দাবীনামা উত্থাপন করে এবং ১লা মার্চ মিছিল করে নগরীর সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করেন। ১০৬

১৪. পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার স্টাফ ইউনিয়ন ১৯৬৫ সালে পেশকৃত তাদের ২৬ দফা দাবীনামাকে পুনরায় উত্থাপন করে। ইউনিয়ন দীর্ঘকাল ধরে ধামাচাপা দেয়া ওই দাবীগুলো অবিলম্বে পূরণ করা না হলে ধর্মঘটে যাবার হুমকি দেয়।১০৭

১৫. পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন তার নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীগণের দাবীর মুখে তাদের জন্যে এ্যাডহক রিলিফ বরাদ্দ করতে বাধ্য হয় ১লা মার্চ তারিখে।১০৮

১৬. ডাকবিভাগের পোষ্টম্যান ও নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারিবৃন্দও এ সময় তাদের দাবী-দাওয়া উত্থাপন করে এবং ৪ঠা মার্চ থেকে ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দেন।১০৯

১৭. পূর্ব পাকিস্তানের সড়ক পরিবহন সংস্থার কর্মচারীরাও এসময় তাদের দাবী-দাওয়া উত্থাপন করে কর্তৃপক্ষের নিকট। ১১০

১৮. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। প্রথম পৃষ্ঠার প্রধান শিরোনাম ঃ 'বিক্ষুব্ধ জনতা

কর্তৃক থানা আক্রমণ ঃ কনভেনশন লীগ অফিস ভস্মীভূত বগুড়ায় সান্ধ্য আইন জারী ঃ ইপিআর মোতায়েন'।

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় ঃ

" ঢাকা, ৪ঠা মার্চ। আজ সকালে বগুড়া শহরে মারাত্মক গোলযোগের পর বগুড়া পৌর এলাকায় দুপুর বারোটা হইতে ১৮ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে বলিয়া এখানে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে। বগুড়ায় বেসামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য ইপিআর তলব করা হইয়াছে।
এখানে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে হরতাল পালনকালে একদল মারমুখী জনতা বগুড়া শহরের একটি নগর শুল্ক কেন্দ্র, স্থানীয় কনভেনশন মোসলেম লীগ অফিস ও কতিপয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পোড়াইয়া দেয়। ক্রুদ্ধ জনতা কোতোয়ালী থানাও আক্রমণ করে। থানায় হামলা চালানোর ফলে দুইজন অফিসারসহ আটজন পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে"।[১১১]

১৯. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। 'তিনটি ব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত' শিরোনামে ষ্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত খবরে বলা হয় ঃ

"বগুড়া হইতে টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, এক বিক্ষুব্ধ জনতা স্থানীয় প্রসিদ্ধ জামাল কোম্পানীর মালিকের বাড়ি পোড়াইয়া দিয়াছে। উক্ত বাড়ির নীচের তলায় যে তিনটি ব্যাঙ্কের শাখা অফিস ছিল অগ্নি সংযোজনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ...."[১১২]

২০. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। খবরের শিরোনাম ঃ'১১-দফার সমর্থনে মিছিল বেলকুচিয়ার সি.ও. অফিস ঘেরাও'। সংবাদ দাতা প্রেরিত খবরের একাংশে বলা হয়ঃ

খুলনা ৩রা মার্চ।-সম্প্রতি খুলনার বেলকুচিয়া হাই স্কুল ও জে কে এস বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ১১-দফার সমর্থনে ও প্রদেশব্যাপী ছাত্র গণহত্যার প্রতিবাদে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে। মিছিলটি বাহির হইবার পর স্থানীয় কৃষক ও সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাহাদের সহিত যোগ দেয়। অতঃপর দীর্ঘ মিছিলটি বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষে স্থানীয় সি.ও অফিস ঘেরাও করে এবং ১১-দফার সমর্থনে খাজনা ট্যাক্স মওকুফ, কৃষকের হাতে জমি, শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি, তহশিল অফিসের জুলুম বন্ধের দাবীতে ও আপোষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধ্বনি প্রদান করে। তাঁহারা সি. ও-র পদত্যাগের দাবী জানায় ও আইয়ুবের ফটো অগ্নিদগ্ধ করে।[১১৩]

২১. দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত সংবাদ। ১৯৬৯-এর মার্চের প্রথম সপ্তাহে

জামালপুর মহকুমার নিকলী থানার পীরপুরের কাছে নারায়ণ খোলায় জনগণ ১৪টি ধান বোঝাই নৌকা লুট করে।[১১৪]

২২. দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত সংবাদ। সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার লাখাই নামক স্থানে একটা বিলের দখল নিয়ে তথাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও তার সহযোগীদের সাথে বিরাট জনতার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় চেয়ারম্যান বন্দুকের গুলী চালালে জনতা ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তারা চেয়ারম্যানের বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে।[১১৫]

২৩. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। জামালপুর থেকে ৯ই মার্চ নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক তার করা খবরের শিরোনাম ঃ 'কামারচরে গুলীবর্ষণ। ছাত্র হত্যার দায়ে চেয়ারম্যানের পুত্রসহ চার ব্যক্তি গ্রেফতার'। খবরের একস্থানে বলা হয় ঃ

> বিবরণে আরও জানা গিয়াছে যে, গুলীর খবর দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িলে হাজার হাজার উত্তেজিত ছাত্রজনতা অকুস্থলে ছুটিয়া আসে এবং চেয়ারম্যানের বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দেয়। এই ব্যাপারে বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাহাদের বাধা দেওয়া যায় নাই। তবে কোন ক্রমে উক্ত বাড়ির লোকজনদের রক্ষা সম্ভব হয়।[১১৬]

২৪. মর্নিং নিউজে প্রকাশিত সংবাদ ১০ই মার্চ ১৯৬৯ তারিখে খুলনার প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিল ও পিপলস জুট মিলসহ খালিশপুরের মোট পাঁচটি পাটকলের প্রায় বিশ হাজার শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধি ও অপরাপর দাবীতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের অফিস ঘেরাও করে। বেলা ১১টায় এই ঘেরাও অনির্দিষ্ট সময়ের আরম্ভ হয়। খালিশপুর শিল্প এলাকা এতে করে প্রকৃতপক্ষে অচল হয়ে পড়ে। কোনো অফিসার বা কর্মকর্তাকে দাবী না মানা পর্যন্ত অফিস থেকে বেরোতে দেয়া হয়নি। অতঃপর শ্রমিকদের কতকগুলো দাবী মেনে নিয়ে ডেপুটি কমিশনারের দফতরে মিলসমূহের প্রতিনিধি এবং জুট মিলস্ ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের ভেতর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর উক্ত ঘেরাও প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।[১১৭]

২৫. মর্নিং নিউজে প্রকাশিত সংবাদ। কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমায় জনতা চুরির মালামাল উদ্ধারের লক্ষ্যে চোর বলে কথিত মটখোলার জনৈক কালন্দর খানের বাড়ি আক্রমণ করে। জনতার গণপিটুনীতে কালন্দর খান ও তার ছেলে ওয়াসিমুদ্দীন নিহত হয়। অপর তিনজন আহত হয় ওই ঘটনায়।[১১৮]

২৬. মর্নিং নিউজে প্রকাশিত সংবাদ। ৯ই মার্চ ১৯৬৯ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার ডেপুটি কমিশনার মোকাম্মেল হক এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, গত কিছুদিনে জামালপুর মহকুমার ক'টি স্থানে ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীগণের হাতে ১৩ জন দাগী অপরাধী

নিহত হয়েছে। ঘটনাসমূহের বিবরণ দিয়ে জেলা প্রশাসক বলেন যে, শ্রীবর্দী, নালিতাবাড়ি, শেরপুর, দেওয়ানগঞ্জ ও মেলান্দহ থানার নানা এলাকায় গত কয়েকদিন যাবৎ বহু সংখ্যক বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, খুন, এমনকি জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটেছে। এসব অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে নানা ধরনের অপরাধী ও গরুচোরেরা। এ যাবৎ ১৩ জন লোক নিহত হয়েছে। তার ভেতর শ্রীবর্দীতে ৫জন, নালিতা বাড়িতে ২ জন, দেওয়ানগঞ্জে ১ জন এবং শেরপুরে ৫ জন। থানাগুলোর নানাস্থানে অপরাধীদের ৯৬টি গৃহও জনতা কর্তৃক ভস্মীভূত হয়েছে। খাদ্যশস্যবাহী নৌকাও লুট হয়েছে।[১১৯]

২৭. দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত সংবাদ। পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ হতে অবিলম্বে মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে কতকগুলো দাবী তোলা হয়। এগুলোর ভেতর ছিলঃ ৪৮ ঘন্টার বদলে ৪০ ঘন্টার কাজ, মূল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘ ভাতার একত্রীকরণ ও শতকরা ৩০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি, পাটশিল্পের জন্য অবিলম্বে বেতন বোর্ড গঠন এবং ওই বোর্ডে শ্রমিকদের ৪ জন প্রতিনিধি গ্রহণ, শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার দান এবং ১৯৬৫ সালের শ্রম আইনের ১৯ (ক) ও ১৭ ধারা সহ সকল কালাকানুন বাতিল করণ।[১২০]

২৮. ১১ই মার্চ বিকাল বেলা ঢাকার পৌরসভার মেথর, ঝাড়ুদার, ট্রাক-কুলি, নিকাল-কুলি ও ডোমদের পক্ষ থেকে নাজিরাবাজার মেথর পট্টিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাতদিনের ভেতর তাদের ১৮ দফা দাবী মেনে নেয়া না হলে তারা চরম পন্থা গ্রহণ করবেন বলে পৌর কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দেন। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা স্কেভেনজার্স ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী গৌরচন্দ্র এবং বক্তৃতা করেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রী দীনেশ সেন, ঢাকা মাঝি মাল্লা সমিতির সম্পাদক জনাব হারিসউদ্দীন আহমেদ, সিটি ল কলেজের ছাত্র সৈয়দ সফিউল্লাহসহ অন্যান্যরা। এতদ্ব্যতীত তারা মিছিল সহযোগে বিক্ষোভও প্রদর্শন করেন।[১২১]

২৯. মর্নিং নিউজে প্রকাশিত সংবাদ। ১১ই মার্চ তারিখে টঙ্গীর শ্রমিকগণ ঘেরাও অভিযান আরম্ভ করেন দীর্ঘদিন ধরে না-মেটা দাবীসমূহ আদায় করার উদ্দেশে। টঙ্গীর সাতরং টেক্সটাইল মিলের কর্তৃপক্ষ ঘেরাও-এর মুখে ইউনিয়নের সভাপতি রাহাসউদ্দীন ও সম্পাদক আজমত আলীসহ ১৯৬৬ সাল হতে চাকুরীচ্যুত ২২জন শ্রমিককে চাকুরীতে পুনর্বহাল করতে বাধ্য হয়। দীর্ঘ ৭ ঘন্টা ঘেরাও চলার পর জিনাত টেক্সটাইল মিলের কর্তৃপক্ষও চাকুরীচ্যুত ২০ জন শ্রমিককে চাকুরীতে পুনর্বহাল করে এবং প্রত্যেক শ্রমিককে একমাসের বেতনের সমান বোনাস প্রদানের ঘোষণা দেয়। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ কাজের পরিবেশ উন্নত করারও প্রতিশ্রুতি দেয়।[১২২]

৩০. মর্নিং নিউজে প্রকাশিত সংবাদ। রাজশাহী জেলার বাগমারা থানার সোনাপাড়া গ্রামে প্রায় ৮/৯ হাজার লোক একযোগে আক্রমণ চালায় এবং তারা ৪৭৮ টি বাড়িতে

অগ্নিসংযোগ করে। উক্ত গ্রামে প্রধানতঃ ধনী স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ, স্থানীয় চেয়ারম্যান— এরা থাকতো। অগ্নিসংযোগ, গৃহসমূহের মালামালও জনতা লুন্ঠন করে। একই তারিখের খবরে জানা যায় যে,মান্দা থানার তেতুলিয়া ইউনিয়নের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য হাবীবুর রহমানের বাড়িও আগুনে পোড়ায় বিক্ষুব্ধ জনতা।১২৩

আজাদ পত্রিকায় ওপরোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হয় নিম্নোক্তভাবে:

এপিপি পরিবেশিত সংবাদ শিরোনামঃ 'রাজশাহীর গ্রামে উচ্ছৃংখল জনতার আক্রমণ। ৪৭৮টি বাড়ি ভষ্মীভূতঃ ১২৮টি পরিবার গৃহহীনঃ বহু আহত'। খবরে বলা হয়ঃ "রাজশাহী ১১ই মার্চ। অদ্য এখানে প্রাপ্ত এক খবরে জানা গিয়াছে যে, গত মঙ্গলবার রাজশাহীর একটি গ্রামে উচ্ছৃংখল জনতা আক্রমণ চালাইবার পর চারশত আটাত্তরটি ঘর ভষ্মীভূত হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১২৮টি পরিবার গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং কতিপয় ব্যক্তি আহত হয়। আহতদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা গুরুতর। ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের বাড়ি সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হয়। তিনি উক্ত দিনই পদত্যাগ করেন। মূল্যবান জিনিষপত্র লুন্ঠন করা হইয়াছে বলিয়া ডেপুটি কমিশনার জানাইয়াছেন। উক্ত দিবসে প্রাদেশিক পরিষদের জনৈক সদস্যের গৃহেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ১২৪

৩১. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। সংবাদ শিরোনামঃ 'টঙ্গীতে শ্রমিকদের ঘেরাও অভিযান'। ষ্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত খবরে বলা হয়ঃ

"টঙ্গীর শ্রমিকগণ গতকাল বুধবার চারটি টেক্সটাইল মিল ও একটি রবার ফ্যাক্টরীতে ঘেরাও অভিযান চালায়।

শত শত শ্রমিক প্রায় তিনঘন্টা যাবৎ মিল ও ফ্যাক্টরী ঘেরাও করিয়া রাখার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৯ জন বরখাস্তকৃত শ্রমিককে কাজে পুনর্বহালের দাবী মানিয়া লন।

....ঘেরাও আন্দোলন করিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অলিম্পিয়া,মনু,কাদেরিয়া ও মেঘনা টেক্সটাইল মিল এবং আজাদ রবার ফ্যাক্টরীর মোট ৯ জন বরখাস্তকৃত শ্রমিককে চাকুরীতে পুনর্বহাল এবং তাহাদের সাড়ে তিন মাসের বকেয়া প্রদানের দাবী মানিয়া লইয়াছেন। মনু টেক্সটাইলের সাধারণ শ্রমিকদের একমাসের বেতনের টাকা বোনাস হিসাবে প্রদানসহ ১৪দফা দাবী, অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকদের ১৮ দফা দাবী, কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকদের ১২ দফা দাবী সহ মিলকারখানা শ্রমিক সাধারণের দাবী-দাওয়া মানিয়া লওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া কাদেরিয়া মিলের শ্রমিকদের দাবী কর্তৃপক্ষ গতকালই মানিয়া লওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রকাশ, টঙ্গীর সূতাকল শ্রমিকগণও তাহাদের ৭ দফা দাবীর ভিত্তিতে ঘেরাও আন্দোলন শুরু করিবেন বলিয়া প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছেন"। ১২৫

৩২. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। এপিপি পরিবেশিত খবরের শিরোনামঃ 'জামালপুরে নিহতদের সংখ্যা ২২ জনে উন্নীত'। খবরে বলা হয়ঃ

> "জামালপুর,১১ই মার্চ। এখানে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে গ্রামবাসিগণ কর্তৃক অপরাধী বলিয়া কথিত ব্যক্তি হত্যার সংখ্যা ২২শে উন্নীত হইয়াছে। গত ৮দিন যাবত মহকুমার বিভিন্ন স্থানে অপরাধী বলিয়া কথিত ব্যক্তিদের হত্যাকান্ড চলিতেছে।
>
> অপরাধী বলিয়া কথিত ব্যক্তিদের প্রায় ১ শত ৫০টি গৃহ পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪০টি গবাদি পশু বিনষ্ট করা হইয়াছে এবং ১৪টি বড় মহাজনী নৌকার চাউল লুট করা হইয়াছে।
>
> এক সরকারী সূত্রে বলা হয় যে শেরপুর থানার অন্তর্গত কুসুমহাতি গ্রামের জনৈক কাজেম উদ্দিনকে গ্রামবাসিগণ জীবিত অবস্থায় পোড়াইয়া ফেলে। এছাড়া উক্ত গ্রামে ১৫টি বাড়ি ও ১০টি গবাদিপশু পোড়াইয়া দেওয়া হয়।
>
> ঢাকা বিভাগের কমিশনার, ডি আই জি, মোমেনশাহীর ডেপুটি কমিশনার পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর সহিত এখানে অবস্থান করিতেছেন"।[১২৬]

৩৩. দি পাকিস্তান অবজারভারে প্রকাশিত সংবাদ। জামালপুরের মহকুমা প্রশাসকের বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, মাদারগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির সীমানাভুক্ত এলাকায় ৪ জন দাগী অপরাধী ক্রুদ্ধ জনতার আক্রমণে নিহত হয়।[১২৭]

৩৪. মর্নিং নিউজে প্রকাশিত সংবাদ। আদমজী জুট মিলের ১২ হাজার শ্রমিক ১১ই মার্চ তারিখে তাদের দাবী আদায়ের জন্যে কর্তৃপক্ষের অফিস ঘেরাও করে। তারা বিদ্যুৎ ও টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের চাপের মুখে প্রথমে সরকার ঘোষিত হার অনুসারে শতকরা ১৫ হতে ২০ ভাগ অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা দেয়ার কথা ঘোষণা দেন। শ্রমিকরা এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তাদের ৭ দফা দাবী মানার জন্যে জোর চাপ দিতে থাকলে অবশেষে মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সকল দাবী মানতে বাধ্য হয়। শ্রমিকদের দাবীর ভেতর ছিল শতকরা ৭৫ জন শ্রমিকের জন্য ৬ মাসের ভেতর বাসস্থান নির্মাণ, আদমজীতে একশ' বেডের একটি হাসপাতাল নির্মাণ, ৪ মাসের বেতনসহ বরখাস্তকৃত ৫ জন শ্রমিককে চাকুরীতে পুনর্বহাল, বেতনসহ বছরে ১৪ দিনের মেডিকেল ছুটি এবং বদলী শ্রমিকগণকে বিধি অনুযায়ী স্থায়ীকরণ।[১২৮]

৩৫. মর্নিং নিউজে প্রকাশিত সংবাদ। ১২ই মার্চ খুলনার এ্যাজাক্স জুট মিল ও খুলনা টেক্সটাইল মিলে ঘেরাও অভিযান পরিচালিত হয়। এ্যাজাক্স জুট মিলে ঘেরাও চলাকালে শ্রমিকদের দুই গ্রুপের ভেতর সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয় এবং উত্তেজিত শ্রমিকগণ অফিস ভবনের আংশিক ক্ষতি করে। এদিকে খুলনা টেক্সটাইল মিলে আটশোরও বেশী শ্রমিক একযোগে ম্যানেজারের অফিস ঘেরাও করে এবং তাদের ২১দফা দাবী উত্থাপন করে।[১২৯]

৩৬. আজাদ ও দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত সংবাদ। ১৩ই মার্চ ঢাকা জেলা প্রশাসক খুরশীদ আনোয়ার বার্তা সংস্থা এ.পি.পি. কে জানান যে মানিকগঞ্জ,শিঙ্গাইর, ধামরাই ও জয়দেবপুরে জনতার হাতে গত ক'দিনে ৩০ জন অভিযুক্ত অপরাধী নিহত হয়। অবশ্য বেসরকারী সূত্রের বরাত দিয়ে এপিপি নিহতের সংখ্যা ৪৫ বলে জানায়। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসিগণ অভিযুক্ত অপরাধীদের ২২৪টি বাড়ি লুট করার পর তাতে অগ্নি সংযোগ করে। এদিকে শিঙ্গাইরে নিহত হয় মোট ১৫ জন। এর ভেতর কেবল জয়কন্টক গ্রামেই ৯ জন নিহত হয়। অভিযুক্তদের জোর করে গৃহ থেকে বের করে নিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ছুঁড়ে ফেলা হয়। কিছু মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়।[১৩০]

৩৭. দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত সংবাদ। নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জুয়াড়ী উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে এবং ঢাকায় বেশ্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। [১৩১]

৩৮. দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত সংবাদ। যশোরের মাগুরা মহকুমার মোহাম্মদপুর থানায় প্রায় ৫ হাজার কৃষক খাদ্যের দাবীতে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর অফিস, থানা ও ডাক অফিস ঘেরাও করে। সংবাদ পেয়ে মাগুরার এস. ডি.ও. ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং স্থানীয় বিত্তবানদের নিকট হতে চাল জোগাড় করে কৃষকদের ভেতর বিতরণ করেন। [১৩২]

৩৯. দি পাকিস্তান অবজারভারে প্রকাশিত সংবাদ। ১৩ই মার্চ তারিখে জামালপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে জনতার হাতে ১ জন মহিলাসহ ৬ জন দাগী অপরাধী নিহত হয়। নিহতদের ভেতর রয়েছেঃ জামালপুর থানার তোজা, মাদারগঞ্জের আবদুল মালেক ও খবীরুন্নেসা, মেলান্দহের সুবেদ আলী ও সুবুদ আলী এবং শেরপুরের আবদুল হামিদ। এরা সবাই দাগী আসামী এবং স্থানীয় থানায় এদের বিরুদ্ধে নানা কেস ছিল। জনতা এদেরকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে। কাওকে কেটে টুকরো করে আবার আগুনে ফেলা হয়। গত ক'দিনের ভেতর কেবল জামালপুরে জনতার হাতে নিহত হয় মোট ৩৫ জন।[১৩৩]

৪০. দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত খবর। ফরিদপুরের ভেদরগঞ্জ, জাজিরা, শিবচর,সদরপুর,ভাঙ্গা ও বোয়ালমারী থানায় ক্রুদ্ধ জনতার আক্রমণে কমপক্ষে ৮ জন নিহত হয় এবং ১৫০টি গৃহ ভষ্মীভূত হয়। বাড়িসমূহের ভেতর ৭ জন ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যানের বাড়িও অর্ন্তভুক্ত ছিল। ক্রুদ্ধ জনতা ৫ জন ব্যক্তির চোখও উপড়ে ফেলে।[১৩৪]

৪১. দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত সংবাদ। ১১ই মার্চ ১৪টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নেতারা শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী যাবতীয় আইন বাতিল, সকল আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের পেশকৃত দাবী–দাওয়া মেনে নেয়া, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী–গণের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া এবং ছাত্রদের ১১ দফাকে মেনে নেয়ার

জন্যে সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে পত্র-পত্রিকায় এক বিবৃতি দেন। সংস্থাসমূহ হচ্ছেঃ ওয়াপদা, ওয়াসা, ইপিআইডিসি, এডিসি, এডিবিপি, ইপসিক, ডিআইটি, আইডবলুটিএ, তিতাস, আইডিবিপি, শিপিং কর্পোরেশন, টেলি কর্পোরেশন, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়ন। ১৪ই মার্চ এরা বায়তুল মোকাররমে সমবেতভাবে একটি জমায়েত অনুষ্ঠান করেন। তারা অবিলম্বে তাদের দাবীসমূহ মেনে না নেয়া হলে ধর্মঘটের হুমকি দেন।[১৩৫]

৪২. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। ষ্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত 'এবার বিমান ঘেরাও' শিরোনামের খবরে বলা হয়ঃ

"এইবার বিমান ঘেরাও। ঢাকা বিমান বন্দরে গতকাল শুক্রবার অপরাহ্নে একটি বিরাট বিক্ষুব্ধ দল লাহোর হইতে আগত একটি বোয়িং বিমান ঘেরাও করিয়া মওলভী ফরিদ আহমদ, মাহমুদ,আলী, গোলামআজম সহ কয়েকজন নেতার অবতরণের অপেক্ষা করিতে থাকে।

উল্লিখিত নেতাগণ পূর্ব পাকিস্তানের তথা সমগ্র দেশের সাধারণ নাগরিকদের কল্যাণ ও অধিকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে বলিয়া তাহারা অভিযোগ করিতেছিলেন। বিক্ষুব্ধ ঘেরাওকারীদের নিরাশ করিয়া আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ এর (ওয়ালীগ্রুপ) নেতৃবর্গ অন্যান্য যাত্রীদের সাথে বিমান হইতে নামিয়া আসেন। তবে বিক্ষোভকারীদের মনে সন্দেহ জাগে যে, এই সকল নেতা হয়তো ভয় পাইয়া বিমানের মধ্যে তখনও বসিয়া আছেন। তখন কয়েকজন ক্ষুব্ধ যুবক তড়িৎ গতিতে সিঁড়ি বাহিয়া বিমানের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং নেতাদের খুঁজিয়া বিফল হন"।[১৩৬]

৪৩. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। 'প্রদেশের ৪টি জেলায় ৯১ জন দুষ্কৃতকারী নিহত' শিরোনামে পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, গত কয়েকদিনে মোমেনশাহী,ঢাকা, কুমিল্লা ও ফরিদপুর জেলার ৫টি মহকুমায় ক্রুদ্ধ জনতা কমপক্ষে ৯১ জন দুষ্কৃতকারী বলিয়া ব্যক্তিকে হত্যা ও ৫ শত ৪৩টি গৃহ ভস্মীভূত করেছে।[১৩৭]

৪৪. মুন্সিগঞ্জের লৌহজং বহর বাজারে অবস্থিত ধাইদা তহসীল কাচারীর তহসীল-দারের বিরুদ্ধে জনতা ঘুষ নেয়ার অভিযোগ আনে এবং গলায় জুতোর মালা পরিয়ে চারদিক প্রদক্ষিণ করে তাকে নাজেহাল করে। উপস্থিত জনতার নিকট তাকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়।[১৩৮]

৪৫. মর্নিং নিউজে প্রকাশিত সংবাদ। ঢাকার তেজগাঁও এর কোহিনূর কেমিক্যাল কোম্পানী, বেকো ইন্ডাষ্ট্রিজ ও বাটা সু কোম্পানীর কর্মচারীগণ কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করেন।[১৩৯]

৪৬. মর্নিং নিউজে প্রকাশিত সংবাদ। কুমিল্লা জেলার লাকসামের একটি স্থানে হিংসাত্মক তৎপরতার অভিযোগে অভিযুক্ত কয়েকজন ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করতে

গেলে জনতা বাধা প্রদান করে। এতে করে জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ গুলী চালালে জনতা ক্ষেপে ওঠে এবং ১ জন পুলিশকে হত্যা ও ৪ জনকে আহত করে।[১৪০]

৪৭. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। ষ্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত খবরের শিরোনামঃ 'টিকেট কালোবাজারীতে বিক্রয়ের অভিযোগে ঢাকায় ৬টি সিনেমা হলে হামলা ও অগ্নিসংযোগ'।[১৪১]

৪৮. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। সরকারী প্রেসনোটঃ 'লাকসামে জনতার হাতে ওসি সহ ৪ জন নিহত'।

"ঢাকা, ১৬ই মার্চ। প্রাদেশিক সরকার আজ রাত্রে নিম্নোক্ত প্রেসনোট ইস্যু করিয়াছেনঃ ১৫ই মার্চ, ১৯৬৯ ইং তারিখের সকালে লাকসাম থানার ওসি দুইজন সাব-ইন্সপেক্টর, একজন সহকারী এস আই ও ৮ জন কনষ্টেবলসহ অগ্নি সংযোগ এবং মারাত্মকভাবে আহত করার মামলা সম্পর্কে শ্রীবুর্ব গ্রামে তদন্ত করিতে যান।.... পরে ৪ জন লোককে গ্রেফতার করিয়া ফেরার সময় প্রায় ৩ হাজার লোকের জনতা চারিদিক হইতে তাহাদের উপর হামলা করে এবং আটক ব্যক্তিদের ছিনাইয়া লইয়া যাওয়ার প্রয়াস পায়। পুলিশ পার্টি এই অবস্থায় আত্মরক্ষার্থে ও আটক ব্যক্তিদের হাতে রাখার জন্য গুলি চালায়। কিন্তু চরম উন্মত্ত জনতা পুনরায় দলটিকে আক্রমণ করে। এই পর্য্যায়ে গোলযোগের মধ্যে তাহারা ৮টি রাইফেল ছিনাইয়া লইয়া যায় ওসি ও অপর ৩ জন কনষ্টবলকে হত্যা করে।...

ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ও ইপিআর প্রেরণ করা হইয়াছে। তথা হইতে তিনটি লাশও উদ্ধার করা গিয়াছে। এছাড়া গুলিবিদ্ধ অপর তিনজনকে কুমিল্লা হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে"।[১৪২]

৪৯. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। 'ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক কনভেনশন লীগ নেতার গৃহে অগ্নি সংযোগ' শিরোনামে পিপিআই ও এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়ঃ

"ফরিদপুর ১৬ই মার্চ আজ সকালে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক মোহাম্মদ সুফি নামক জনৈক ছাত্র নেতা নিহত হওয়ার পর ক্রুদ্ধ জনতা জনাব সোবহান মোল্লা নামক জনৈক স্থানীয় কনভেশন লীগ নেতার গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে।....

এপিপি সূত্রে বলা হয় যে, ঘটনাকালে উপস্থিত লোকজন উক্ত দুর্বৃত্তদের ধাওয়া করিলে তাহারা সোবহান মোল্লার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতে জনমতে সন্দেহ হয় যে, সোবহান মোল্লাই উক্ত দুর্বৃত্তদের দ্বারা সুফিকে খুন করিয়াছে। ক্রুদ্ধ জনতা তখন সোবহান মোল্লার গৃহে আগুন লাগাইয়া দেয়।

সোবহান মোল্লা পলাতক রহিয়াছে। তাহার ছেলেকে আটক করা হইয়াছে।..

এপিপি আরও জানান যে অপর একদল ক্রুদ্ধ জনতা ফরিদপুর কনভেনশন লীগের সভাপতি জনাব আবদুর রহমান বাকাউলের বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করার উদ্দেশ্যে ঘেরাও করে। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার তথায় উপস্থিত হইয়া জনতাকে উক্ত গৃহে অগ্নি সংযোগ হইতে বিরত করেন।[১৪৩]

৫০. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। ষ্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত 'শ্রমিক ও কর্মচারিগণ কর্তৃক প্রদেশের বহু শিল্প ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ঘেরাও' শিরোনামের খবরে বলা হয়ঃ

ইপিআইডিসি, ইপসিক, আইডিবিপি ও ওয়াসাসহ কতিপয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ঢাকাস্থ সদর দফতর প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীগণ গত শনিবার ঘেরাও করেন। কোন কোন দফতরে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত ঘেরাও চলে। ডাইরেক্টর- সহ বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী অধিক রাত্রে দফতর হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

এতদ্ব্যতীত প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, টঙ্গী, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের অফিস শ্রমিকরা ঘেরাও করিয়া দাবী দাওয়া আদায় করিয়াছে। বর্ধিত বেতনের হার ও বাড়ি ভাড়া ভাতা এবং বার্ষিক (দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ) দুইটি বোনাসসহ বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের (ইপিআইডিসি) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ শনিবার কর্পোরেশনের সদর দফতর ঘেরাও করেন।

ইপিআইডিসি :

এই ঘেরাওয়ের ফলে বেলা দুইটায় অফিস ছুটির পর কয়েকজন ডাইরেক্টরসহ বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী দফতরের অভ্যন্তরে আটক পড়িয়া যান। রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত এই ঘেরাও অব্যাহত থাকে।

ঘেরাওকারী কর্মচারীদের ছয়জন প্রতিনিধির সহিত চারিজন ডাইরেক্টর ও জনসংযোগ অফিসারদের একটি আপোষ বৈঠক শুরু হয়। ইহা রাত ৯টা পর্যন্ত চলে।

আইডিবিপি :

পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (আইডিবিপি) কর্মচারিগণও তাহাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কের ঢাকাস্থ দফতর গত শনিবার ঘেরাও করিয়াছিলেন বলে জানা যায়।

এইখানেও ঘেরাও রাত ৯টা পর্যান্ত চলে।

ঘেরাওকারী কর্মচারীদের অধিকাংশ দাবী মানিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

টঙ্গীতে ঘেরাও অভিযান:

পূর্ব পাকিস্তান ওয়াপদার টি টি এন্ড আর আই বিভাগের টঙ্গীস্থ ডিরেক্টরের অফিস

গত শনিবার বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য কর্মচারিগণ সকাল সাড়ে সাতটা হইতে বার ঘন্টাব্যাপী ঘেরাও করিয়া রাখেন।

কর্মচারিগণের পক্ষ হইতে আটজন প্রতিনিধি ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে এক আলোচনায় কর্তৃপক্ষ উক্ত অফিসের ছাটাইকৃত কর্মচারিদের পুনর্বহাল করিয়াছেন।

কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পূরণ করা হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

ক্রিসেন্ট জুট মিল :

খুলনা হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, খালিশপুরে ক্রিসেন্ট জুট মিলের কর্মচারিগণ মিল অফিস ঘেরাও করিয়া পরিচালকদিগকে তাহাদের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য করেন।

উত্তেজিত শ্রমিকগণ অফিস ভবনের কিছুটা ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু কোনরূপ গুরুতর ক্ষতি সাধিত হইবার পূর্বেই খুলনার ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঘটনাস্থলে যাইয়া অবস্থা আয়ত্তে আনেন ও জনতাকে নিরস্ত্র করেন। মিলের পরিচালকগণ তাহাদের দাবী মানিয়া লইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ :

নারায়ণগঞ্জ হইতে আজাদের নিজস্ব সংবাদাতা জানান যে, পি.আর.এস.কর্মচারী ইউনিয়ন, পাক ফ্লোটিলা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তানী জাহাজী শ্রমিক ইউনিয়ন, পাকিস্তান ফেবরিক্স ইউনিয়ন, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন, জার্ডিন জুট বেলিং ইউনিয়ন প্রভৃতি শ্রমিক সংস্থার প্রায় দশহাজার শ্রমিক কর্মচারী গতকল্য পি.আর.এস. অফিস, ইস্পাহানী অফিস এবং লঞ্চ মালিকদের অফিস ঘেরাও করিয়া তাহাদের দাবী-দাওয়া পেশ করে।.....এই অভিযানে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের কিছু কিছু দাবী-দাওয়া মানিয়া লইবার আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। অতঃপর শ্রমিকগণ এক মিছিল সহকারে আই.ডব্লিউ.টি.এ. ঘাটে আসিয়া জনসভায় মিলিত হয়।[১৪৪]

৫১. মর্নিং নিউজে প্রকাশিত সংবাদ। ১৭ই মার্চ হতে নানা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ডের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ অনির্দিষ্টকালের জন্যে ধর্মঘট আরম্ভ করে। তাদের দাবীর ভেতর ছিল বেতনবৃদ্ধি, চাকুরীর অবস্থার উন্নতি, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি। ১৭ই মার্চ এরা অনেকগুলো মিছিল বের করেন। এতে 'কেউ খাবে আর কেউ খাবে না/তা হবে না তা হবে না' শ্লোগান দেয়া হয়।[১৪৫]

৫২. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। আজাদের রাজশাহী অফিস থেকে পাঠানো 'রাজশাহীর বাঘমারায় পুলিশ-জনতার সংঘর্ষে ৭ ব্যক্তি হতাহত' শিরোনামের খবরে বলা হয়ঃ

১৭ই মার্চ। গতকল্য সকাল ৯টা রাজশাহীর সদর মহকুমার বাঘমারা থানার

> পাইঘাটা সোনারপাড়া গ্রামে পুলিশ ও একটি বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ১জন পুলিশ হাবিলদার নিহত এবং ২ জন পুলিশ কনস্টেবলসহ অপর ৬ব্যক্তি আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ....

নিরপরাধ ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ এনে জনতা গ্রেফতারকৃতদের ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে এই সংঘর্ষ বাঁধে বলে খবরে জানানো হয়।১৪৬

৫৩. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত 'দাম্ভিকতার পরিণাম। বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক ইউ. সি. চেয়ারম্যান নাজেহাল' শিরোনামের খবরে বলা হয়ঃ

> "মণ্ডলতী বাজার,১০ই মার্চ সম্প্রতি স্থানীয় এক বিক্ষুব্ধ জনতা রাজানগর থানার সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস আক্রমণ করিয়া অফিসের আসবাবপত্র, দরজা-জানালা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয় এবং কাগজপত্র ছিঁড়িয়া ফেলে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।
>
> প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্ব্বে টেংরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করিতে বলিলে তিনি ছাত্রদিগকে হুমকী দেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। প্রকাশ, ঘটনার দিন চেয়ারম্যান সাহেব সি.ও.অফিস আসিলে কিছু সংখ্যক ছাত্র ও একদল জনতা সি. ও. অফিস ঘেরাও করিয়া উক্ত চেয়ারম্যানকে বাহির করিয়া দিতে সি. ও. কে আহ্বান জানান। সি. ও. চেয়ারম্যানকে বাহির করিয়া দিতে অস্বীকৃতি জানাইলে বিক্ষুব্ধ জনতা অফিস আক্রমণ করে এবং আসবাব ও কাগজপত্র তছনছ করিয়া দেয়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাশের পরিবার পরিকল্পনা অফিসও আক্রমণ করে এবং জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়া দেয়। এই সময় স্থানীয় কিছু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি দ্রুত ঘটনাস্থলে আসিয়া চেয়ারম্যানকে ছাত্রদের নিকট ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন। প্রকাশ, চেয়ারম্যান জনতার কাছে মাফ চাহেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করেন।
>
> প্রকাশ, এই থানার আরো ২ জন চেয়ারম্যান ও ৬ জন সদস্য স্বেচ্ছায় ঘটনাস্থলেই পদত্যাগ করিয়াছেন। ১৪৭

৫৪. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত 'কুড়িগ্রাম চরাঞ্চলে দুষ্কৃতকারীদের নিধন অভিযান। গণ আদালতে বিচার ও শাস্তি প্রদানে জনমনে আনন্দের সঞ্চার' শিরোনামে খবরে বলা হয়ঃ

> কুড়িগ্রাম, ১৫ই মার্চ।— সম্প্রতি কুড়িগ্রাম মহকুমার রৌমারী,চিলমারী, উলিপুর, থানারচর অঞ্চলে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের ক্ষুদ্র শাখাগুলো সম্মিলিতভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। ....প্রকাশ কতিপয় কুখ্যাত চোরকে গণ-আদালতে হাজির করিয়া শাস্তি দান করা হয় এবং পুনরায়

চুরি ডাকাতি না করার জন্য মুচলেকা আদায় করা হয়।

রৌমারী থানার কতিপয় চোরকে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয় এবং কতিপয়কে আর্থিক দণ্ড প্রদান করা হয়। প্রকাশ, প্রথমে থানা হইতে ছাত্র সংঘের কর্মীগণ চোর ডাকাতের তালিকা সংগ্রহ করে এবং স্থানীয় চৌকিদার ও গ্রাম্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য ময়দানে চোরদিগকে নির্দিষ্ট দিনে হাজির হওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশ মোতাবেক চোর-ডাকাতরা সভায় হাজির হইলে উপস্থিত ক্ষেত্রেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দোষী সাব্যস্ত হইলে উদাহরণমূলক শাস্তি দান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশ্য, শাস্তির পূর্বেই চোরের নিকট হইতে ভবিষ্যতে চুরি না করার তওবা পড়াইয়া সৎ জীবন যাপনের প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়। প্রকাশ, রৌমারী, চিলমারী ও গুলিপুর থানার চর অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে কথিত প্রায় ৩০ জন চোর-ডাকাতের বাড়ি পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং প্রায় ১০০ জন চোরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। যেসমস্ত চোর দোষী বলিয়া ভয়ে সভায় হাজির হয় নাই বা গণ আদালতের নিকট তাহাদের বক্তব্য পেশ করে নাই, তাহাদের বাড়ি নাকি পোড়ানো হইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, প্রতি ইউনিয়নে পৃথক পৃথকভাবে এই গণ-আদালতের বিচার সমাধা হইতেছে। ইহাতে উল্লিখিত অঞ্চলে গরু চুরি, কালোবাজারী, রাহাজানি, ব্যভিচার বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং জনমনে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এতদিন চোরের দৌরাত্ম্যে কৃষকগণ গরুর গোয়ালে শুইয়া থাকিয়াও নিশ্চিতভাবে ঘুমাইতে পারে নাই। বর্তমানে চোরের শাস্তিতে চোরদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। অনেক চোর নাকি বাড়ি ছাড়িয়া পলাতক রহিয়াছে।

ঐ সমস্ত সভায় কমপক্ষে ৪/৫ হাজার ছাত্র-জনতার সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। ছাত্রগণ অত্যন্ত সুশৃংখলার সহিত সভা ও বিচারকার্য সমাধা করিতেছে বলিয়াও প্রকাশ।[১৪৮]

৫৫. মর্নিং নিউজে প্রকাশিত সংবাদ। ১৮-ই মার্চ হতে ঢাকা পৌর সভার ঝাড়ুদারগণ তাদের ১৮ দফা দাবীতে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ধর্মঘট আরম্ভ করে।[১৪৯]

৫৬. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। ষ্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত 'সেক্রেটারীয়েটসহ বহু প্রতিষ্ঠান ঘেরাও। অবরুদ্ধ নগরী' শিরোনামে পরিবেশিত খবরে বলা হয়ঃ

সমগ্র রাজধানী ঢাকা ও উপকণ্ঠ গতকাল মঙ্গলবার ঘেরাও ও বিক্ষোভের ফলে অবরুদ্ধ নগরীতে পরিণত হইয়াছিল।

প্রধানতঃ চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য কর্মচারীগণ ঢাকাসহ প্রদেশের সর্বত্র বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে গতকাল হইতে ব্যাপকভাবে ঘেরাও অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতাল, মহাখালী যক্ষা হাসপাতাল, ঢাকা হাই কোর্ট, আণবিক শক্তিকেন্দ্র ও বহু সংখ্যক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সকল সরকারী অফিসে ঘেরাও করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর ধর্মঘটী কর্মচারিগণ গতকাল মঙ্গলবার হইতে রাজধানী ঢাকাসহ প্রদেশব্যাপী ঘেরাও অভিযান শুরু করিয়াছে। এই ঘেরাও অভিযানের ফলে ঢাকার প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারিয়েটসহ সকল বিভাগ ও অফিসের সরকারী কাজে গতকাল প্রায় সম্পূর্ণরূপে চরম অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ পাঁচ দফা দাবী আদায়ের জন্য সেক্রেটারিয়েটসহ সমস্ত অফিস, বিভিন্ন হাসপাতাল ও কোন কোন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সকাল ছয়টা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ঘেরাও করিয়া রাখেন।

প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারিগণও গতকাল আকস্মিকভাবে নিজেদের দাবী–দাওয়া আদায়কালে সেক্রেটারিয়েটের অভ্যন্তরে ঘেরাও আন্দোলনে অংশ নেন।

উল্লেখ্য যে, গত ১৫ই মার্চের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পাঁচ দফা দাবী পূরণ না হওয়ার ফলে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গত সোমবার হইতেই ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন। গত সোমবার ঢাকায় হরতাল পালিত হওয়ার দরুণ কর্মসূচী ধর্মঘট পালন করিলেও কর্মচারিগণ ঘেরাও অভিযান শুরু করিতে পারেন নাই।

ঘেরাও চলিবার সময় প্রাদেশিক গভর্ণরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উজীর সভার জরুরী বৈঠকে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ৫দফা দাবী সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অতিরিক্ত চীফ সেক্রেটারী জনাব আলী হাসান কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন।

অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটার দিকে ধর্মঘটী ও ঘেরাওকারী কর্মচারিগণ সেক্রেটারি–য়েটের দক্ষিণ পার্শ্বে আবদুল গণি রোডে কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আবদুল আজিজের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় মিলিত হয়। সভায় প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের যে সকল দাবী–দাওয়া মানিয়া লইতে সম্মত হইয়াছেন ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ উহা ব্যক্ত করেন। কিন্তু কর্মচারীগণ আংশিক দাবী মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

সভায় বলা হয় যে, সরকার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাথাপিছু পনের টাকা চিকিৎসা ভাতা, মাথাপিছু সাত টাকা নাগরিক ভাতা, প্রতি এগার দিনে একদিন অর্জিত ছুটি (আর্ন লিভ), ইউনিফর্ম, মাথাপিছু সাত টাকা গৃহভাতা, পাঁচ বৎসর চাকুরীর পর পদ স্থায়ীকরণ, অফিস হইতে তিন মাইল, ছয় মাইল ও বারো মাইল দূরবর্তী কর্মচারীদের যথাক্রমে মাথাপিছু পাঁচ টাকা, দশ টাকা ও পনেরো টাকা যাতায়াত ভাড়া প্রদানে সম্মত হইয়াছেন। আরও বলা হয়, শতকরা ২০ টাকা এডহক রিলিফ প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য

সুপারিশ করা হইবে।

সভায় গৃহভাতা, যাতায়াত ভাতা ও চাকুরীর পদ স্থায়ীকরণের মেয়াদ সম্পর্কে কর্মচারীদের আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহারা মাথাপিছু পঁয়ত্রিশ টাকা যাতায়াত ভাতা ও তিন বৎসর চাকুরীর পর পদ স্থায়ীকরণের দাবী জানান।

অতঃপর দাবী আদায়ের জন্য চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শ্লোগান মুখর বিরাট বিক্ষোভ মিছিল রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে 'কেউ খাবে কেউ খাবে না তা হবে না তা হবে না, আমিও খাব তুমিও খাবে– তা'হবে তা'হবে,' 'অন্ন চাই বস্ত্র চাই বাঁচার মত বাঁচতে চাই,' সংগ্রাম সংগ্রাম চলবে চলবে' ইত্যাদি শ্লোগান প্রদান করা হয়।

ভোর ছয়টার পূর্ব্ব হইতেই হাজার হাজার চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী সেক্রেটারিয়েটের দুই গেটের সম্মুখে জমায়েত হইতে থাকেন। অফিসারগণ সেক্রেটারিয়েটের নিয়মিত কার্য উপলক্ষে আগমন করিলে তাহাদের প্রবেশে কোন প্রকার বাধাদান করা হয় নাই। বেলা আটটার মধ্যে সকল অফিসার সেক্রেটারিয়েটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর গেটে তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ধর্মঘটীদের প্রতিনিধিগণ সেক্রেটারিয়েটের অভ্যন্তরে গমন করেন।

অফিস চলাকালে এক টেবিল হইতে অন্য টেবিলে কেহ ফাইল বহন করেন নাই, অফিসারের কক্ষে বেল বাজিলে কোন পিয়ন হাজির হন নাই, অফিস ভবনের লিফট উঠানামা করে নাই, অফিসারদের নাস্তা ও এক গ্লাস পানি আনার জন্যও কোন কর্মচারী ছিলেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরী ফাইলপত্র পদস্থ অফিসারগণ নিজেরাই বহন করিয়াছেন।

বেলা দুইটায় অফিস ছুটি হইবার পরও অভিযানের ফলে কোন অফিসার সন্ধ্যা ছয়টার পূর্বে বাহির হইতে পারেন নাই। সেক্রেটারিয়েটে কোন ক্যান্টিন খোলা না থাকায় এবং বাহির হইতে খাদ্য সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকার ফলে অফিসার-গণকে সারাদিন না খাইয়া থাকিতে হয়। বিকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে কর্মচারী প্রতিনিধি ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা বৈঠক সমাপ্ত হইবার পর সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ঘেরাও অভিযান প্রত্যাহার করা হইয়াছে।[১৫০]

৫৭. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়,

" জামালপুর মহকুমার শ্রীপুর ইউনিয়নে দুষ্কৃতকারী বলিয়া কথিত আরও তিন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে। এই তিনজন লইয়া গত ১৬ দিনে জামালপুর মহকুমায় নিহতের সংখ্যা ৪০-এ দাঁড়ায়।" [১৫১]

৫৮. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। সংবাদ শিরোনামঃ 'গৌর নদীতে খাদ্যের দাবীতে অর্দ্ধ লক্ষাধিক লোকের মিছিল'।

সংবাদ শিরোনামঃ 'বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক স্টার সিনেমার ক্ষতি সাধন'।[১৫২]

৫৯. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত 'মাদারীপুরের পল্লীতে প্রায় ৫শত বাড়ি অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত' শিরোনামের খবরে বলা হয় যে, চুরি-ডাকাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চোর, ডাকাত বলে কথিত ব্যক্তিদের প্রায় আড়াই শত বাড়ি পুড়িয়ে দেয় মাদারীপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র-জনতা। ২৪শে ফেব্রুয়ারী শিবচর থানায় জ্বালিয়ে দেয়া হয় ৩৫ খানা বাড়ি। ৮ই মার্চ লক্ষাধিক ছাত্র-জনতা একত্রিত হয়ে কুখ্যাত ডাকাত বলে কথিত লোকদের ২০০ বাড়ি ভস্মীভূত করে বিভিন্ন গ্রামে। জাজিরা থানায়ও অনুরূপ ৪০ খানা বাড়ি পুড়েছে। কালকিনি থানার জনৈক ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যানের বাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছে জনতা।[১৫৩]

৬০. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, প্রমোদবালা নিয়ে জাহাজে ওঠায় চট্টগ্রাম বন্দরের বার্থে অবস্থানরত জাতীয় শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ এম ভি পদ্মার ৪ জন অফিসারের সাথে বিক্ষুব্ধ শ্রমিক-জনতার প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাদের এক পর্যায়ে অফিসারগণ প্রাণ ভয়ে জাহাজ থেকে পানিতে ঝাঁপ দিলে দু'জন উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় এবং দু'জন নিহত হয়।[১৫৪]

৬১. মর্নিং নিউজে প্রকাশিত সংবাদ। পূর্ব পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক, পোস্টাল লাইফ ইনসিওরেন্স, সার্ভে অব পাকিস্তান, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি, জিওলজিক্যাল সার্ভে, কমিশনার অব ইনকাম ট্যাক্স, ফিলিপস্ কোম্পানী, সার্কিট হাউস-এর অফিসসমূহ তাদের স্ব স্ব কর্মচারীগণ দাবী আদায়ের জন্যে ১৯শে মার্চ ঘেরাও করে রাখে।[১৫৫]

৬২. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। 'পার্বতীপুরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর। তথায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি'।

অপর সংবাদঃ পূর্ব পাকিস্তানের একাউন্টেন্ট জেনারেলের,ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিগণ গতকাল বুধবার তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য ব্যাপক ঘেরাও অভিযান শুরু করেন।

অপর সংবাদঃ 'ড্রাইভার ও ফায়ারম্যানগণ ট্রেন চালাইতে অস্বীকার করায় গত মঙ্গলবার রাত নয়টা হইতে প্রদেশের ট্রেন চলাচল পঙ্গু হইয়া গিয়াছে।'

আরেকটি সংবাদ শিরোনামঃ 'কোহিনুর ও জব্বার জুট মিল ঘেরাওঃ শ্রমিকদের দাবী গৃহীত'।[১৫৬]

৬৩. ২০শে মার্চ হতে ১৫ দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রদেশের ৪০ হাজার লঞ্চ শ্রমিক অনির্দিষ্টকালের জন্যে ধর্মঘট আরম্ভ করেন। এর ফলে লঞ্চ যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয়।[১৫৭]

৬৪. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। সংবাদ শিরোনামঃ 'টঙ্গীতে শ্রমিক সভার প্রস্তাব। ঘেরাওকালে স্বীকৃত দাবী-দাওয়া অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে'।[১৫৮]

৬৫. আজাদে প্রকাশিত সংবাদ। স্টেট ব্যাংক ঘেরাও শিরোনামে পরিবেশিত খবরে বলা হয়ঃ

পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাংকের ঢাকা অফিস (সদরঘাট) ৩৪ ঘন্টাব্যাপী ঘেরাও করার পর গতকাল বৃহস্পতিবার রাত্র ৮টায় ঘেরাও প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

প্রকাশ পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্কের পূর্ব পাকিস্তানস্থ ডেপুটি গভর্ণর কর্মচারীদের ১১-দফা দাবী কেন্দ্রীয় ডিরেক্টর বোর্ডের নিকট সোপারিশ করিয়াছেন।[১৫৯]

৬৬. আজাদ। খবরে বলা হয়,৪০/৫০ হাজার গ্রামবাসী সম্প্রতি সিলেট জেলার হবিগঞ্জের লাখাই থানা এলাকার রসুলপুর,বড়বাড়ি প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম ভস্মীভূত করে এবং প্রায় ৫০ লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট করে।১৬০

৬৭. আজাদ। পাবনার পল্লীতে বিরাট কৃষক সমাবেশে গ্রামাঞ্চলে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবী।১৬১

৬৮. আজাদ। পুলিশ হাবিলদার হত্যার অভিযোগে রাজশাহীর গ্রামে ছাত্রসহ নয় ব্যক্তি গ্রেফতার।১৬২

৬৯. আজাদ:

পাকিস্তান শিল্প বণিক সমিতির পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে বলেন যে, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি কর্মচারীদের দ্বারা ব্যাপক হারে ঘেরাও হইবার ফলে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার ফলে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

.......বিবৃতিতে তিনি অবিলম্বে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মানিয়া লইবার জন্য বিভিন্ন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।[১৬৩]

৭০. আজাদ। সংবাদ শিরোনামঃ ডাক পিওন ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘট। গতকাল কোন চিঠি বিলি হয় নাই।১৬৪

৭১. আজাদ। প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ শিরোনামঃ 'সিঙ্গাইর থানায় পুলিশের গুলিতে ১ ব্যক্তি নিহত ও ১ জন আহত'।১৬৫

৭২. আজাদ। সংবাদ শিরোনামঃ 'টাঙ্গাইল ও কুমিল্লার পল্লীতে অগ্নি সংযোগ'। ক্ষতির পরিমাণ ১১ লক্ষ টাকা বলে জানানো হয়েছে।১৬৬

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৬৯-এর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঘেরাও অভিযান, হরতাল, ধর্মঘট, আন্দোলন-সংগ্রামে শহরে-গ্রামে শ্রমিক-কৃষক-বস্তিবাসী মেহনতি ও নিম্নবিত্ত-বিত্তহীন জনতার ব্যাপক ও জঙ্গী অংশগ্রহণের ফলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে পূর্ব বাংলার তৎকালীন গভর্ণর মোনায়েম খান সপরিবারে ২৫শে মার্চের হরতালের আগেই অত্যন্ত সংগোপনে ঢাকা ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। ২১শে মার্চ তারিখেই মোনায়েম খানের বদলে প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী এম. এন. হুদা গভর্ণরের দায়িত্ব নেন। এসময় জানানো হয় যে,মোনায়েম খানকে সৌদি আরবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হবে।

৮

ঘেরাও ও গণঅভ্যুত্থান ঃ আরো কিছু তথ্য ও মূল্যায়ন

১৯৬৮–৬৯ এর ঘেরাও আন্দোলন, শ্রমিক–কৃষক–শহরে বস্তীবাসী নিম্নবিত্ত–বিত্তহীন জনতার ব্যাপক অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে পূর্ব বাংলায় যে বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, সেটার মাত্রা ও ব্যাপকতা, প্রকৃতি ও চাপ উপলব্ধিতে আনার জন্যে এবার ঘেরাও ও বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং ক'জন বিশ্লেষকের, কিছু পত্রপত্রিকা ও সংগঠনের এতদসংক্রান্ত মূল্যায়ন তুলে ধরা হবে। এ আলোচনা থেকে বোঝা যাবে কেন ১৯৬৮–৬৯ সালে ও পরবর্তীকালে তৎ–কালীন পূর্ববাংলায় শ্রমিক–কৃষক সাধারণ জনতা এবং বামপন্থী–কমিউনিস্ট বা প্রগতিশীল ছাত্র, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে তো বটেই, এমনকি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী দল–সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, এদের নেতৃবর্গ এবং এদের পরিচালিত পত্র–পত্রিকাসমূহ শোষণমুক্ত সম বন্টনের সমাজ আর সরাসরি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বক্তব্য দিতে থাকে। এরা তাদের কর্মসূচীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণাও দেয়। এভাবে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ব্যাপক ঐকমত্য গড়ে ওঠে।

যাহোক, ১৯৬৮–৬৯ এর ঘেরাও ও বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের কিছু মূল্যায়ন নিম্নে তুলে ধরছি।

১. তারিক আলী বলেন ঃ

"উত্তরবঙ্গে কৃষকেরা সরকারের প্রাপ্য সকল খাজনা বন্ধ করে দেয় এবং কতকগুলো গ্রামে নির্বাচিত গণআদালতে স্থানীয় দুষ্কৃতকারীদের বিচার করে। এক ডজনের মতো রাজস্ব অফিসার, আমলা ও মৌলিক গণতন্ত্রীর বিচার করা হয় এবং তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়"। [১৬৭]

২. মোহাম্মদ আইয়ুব এবং কে. সুব্রামানিয়াম বলেন ঃ

একটা পর্যায়ে এমনকি এ–ও মনে হয়েছিল যে আন্দোলনের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাত থেকে সেসময় ভাসানী নেতৃত্বাধীন ন্যাপের পতাকাতলে সমবেত চরমপন্থীদের হাতে চলে যাচ্ছে। গোল টেবিল বৈঠকের (আর.টি.সি.) ব্যর্থতার পর পূর্ববাংলার বিক্ষোভ আন্দোলন এখানকার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর বাংলার দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী এবং ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নেয়। এসব স্থানে ন্যাপের কৃষক সমিতির শক্ত ঘাঁটি ছিল।

শেখ মুজিব যখন গোল টেবিল বৈঠককে অস্বীকার করেন এবং ওই সম্মেলনের পর গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি বা ডাক ত্যাগ করেন, তখন নিশ্চয়ই ওপরের বিষয়গুলো তিনি বিবেচনার মধ্যে এনেছিলেন। পূর্ববাংলার অনুভূতির যথার্থ মুখপত্র হওয়া ছাড়াও গোল টেবিল বৈঠকের পর শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতে নিরাপদে রাখার ব্যাপারে একটি চমৎকার কৌশলগত পদক্ষেপ। যদিও এ সত্য থেকেই যাচ্ছে আওয়ামী লীগ গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছিল।[১৬৮]

৩. উনসত্তরের বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের পূর্বেও পূর্ব বাংলায় ঘেরাও আন্দোলন হয়েছে বিভিন্ন সময়। তবে সেসব হয়েছে সংকীর্ণ পরিধিতে ও বিচ্ছিন্নভাবে, যদিও দু'একটি ক্ষেত্রে তা সহিংসতার পথে মোড় নিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে কুষ্টিয়া মোহিনী মিলে ঘেরাও হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে খুলনার পিপলস্ জুট মিলে শ্রমিকেরা ঘেরাও আন্দোলন করেছিল। ১২ দিন ধরে তা চলেছিল। তথাকার কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারবর্গ এসময় বহির্জগত থেকে সর্ব অর্থে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এমনকি তাদের খাদ্য সরবরাহও ছিল না। ই.পি.আর. মোতায়েন করা হয়েছিল। ওই ঘেরাও–এর সময় সংঘটিত সংঘর্ষে একজন শ্রমিক মারা গিয়েছিল। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামের আমিন জুট মিলে শ্রমিকরা ঘেরাও করেছিল। টঙ্গী শিল্পাঞ্চলেও বিভিন্ন সময়ে ঘেরাও হয়েছিল। কিন্তু, এসব ঘেরাও কেবল বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো মিলে–কারখানায় এবং শুধুই শ্রমিকদের ভেতর সীমিত ছিল। এদিকে ১৯৬৯ সালের ঘেরাও আন্দোলন ছিল সারা দেশ জুড়ে—শহরে, গ্রামে, শিল্পাঞ্চলে, অফিসে, আদালতে, ব্যবসা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে। ধানের গোলা, চালের গুদাম, খাদ্য শস্যবাহী নৌকা ও রেল ওয়াগন লুট ও খাদ্য জনগণের ভেতর বন্টন, চোরাচালানী, দুর্নীতিবাজ, অত্যাচারী জোতদার–মহাজন প্রতিরোধ, গণ আদালতে বিচার ও শাস্তি, থানা ও পুলিশ আক্রমণ এবং অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া, মিছিল–প্রতিরোধ–সংগ্রাম, সান্ধ্য আইন ভাঙ্গা, পুলিশ–ই.পি.আর–মিলিটারীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ, মন্ত্রীদের বাড়ি আক্রমণ ও অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি সবই ঘেরাও–এর পাশাপাশি এসেছিল একযোগে সারা দেশ জুড়ে। ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবিত্ত–বিত্তহীন জনতার কার্যকর অংশগ্রহণের ফলে আন্দোলন ব্যাপকতা, প্রচণ্ডতা ও জঙ্গীত্ব পেয়েছিল।

কামরুদ্দীন আহমদ ১৯৬৯ সালেরই ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত তাঁর বইতে ওই বছরই সংঘটিত ঘেরাও আন্দোলন ও বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

> ''গণতান্ত্রিক শাসন লাভের বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগ্রাম গণ-মানুষের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়েছিল। শ্রমজীবী জনতা যেমন রিকশা চালক, মোটর ড্রাইভার এবং দিন মজুরদের সকল অংশ ছাত্রদের সাথে হাত মিলিয়েছিল এবং আইন-শৃংখলা কর্তৃপক্ষকে অমান্য করেছিল। গণবিস্ফোরণ আইয়ুব শাসনের স্থিতিশীলতার আবরণকে বিনষ্ট করে এবং প্রশাসন ধ্বসে পড়ে। এযাবৎ সকল সরকারী পত্রিকা, সভা, প্রচারপত্র, পুস্তিকা, রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে পূর্ণদ্যোমে তথাকথিত ''উন্নয়ন দশক''-এর নির্লজ্জ প্রচার চলছিল, কিন্তু সবকিছুই তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ে। মওলানা ভাসানীর ন্যাপের মাধ্যমে গোড়াতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল দুর্নীতিবাজ অফিসার ও সরকারী এজেন্সীসমূহের ঘেরাও-এর আকারে, অচিরেই তা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং মার্চের প্রথম সপ্তাহে ঘেরাও-এর কৌশল সর্বহারা শ্রেণীর কাছে নিয়োগকারীদেরকে বল প্রয়োগ ও লাঞ্ছনার মাধ্যমে দাবী আদায়ের অস্ত্র হিসেবে দেখা দেয়। এই প্রক্রিয়া শুরু হয় টঙ্গী শিল্পাঞ্চল থেকে।............
>
> আইন শৃংখলা রক্ষা করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল এবং পরবর্তীকালে সেনা বাহিনী ডাকা হয়। বুলেট দিয়ে পাখির মতো হত্যা করা হয় মানুষকে। গুলি বর্ষণের ফলে নিহত ও আহতের সংখ্যা শত শত হয়ে পড়ে, কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপের দিকে যায়। যদিও গোড়াতে ছাত্ররাই ছিল সর্বাগ্রে, তথাপি রাজপথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগ্রামীরা ছিল নগরের দরিদ্র জনতা। এদের ভেতর ছিল বেকার, অস্থায়ী দিন মজুর, রাস্তায় থাকা ছেলেরা, পেশাগত ভিক্ষুক। সমাজের বিরুদ্ধে যাদের ঘৃণা ছিল চূড়ান্ত। এরা এমন অবস্থায় ছিল যখন তারা বুলেট আর এক টুকরো খাবারের ভেতর পার্থক্য দেখেনি। বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও যন্ত্রণা অপেক্ষা উভয়টিই তাদের কাছে একই রকম স্বস্তিদায়ক ছিল। এসব লোকের কাছে জীবন একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে সর্বক্ষমতাময় গভর্ণর আবদুল মোনেম খান এবং ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের অনুচরদের জনরোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পলায়নের দৃশ্য দেখে তারা আনন্দিত হয়। কেননা এরা জনগণের সহ্যসীমার বাইরে দুষ্কর্ম করেছিল এবং সেজন্যে নেমেসিস নেমে এলো। ক্ষুদ্রসংখ্যক লোক যারা সম্পদ কুক্ষিগত করেছিল, প্রাসাদ তৈরী করেছিল, গাড়ি এবং অন্যান বিলাস উপকরণের মালিক হয়েছিল, তারা গোড়াতে আইয়ুব রাজত্বের পতন দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং মূলতঃ মিথ্যে ও আধাসত্য গুজব ছড়াতে শুরু করে। শহরগুলোতে গুণ্ডারা, রাস্তার ছেলেরা, ভিক্ষুকেরা ও বেকারেরা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অবাঞ্ছিত অংশই সর্বাধিক

লাঞ্ছনার শিকার হয়।...

ইতিমধ্যে মওলানা ভাসানী কর্তৃক গ্রামাঞ্চলে সূচিত 'ঘেরাও' এর প্রভাব পড়ে শিল্পাঞ্চলগুলোর সর্বহারা অংশের ওপর এবং ১৯৬৯ এর মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত 'ঘেরাও' একটা নিয়মিত বিষয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মালিকেরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা জানতো না কি করবে, কোথায় যাবে। তারা চেয়েছিল যাতে যে কোনো মূল্যে সামরিক আইন চেপে বসে। তারা আবার মিথ্যে ও অতিরঞ্জিত করে টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগলো, কেননা তারা একদিকে ''গুণ্ডাদের'' এবং অন্যদিকে কমিউনিস্টদের ভয়ে ভীত ছিল। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান তার চোখের সামনে তার যুগের পতন দেখলেন। তিনি নিজের জীবনের এবং জনগণকে নিপীড়ন ও দমনে তাকে সেবা ও সহায়তা দানকারী গভর্ণরদের জীবনের কথা ভেবে শংকিত হয়ে পড়লেন। তিনি এবং বিশেষত তার গভর্ণর আবদুল মোনেম খান ক্ষমতায় থাকার জন্যে শেষ মূহূর্তের চেষ্টা করলেন। ২৩শে মার্চ ''ইসলামী শাসনতন্ত্র দিবস'' পালন করা হলো। এদিন ফিল্ড মার্শা-লের দল গ্রাম্য মোল্লাগণ ও আরো কিছু ক্ষমতালোভী ধর্মান্ধ ইসলাম-পছন্দ লোকজনের সহায়তায় ''খোদাবিহীন কমিউনিস্টদের'' হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করার অজুহাতে মিছিল বের করে। ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসের প্রায় পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছিলো। কিন্তু আইয়ুব-মোনেম চক্রের এসব কর্মকাণ্ড শেষ রক্ষা করতে পারলো না। আইয়ুব সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে অবসর নিলেন। ২৫শে মার্চে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া শাসনতন্ত্র বাতিল করে সারা দেশে সামরিক আইন জারী করলেন।.....

কাজেই ১৯৬৯ এর ''ঘেরাও'' আন্দোলনকে নতুন প্রেক্ষাপটে বুঝতে ও মূল্যায়ন করতে হবে। দেশ এসময় এমন দৃশ্যাবলী অবলোকন করেছিল, যা তার বৈশিষ্ট্য, তার ছাপ ও প্রভাব এবং তার অনস্বীকার্য্য সমাজতান্ত্রিক তাৎপর্যে নজীরবিহীন। যদিও এটা মনে হতে পারে যে ২৫শে মার্চের পর থেকে সবকিছু স্বাভাবিক ও নিয়মবদ্ধ হয়ে গেছে, তথাপি এটা ভাবা নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে যে দেশ পুরনো দিনগুলোতে ফিরে গেছে। এটা বদলে গেছে এবং পরিস্থিতি কখনোই আগের মতো হতে পারে না। এটা ছিল একটা বিপ্লব--হতে পারে প্যারী কমিউনের মতো--এটা সকল বিপ্লবের মতোই অবশ্যম্ভাবীভাবে কিছু স্থায়ী ফল রেখে যাবে।

.........এরপরও শ্রমিকদের অসন্তোষ লক্ষ্য করা গিয়েছিল (১৯৬৯ এর ২৫শে মার্চ সামরিক আইন জারীর পরও--বর্তমান গবেষক)। পাকিস্তান জুট ম্যানুফ্যাক্চারার্স অরগেনাইজেশন শ্রমিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘদীন আলোচনার পর একটা চুক্তিতে পৌঁছেছিল। কিন্তু বস্ত্রকল মালিকদের সাথে যেহেতু ইউনিয়ন নেতৃবর্গের কোনো চুক্তিতে পৌছানো সম্ভব হলো না, সেহেতু সরকার এসব শিল্প অসন্তোষ মীমাংসার জন্যে শ্রম আদালতের শরণাপন্ন হল।

১০ই ডিসেম্বর মীমাংসায় আসা অবধি ঢাকার টঙ্গী এলাকায় ধর্মঘট চলতে থাকে।

উপরোল্লিখিত দু'টি বৃহৎ শিল্পে সংঘটিত গোলযোগ ছাড়াও ধর্মঘট হয়েছিল পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানীর কারখানায়, ঘেরাও হয়েছিল টঙ্গীর সিরা ইন্ডাস্ট্রিজ-এ। ঘেরাও ও ধর্মঘট হয়েছে খুলনার এস.এ.এফ. ইন্ডাস্ট্রিজে, তেজগাঁওয়ের রহিম মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজে, গোন্তগোলার ঈগল বক্স এ্যান্ড কার্টন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীতে, খুলনার দৌলতপুরের পাক জুট বেলারস্-এ এবং হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে। এদিকে শ্রমিক জঙ্গী মনোভাবের কারণে যশোরের কার্পেটিং জুট মিল্স ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হয়েছিল''।[১৬৯]

কামরুদ্দীন আহমদ আরো জানিয়েছেন যে, ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চে সামরিক আইন জারীর পর দীর্ঘদিন ধরে ঢাকেশ্বরী কটন মিল, চিত্তরঞ্জন কটন মিল, আদর্শ কটন মিল, ঢাকার চান্দ টেক্সটাইল মিল, যশোরের বেঙ্গল টেক্সটাইল মিলে গোলযোগ চলেছে। অতঃপর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া মেনে নিয়ে চুক্তি করায় এসব কলে-কারখানায় পরিস্থিতি শান্ত হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃত্বে টঙ্গীতে ধর্মঘট চলতে থাকে। প্রেস শ্রমিকেরা একটানা ২৭দিন ধর্মঘট করে এবং ১৯শে ডিসেম্বর তাদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়। এভাবে ১৯৬৯ সালের শুরুতে যে শিল্প অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে তা সারা বছর ধরে চলতে থাকে এবং ওই বছরেরই ২৫শে মার্চ সামরিক আইন জারী করার পরও তা বন্ধ তো হয়ইনি, উপরন্তু এর তীব্রতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ''এসময় সর্বাধিক জঙ্গী ইউনিয়নগুলো ছিল পিকিংপন্থী ন্যাপের প্রভাবাধীন পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সাথে সংযুক্ত। মস্কোপন্থী ন্যাপ এবং আওয়ামী লীগও এসময় শ্রমজীবী জনতাকে সংগঠিত করার জন্যে জোর প্রচেষ্টা চালায়, যদিও বোঝা যায় যে তারা এ ব্যাপারে দেরী করে ফেলেছে''।[১৭০]

৪. রওনক জাহান নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এ প্রকাশিত পিটার হ্যাজেলহার্স্ট,[১৭১] জোসেফ লেলিভেল্ড[১৭২] সহ আরো কিছু সাংবাদিকের রিপোর্ট ও বিশ্লেষণকে উদ্ধৃত করে ১৯৬৮-৬৯ এর ঘেরাও আন্দোলন ও বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের প্রকৃতি, ব্যাপকতা ও মাত্রা, নেতৃত্ব, তাৎপর্য ও প্রভাব নিয়ে একটা মূল্যায়ন করেছেন। তা থেকে দেখা যায়ঃ

১৯৬৮-৬৯ সালের বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব শাসনের উৎখাত ঘটে। এটা বাঙালির রাজনীতির বিপ্লবীকরণ ও মেরুকরণের সাক্ষ্য বহন করে। পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলন ছিল কেবল আইয়ুব ও তার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। অপর দিকে পূর্ব বাংলায় এটা ছিল ''পশ্চিম পাকিস্তানী নিয়ন্ত্রণ বা আধিপত্যের বাহন হিসেবে প্রতিভাত'' আইয়ুবী শাসন ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ১৯৬৬ সালে প্রদত্ত র‍্যাডিকাল স্বায়ত্তশাসনের দাবীগুলো আরো জোরের সঙ্গে সামনে আসে। ছাত্রদের নেতৃত্বে ও তাদের এগার দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে এ আন্দোলন সূচিত হয়। ছ'দফা যেখানে শুধু স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে কেন্দ্রীভূত ছিল, সেখানে এগার দফা কর্মসূচী বিস্তৃত হল

বামপন্থীদের, শ্রমিকদের ও কৃষকদের ভেতর আবেদন সৃষ্টিতে এবং এটা পূর্ব পাকিস্তানে গণ আন্দোলনের কর্মসূচীতে পরিণত হল। ছাত্রসমাজ ও শ্রমিক-কৃষকদের এই জাগরণ দেখেই দীর্ঘদিন ধরে বিশৃংখল নমনীয় বিরোধী দলগুলো গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি বা 'ডাক' গঠন করে। যদিও ১৯৬৮-৬৯ এর আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধানতঃ ছাত্র নিয়ন্ত্রিত এবং ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল, তথাপি এটা যত অগ্রসর হতে থাকে তত অন্যান্য গোষ্ঠীসমূহ এতে বিজড়িত হয়ে পড়ে এবং ক্ষুদ্র শহরগুলো ও গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৬ সালে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার মৈত্রী আবার নেতৃত্বে চলে আসে এবং শেষাবধি আন্দোলনের অধিকতর সহিংস পর্যায়ে শ্রমিকেরা ও রাজপথের জনতা প্রাধান্যে চলে আসে। এ আন্দোলনের প্রথম দিককার শহীদগণ ছিল ছাত্র, কিন্তু অনতিকাল পরেই কল-কারখানা ও প্রশাসনিক ভবনসমূহ আক্রমণে এবং অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে শ্রমিকরাই নেতৃত্ব দেয়। শ্রমিক শ্রেণী ও উম্মত্ত জনতা প্রাদেশিক সরকারের প্রধান অফিস পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয় এবং পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘকাল যাবৎ ''পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিবাদ''-এর প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত আদমজী পাট কল গুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চালালে তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্যে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। ১৯৬৯ এর ফেব্রুয়ারীর মাঝ নাগাদ গণ আন্দোলন অতি তীব্র সহিংসতার দিকে মোড় নেয় যখন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন অভিযুক্তকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। এসময় বারংবার সান্ধ্য আইন ভাঙা হয় এবং সামরিক বাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধিতা চরমে ওঠে। ২১শে ফেব্রুয়ারীতেই আইয়ুব তার পদত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

গোড়াতে এ আন্দোলন ছিল মূলতঃ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই এ আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসে শিল্প শ্রমিক শ্রেণী ও নগরাঞ্চলের লুমপেন সর্বহারাগণ এবং শেষাবধি ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে গরীব কৃষকরাও প্রাধান্যে চলে আসে। যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবীর পাশাপাশি শ্রমিকদের দাবীও উঠে আসে তখন কিছু সংখ্যক বাঙালি বুর্জোয়া হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ভীত হয়ে ওঠেন কেননা তখন বাইরের ''ঔপনিবেশিক'' শক্তি আর শত্রু ছিল না, বরং শত্রু বেরিয়ে পড়ে ভেতরে। বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর অনেকেই স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে ইতিপূর্বে সমর্থন দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন ''ঘেরাও'' কৌশল বাঙালি শিল্পপতি, ম্যানেজার, প্রশাসকদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে লাগলো এবং যখন গ্রামাঞ্চলের অসন্তোষ ও আন্দোলনের খবর আসতে লাগলো, তখন স্বভাবতঃই তারা হুমকির মুখে ভীত হয়ে পড়েন। ছাত্ররা এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটিও এসময় শান্তি এবং আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্যে আবেদন জানান। এসময় বাম রাজনীতি ও ডান রাজনীতির ভেতরকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে এবং ব্যালটে নয় রাজপথেই সমস্যা সমাধানের দাবী ওঠে। এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে রাজনীতিক দলগুলোর করবার কিছুই ছিল না। দলগুলো ও নেতৃবৃন্দ আন্দোলন সফল হবার পরই কেবল এতে যোগ দেয় এবং এজন্যে ''জনতার বিপ্লব''-কে নিয়ন্ত্রণ করা বা পরিচালনা করার শক্তি তাদের ছিল না। আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেয়ার পরিবর্তে যে জনতা তাদেরকে অনুসরণ করার কথা ছিল, তারা তাদেরকেই অনুসরণ করতে থাকেন।[১৭৩]

৯

বুর্জোয়া রাজনীতিক নেতৃত্বের ভূমিকা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ

বস্তুত ১৯৬৯ এর ঘেরাও আন্দোলন ও বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে কেবল স্বৈরাচারী সরকারের উৎখাতই ঘটেনি, এর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজি ও আমলা–সামরিক চক্রের ঔপনিবেশিক শোষণ–শাসন তথা শোষণের চূড়ান্ত অবসানের ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যমান সমাজ কাঠামো উৎপাটনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ১৯৬৯ সালের মে মাসে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি গণঅভ্যুত্থানের পর্যালোচনা করে যে দলিল প্রকাশ করে তাতে বলা হয় ঃ

''শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র এরকম নাজেহাল, বিকল ও বিপর্যস্ত বৃটিশ শাসনের দু'শ বছরে এবং পাকিস্তানের ২২ বছরে আর কোনদিন হয়নি''।[১৭৪]

ডেভিড লোশাক বলেন, ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ যখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন, তখন পূর্ব বাংলার অবস্থা ছিল মারাত্মক। সমাজের ভিত্ ধ্বসে পড়েছিল। সকল স্বীকৃত কর্তৃত্ব ভেঙে পড়েছিল অথবা তাদের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নগরী দখল করে ছিল ও নিয়ন্ত্রণ করছিল। সারা পূর্ব বাংলায় 'গণ পরিষদ' নির্বাচিত হয়েছিল মৌলিক গণতন্ত্রের পরিবর্তে। 'গণ আদালত' বিচার করেছিল সমাজ বিরোধী, দুষ্কৃতকারী ও গণ বিরোধীদের। মৌলিক গণতন্ত্রী, ভূস্বামী–জোতদার–মহাজন, রাজস্ব আদায়কারীদের শায়েস্তা করা হয়েছিল। হরতাল, স্ট্রাইক ও ঘেরাও ব্যাপকভাবে সংগঠিত ও সংঘটিত হয়েছিল। শ্রমিক–কর্মচারী মিলে–কারখানায়, অফিসে–প্রতিষ্ঠানে ঘেরাও করে দাবী আদায় করেছিল বলপূর্বক। পূর্ব বাংলা থেকে পুঁজি পাচার করা হয়েছিল ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পরবর্তী দু'বছর ধরে তা অব্যাহত ছিল। ধনীরা তাদের টাকা (রুপী) বিদেশী মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। কালো বাজারে বিনিময় হার সরকারী হারকে বিপর্যস্ত

করেছিল। অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল।

লোশাক অবশ্য এসব ভাল দৃষ্টিতে দেখেননি। তিনি এসবের সমালোচনা করেছেন। ১৯৭১ সালে লিখিত গ্রন্থে লোশাকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ''সরকার পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল চূড়ান্তভাবে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন ছাত্ররা ও আওয়ামী লীগই শৃংখলা রক্ষার প্রথম কাজগুলো করেন। যে লোকটাকে এখন (অর্থাৎ ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চে পূর্ব বাংলায় গণহত্যা শুরু হবার পর—বর্তমান গবেষক) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দেশদ্রোহের অভিযোগে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করছেন, বস্তুত সেই লোকটিই (অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান—বর্তমান গবেষক) ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার কার্যকর উদ্যোগ নেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী, নৈরাজ্যবাদীদের, বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের এবং অন্যান্য চরমপন্থীদের উৎসাহ দেয়া তো দূরের কথা, শেখ মুজিব প্রকাশ্যে সরকারকে আহ্বান জানান ধ্বংসসাধনকারী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। মাওবাদী কৃষক নেতা মওলানা ভাসানী এসময় কৃষকদেরকে প্রদেশকে 'আরেকটি ভিয়েৎনাম'–এ রূপান্তরিত করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। মূলত একজন উদারপন্থী হিসেবে মুজিব বিষয়টি বুঝতে পারেন। সাহস, দূরদৃষ্টি ও কর্তৃত্ব দ্বারা পরিস্থিতি রক্ষার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট নেতৃত্বসুলভ গুণাবলী ছিল''।[১৭৫]

বস্তুত জনগণের ঘেরাও আন্দোলন, সংগ্রামে ও সংঘাতে ব্যাপক শ্রমিক–কৃষক বিত্তহীন মেহনতি জনতার সামনে চলে আসা, আন্দোলনের অভ্যুত্থানে রূপান্তর, সমগ্র বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রেণী চেতনা ও সমাজ বদলের আকাঙ্ক্ষার বিকাশ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী বলিষ্ঠতম রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ ইত্যাদির ফলে কেবল পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক বৃহৎ পুঁজি ও তাদের আমলা–সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশাসনই নয়, সেই সঙ্গে পূর্ব বাংলার বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণী, জোতদার–মহাজন ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ, বুর্জোয়া রাজনীতিক নেতৃত্বও সহিংসা ও বিশৃংখলার অভিযোগ তুলে আন্দোলনের রাশ টেনে ধরার প্রয়াস পান, একে যে কোনোভাবে স্তিমিত করার উদ্যোগ নেন। এভাবে জনতার আন্দোলন–সংগ্রামকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হাসিলের ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত করা হয়।[১৭৫ক]

৩রা মার্চ ১৯৬৯–এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স–এর কার্যনির্বাহী পরিষদ সমগ্র দেশের ব্যবসায়ী সমাজকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা করার প্রয়াসকে সকল দিক দিয়ে সহায়তা করার নির্দেশ প্রদান করে। চেম্বার যে কোনো মূল্যে শান্তি বিনষ্টের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করার আহ্বান রাখে।[১৭৬]

ইতিপূর্বে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ তারিখে বিকেলে ঢাকায় রমনা রেসকোর্সের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) নিকট পুলিশের গুলিতে তিনজন বিক্ষোভকারী আহত হলে জনতা যখন মারমুখী হয়ে ওঠে তখন পরিস্থিতি আরও বিস্ফোরণমুখী হয়ে উঠতে পারে বুঝে শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে আহ্বান জানান এবং তাঁর সে আহ্বান সেদিন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র হতে পুনঃপুনঃ প্রচার করা হয়।[১৭৭]

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডাক)–ও মার্চের গোড়া থেকেই বারংবার শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। ডাক–এর অন্তর্ভূক্ত দলগুলো অর্থাৎ আওয়ামী লীগ, জমিয়তুল উলামায়ে

ইসলাম, মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পি.ডি.এম-এর অঙ্গ সংগঠন পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ, পাকিস্তান জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও জামাত-ই-ইসলামীর নেতাগণ জনগণকে পুনঃপুনঃ শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী মোস্তফা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে পাড়ায় ও মহল্লায় 'শান্তি কমিটি' গঠনের আহ্বান জানান।[১৭৮] একই সময়ে খান বাহাদুর ফজলুর রহমান, মুসলীম লীগ নেতা আবদুস সবুর খান, জামাতের প্রধান মওলানা মওদুদী, কমিউনিস্ট পার্টির মণি সিং, হাতেম আলী তালুকদার, রবি নিয়োগী সহ অনেক নেতা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার আহ্বান জানান।[১৭৯] তৎকালীন পাকিস্তানের একটি বৃহৎ শিল্পপতি পরিবার ইস্পাহানীরাও শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।[১৮০] এমনকি জানা যায় যে, এসময় ডাক-ভুক্ত মস্কোপন্থী মোজাফ্ফর ন্যাপের নেতৃবৃন্দ জামালপুর-শেরপুর প্রভৃতি স্থানে প্রশাসনের সঙ্গে একযোগে সভা-সমাবেশ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে সোচ্চার হন।[১৮১] এদিকে ১৯শে মার্চ এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মজদুর ভাই ও আওয়ামী লীগের প্রত্যেক সদস্যের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, এ মুহূর্তে আপনারা দেশের সমগ্র জনগণের অধিকার রক্ষা ও শান্তি বজায় রাখার জন্যে সকল শক্তি নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।[১৮২] লক্ষণীয় যে, ১৪ই মার্চ ১৯৬৯ থেকে শেখ মুজিব ও অন্যান্য বুর্জোয়া রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ খুবই উল্লেখযোগ্যভাবে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্যে জনগণের কাছে আবেদন জানান, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বান জানান। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও একই বক্তব্য রাখে। ঢাকাসহ সারা পূর্ব বাংলায় শান্তি কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়।[১৮৩]

কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণী, সামরিক ও আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রকাঠামো শহরে-গ্রামে ধনী ও সম্পত্তিবান গোষ্ঠী, বুর্জোয়া রাজনীতিক নেতৃত্ব--এরা সবাই শান্তি প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হলেও ১৯৬৮-৬৯ এর ঘেরাও আন্দোলন ও বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান পুরো সমাজে ও জনগণের চেতনায় নজীরবিহীন প্রভাব বিস্তার করে, প্রচন্ড ছাপ রেখে যায়। বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক নিপীড়িত জনতার শ্রেণী চেতনা উল্লেখযোগ্য বিকাশ লাভ করে। ঊনসত্তরের বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের মাত্র দু'বছরের মধ্যে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল।

২৫শে মার্চ ১৯৬৯-এ সামরিক শাসন জারীর পরপর প্রগতিশীল বামপন্থী ছাত্রনেতা তারিক আলী এক প্রচারপত্রে মন্তব্য করেছিলেনঃ

> "যে শান্তি ফিরে এসেছে মনে হয় তা প্রতারণামূলক হতে বাধ্য। দশ বছর পরে এক জোয়াল থেকে মুক্ত হবার পর পূর্ব পাকিস্তানীরা এক বছরের বেশী আরেকজন পশ্চিম পাকিস্তানী একনায়ক মেনে নেবেন বলে মনে হয় না। সামান্যতম ঘটনাও আরেকটি অভ্যুত্থানের জন্ম দিতে পারে, যার পরিণতি হবে স্বাধীন এবং সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান"। [১৮৪]

১০

বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের প্রভাব ঃ নভেম্বর ১৯৬৮ থেকে মার্চ ১৯৭১ এর ভেতর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ঐকমত্য

ষাট দশকের শেষ দিক থেকে সমগ্র পূর্ব বাংলায় সমাজতন্ত্রের চেতনা ব্যাপক গণ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ষাট দশকে সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন দেশ এবং প্রতিবেশী পশ্চিম বঙ্গ থেকে পূর্ব বাংলায় আমদানীকৃত কিংবা এখানে প্রকাশিত মার্কসীয় দর্শন এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ, বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত মূল রচনাবলী, গ্রন্থ-পুস্তক-পুস্তিকা-প্রচারপত্র ইত্যাদির ব্যাপক প্রচার ও পাঠের মাধ্যমে সাধারণভাবে এতদঞ্চলের শিক্ষিত ও ছাত্র যুব সমাজের ভেতর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে সর্বাধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী মৌলিক কারণ ছিল দৈশিক পরিস্থিতি এবং ঔপনিবেশিক ও শ্রেণী শোষণমূলক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে তৎকালীন পূর্ব বাংলার শিক্ষিত ছাত্র-যুব সমাজের তিক্ততম অভিজ্ঞতা। ইতিপূর্বে সমাজতন্ত্রের চেতনা বামপন্থী ও প্রগতিশীল রাজনীতিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক-কৃষক সংগঠনের নেতৃবর্গ ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে সীমিত ছিল। কিন্তু, আইয়ুবের দশ বছরের শাসনামলে ব্যক্তিগত খাতে আর্থনীতিক উন্নয়নের নীতি গ্রহণের ফলে সমগ্র পাকিস্তানে এবং পূর্ব বাংলায়ও পুঁজি ও সম্পদের চরম কেন্দ্রীভবন ঘটে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভেতর আঞ্চলিক বৈষম্য চরম আকার নেয় এবং সেই সঙ্গে শ্রেণীগত বৈষম্যও রেকর্ড সৃষ্টি করে। অঞ্চল ও শ্রেণীগত বৈষম্য--এ উভয়ের চাপ পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি গরীব জনগণ ভয়ানকভাবে অনুভব করে। বন্টন সংকট মারাত্মক আকার নেয়। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসাসহ যাবতীয় নিরাপত্তার

অভাব এবং সেক্ষেত্রে একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার এবং অপরদিকে পূর্ব বাংলার উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে এখানকার সাধারণ জনগণের অবস্থানগত পার্থক্য মারাত্মক পর্যায়ে চলে যায়। এ অবস্থাতেই পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী-শিক্ষিতদের অগ্রসর অংশের শ্রেণী চেতনা ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি অনুরাগ তাদের পরিধি ছাড়িয়ে অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হয় ব্যাপক সাধারণের ভেতর। ১৯৬৮-৬৯ এর ঘেরাও আন্দোলন, বৈপ্লবিক গণ অভ্যুত্থান এবং ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক মেহনতি জনতা সর্বাত্মক শোষণ মুক্তির ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে জঙ্গী প্রাধান্য তৈরী করে সামনে চলে আসার ফলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী সর্বাধিক অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয় এবং এ ব্যাপারে পুরো পূর্ব বাংলা জুড়ে জনমত তৈরী হয়।

এসময় আওয়ামী লীগও জন চেতনাকে ধরে রাখার জন্যে তাদের বক্তব্যে, প্রচারে, ঘোষণায়, বিবৃতিতে এবং এমনকি তাদের দলীয় ও নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে দলীয় আদর্শ বলে ঘোষণা করে। এ পর্যায়ে পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক অন্যান্য মোটামুটি প্রগতিশীল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের আদর্শ বলে ঘোষণা দেয়।

এসময় আওয়ামী লীগ কর্তৃক ঘোষিত সমাজতন্ত্রের নীতি আওয়ামী লীগের নের্তৃবর্গের মার্কসীয় মতাদর্শ পঠন-পাঠন ও উপলব্ধি এবং তা যথার্থ অর্থে গ্রহণের ফল ছিল, তা বলা যাবে না। আওয়ামী লীগের নেতৃবর্গ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও মানস জগত পুরোপুরি ত্যাগ করে শ্রেণী ত্যাগী সর্বহারায় পরিণত হয়ে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা-ও বলা যাবে না। বরঞ্চ আওয়ামী লীগ সে সময় পূর্ব বাংলার বিকাশ-আকাঙ্ক্ষী উঠতি বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠান হয়েও বাঙালি জাতীয়তাবাদের ন্যায্যতার বাস্তবতায় ব্যাপক গণভিত্তির কারণে এবং দলীয় সাধারণ কর্মী, ছাত্র সমাজ ও জনগণের আন্দোলনের চাপের প্রভাবে এবং সেসময়কার গণমেজাজ উপলব্ধিকরত সমাজতন্ত্রের কথা অত্যন্ত জোরেশোরে ঘোষণা করতে থাকে।

তৎকালীন পূর্ব বাংলায় লীগ নেতৃত্বের পক্ষে সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণের পটভূমি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রেহমান সোবহান ও মুজাফফর আহমদ বলেন ঃ

> ১৯৬৯ সালে যখন আওয়ামী লীগের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করলো, তখন আইয়ুব রাজত্বের সুবিধা নিয়ে মই বেয়ে উঠেছিলেন এমন বহু ব্যবসায়ী তাদের রাজনীতিক আশ্রয় রক্ষার জন্যে এ দলের ভেতর ঢুকে পড়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন। ....অবশ্য ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে পুরোনো ও নব্য ব্যবসা স্বার্থ স্বল্প প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বস্তুতঃ দলটি এখন জনতার সমর্থন লাভের দিকে পরিচালিত হচ্ছিলো। ১৯৭০ এর মাঝ নাগাদ দলের ম্যানিফেস্টো বা কর্মসূচী তৈরী করার সময় দায়িত্বটা দেয়া হয়েছিল আদর্শগতভাবে পার্টি-কেন্দ্রের বাম দিকে অবস্থান নেয়া অংশকে। শেষোক্তরা আবার একদল বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সাহায্য নিয়েছিল যারা

বাম দিকে অবস্থান নেয়া অংশকে। শেষোক্তরা আবার একদল বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সাহায্য নিয়েছিল যারা জাতীয়করণের ধারাসহ কর্মসূচীর র‍্যাডিকাল ধারাগুলো লিখেছিলেন এবং অধিকতর বিপ্লবী লক্ষ্যসমূহের সাথে দলের একাত্মতা তৈরী করেছিলেন। কর্মসূচীটি অনুপ্রাণিত হয়েছিল ছ'দফা ও এগারো দফা কর্মসূচী দ্বারা যা ইতিমধ্যেই গণ ঐক্যের সূত্রে পরিণত হয়েছিল। এর বৈপ্লবিকতা অবশ্য এরই ভেতর পার্টি নেতৃত্ব ও ক্যাডারদের দ্বারা রাজনীতিক ভাষা-অলঙ্কার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল। মনে করা হয়েছিল যে কর্মসূচীর বিপ্লবী উপাদানগুলো ১৯৭০ এর আগস্টে অনুষ্ঠিতব্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সভায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে যখন এটা নিয়ে আলোচনা ও একে গ্রহণ করা হবে। কেননা এটা জনপ্রিয় বক্তব্যগুলোকে আনুষ্ঠানিক রাজনীতিক প্রতিশ্রুতিতে পরিণত করবে। এমন কোনো চ্যালেঞ্জ অবশ্য আসেনি কারণ শেখ মুজিব এই কর্মসূচীর প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা রেখেছিলেন এবং রক্ষণশীলরাও বুঝতে পেরেছিল যে তারা দলের জঙ্গী-অংশের র‍্যাডিকাল মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে না। কর্মসূচীটি তাই কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই পাশ হয়........[১৮৫]

এদিকে মোশাররফ হোসেন ১৯৬৯ সালের বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে তৎকালীন পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দল ও নেতৃত্ব বিশেষত আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতে প্রগতিশীল মতাদর্শ তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত হবার পটভূমি সম্পর্কে ব্যাখ্যাদানকালে লিখেছেন ঃ

পাকিস্তানে আইয়ুব খানের শাসনের পতন কেবল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী শক্তির বিজয়কেই চিহ্নিত করেনি, বরং আমলাচক্র শ্রেণীসমূহের আকাঙ্ক্ষা পূরণে কত বেশী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা-ও উপলব্ধ হয়। পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ ও মধ্যস্থতার জন্যে যে রাষ্ট্রযন্ত্র সেটা সামরিক শাসকগোষ্ঠী এবং পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণী, শহরে মধ্য শ্রেণী ও মৌলিক গণতন্ত্রীদের সাথে সাথে কলঙ্কিত ও অবিশ্বস্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদার ও শাসকগোষ্ঠীর অন্যান্য অংশ গ্রামাঞ্চলের ওপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারলেও পূর্ব বাংলায় উচ্চ শ্রেণীগুলো জনমণ্ডলী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। দেশ ভাসানো জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে ছাত্রসমাজ, বিভিন্ন বৈপ্লবিক অংশ এবং আইয়ুবের তথাকথিত 'অগ্রগতির দশক'-এর সময় সমর্থন প্রদানে অনিচ্ছুক শক্তিসমূহ শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়ে সামনে চলে আসে।
পঞ্চাশের দশকে আওয়ামী লীগ বাঙালি বণিক ও ব্যবসায়ী এবং ভূস্বামী ও

পেশাজীবী শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধিত্ব করতো। কিন্তু, ১৯৬২ সালের মার্চের পর থেকে বহু সংখ্যক যুব বিপ্লবী এ দলে নিজেদের অন্তর্ভুক্তি ঘটান কেননা গতানুগতিক বিপ্লবীদলগুলো পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনীতিক সংগ্রাম শুরু করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ ছিল। উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহের নেতৃত্ব গ্রহণকারী প্রধান সামাজিক শ্রেণীর পরিচিত ধরনটির পক্ষে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পুনঃনেতৃত্ব গ্রহণ সম্ভব ছিল না। জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবীরা তৎকালীন প্রধান সামাজিক শ্রেণীকে মুৎসুদ্দি গোষ্ঠী বলে মনে করতেন। উচ্চ শ্রেণীর বিশ্বস্ততা নষ্ট হওয়া এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রে দৃঢ়ভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের ব্যর্থতা মৌল সামাজিক ইস্যুগুলোর ব্যাপারে দলের নীতিতে এবং মুক্তিযুদ্ধে উচ্চ শ্রেণীর ভূমিকায় দূরপ্রসারী প্রভাব রাখে। দলে প্রগতিশীল অংশসমূহের প্রভাবের তীব্রতা দলকে বিপ্লবী কর্মসূচী গ্রহণে বাধ্য করে এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে চূড়ান্ত বিজয়ে সাহায্য করে।[১৮৬]

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৬৮–৬৯ এর বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের কালে ও এর পর থেকে পরবর্তী পুরো সময়টা জুড়ে প্রগতিশীল বামপন্থী, কমিউনিস্ট দল–সংগঠন, শ্রমিক–কৃষক সংগঠন, ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং এদের নেতৃত্ব তো বটেই, এমনকি সেই সঙ্গে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দল–সংগঠন ও তাদের নেতৃত্বও বিশেষত আওয়ামী লীগও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে তাদের অন্যতম লক্ষ্য ও কর্মসূচী বলে ঘোষণা করে।

১৯৬৮ সালের ১লা ডিসেম্বর সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন (পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি) তাদের এক থিসিসে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার আহ্বান জানায়। ওই থিসিসে তারা বলে ঃ

এ বিপ্লবের একটি চরিত্র হলো সশস্ত্র বিপ্লব। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল উপাদান সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও আইন এবং এদের সাহায্যে ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণী পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণ করছে''। ''পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্বের'' মীমাংসা করার জন্যে ''..........সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক–কৃষক ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরকে ঐক্যবদ্ধ করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক–কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরের সমন্বয়ে নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে হবে''। কাজেই ''পূর্ব বাংলার বিপ্লব হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব'' এবং ''সর্বহারার নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের লক্ষ্য ধনতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্র।[১৮৭]

১৯৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)–এই তিনটি ছাত্র সংগঠন 'ডাকসু' সহ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১১–দফা দাবী পেশ করে, যেটি আইয়ুব বিরোধী বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের প্রাণ হিসেবে কাজ করে। ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৬৯–এ ''ডাকসু'' কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করার উদ্দেশ্যে ১১–দফা কর্মসূচী প্রদত্ত হয়। এই কর্মসূচী অতি দ্রুত সমগ্র বাঙালি জনমণ্ডলীর গণদাবীতে, তাদের সংগ্রামী কর্মসূচীতে পরিণত হয়। ১১–দফায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বলা হয়ঃ

> ''ব্যাঙ্ক, বীমা, ইনসিওরেন্স ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে'' (৫নং দফা)।
>
> ''কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহসিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ৪০.০০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের মূল্য দিতে হইবে'' (৬নং দফা)।
>
> ''শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে (৭নং দফা)। [১৮৮]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তী দু'বছরের রাজনীতিতে ছাত্রদের এই ১১–দফা কর্মসূচীর সার্বিক ও নির্ধারক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯–এ রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সভাপতিত্বে যে গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, তা ১০ই মার্চ পুনরায় আরম্ভ হয়। এই বৈঠকে শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে দেশের আর্থনীতিক সমস্যা সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন তা থেকে অত্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পাকিস্তানী পুঁজিবাদী আর্থনীতিক ব্যবস্থা ও পূর্ব বাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক নীতির ফলে যে শ্রেণী ও অঞ্চলগত শোষণ ও বৈষম্য ঘটেছে এবং ধনী–গরীবের পার্থক্য চরমাকার লাভ করেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্তির মানসেই আর্থনীতিক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের প্রয়োজন শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সংগঠনের ভেতর অনুভূত হয়। অন্তত সে সময়কার পূর্ববাংলার জনচেতনার প্রগাঢ় চাপ তারা উপলব্ধি করেন। বস্তুত সেসময়ে ব্যাপক বাঙালি জনমণ্ডলীর—শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র সমাজের গণদাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজতন্ত্রের বক্তব্যকে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ

নিজেদের কর্মসূচীর ও প্রচার কার্যের অন্তর্ভুক্ত করে। যাহোক, আইয়ুব-আহুত গোল টেবিল বৈঠকে অর্থনীতি প্রসঙ্গে মুজিবের বক্তব্যের অংশবিশেষ ছিল নিম্নরূপ ঃ

> ......জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কণ্ঠে যে সব দাবী-দাওয়া আজ ধ্বনিত হচ্ছে, যত্নসহকারে সেগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, তার মূলে মাত্র তিনটি প্রশ্ন নিহিত। প্রথমটি হ'ল, রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার অবলুপ্তি। দ্বিতীয়টি সীমাহীন অর্থনৈতিক অন্যায়-অবিচার। যার ধকল পোহাতে হচ্ছে এ দেশের শ্রমিক-কৃষক-নিম্নমধ্যবিত্ত আয়ের মানুষকে-মোটকথা আপামর জনসাধারণকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে বেধড়ক ব্যয়জনিত ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির মাশুল যোগাতে হচ্ছে যেখানে এ দেশের কোটি নিরন্ন-নিঃসম্বল মানুষকে, সে ক্ষেত্রে সে উন্নয়নের সুফল ক্রমবর্ধমান হারে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মাত্র গুটিকয় ভাগ্যবান পরিবারের হাতে, যাঁরা আবার দেশের একই অঞ্চলের বাসিন্দা। তৃতীয় কারণটি হ'ল পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি সমানে অবিচার করা হচ্ছে এই উপলব্ধি।......
>
> সমাজ ব্যবস্থাকে সুষম খাতে ঢেলে সাজাতে হ'লে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি অবিচার অনাচারমুক্ত করার অনিবার্যতা ফুটিয়ে তুলবার মত জোরালো ভাষা আমার নেই। ছাত্রদের যে ১১-দফা কর্মসূচীর প্রতি আমি সমর্থন জানিয়েছি তাতে দেশের আর্থনীতিক ও শিক্ষা পদ্ধতির পুনর্বিন্যাসের যথোপযুক্ত প্রস্তাব রয়েছে। এদাবী তারা তুলেছে অর্থনৈতিক সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধানের মানসে। মানুষে মানুষে, অঞ্চলে অঞ্চলে অর্থনৈতিক সুবিচারের নিশ্চয়তাবিধানের জন্য যে সব শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন, আমি অবশ্য তার মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবিচারজনিত অবস্থার অতি দ্রুত অবনতি ঘটতে ঘটতে আজ এক সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ দেশের বহু কথিত বাইশ পরিবারের কাহিনীর চর্বিতচর্বনের আর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনে। ক্ষমতার অলিন্দে অলিন্দে নির্বিচারে প্রবেশের যে ছাড়পত্রের তাঁরা অধিকারী, তাতে দেশের সম্পদ কুক্ষিগত ক'রে দেশ-বিদেশে তাঁরা প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। একচেটিয়া কার্টেলবাদ সৃষ্টি ক'রে দেশের বুকে তারাই এমন এক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পত্তন করেছেন, যাতে সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয় ও শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর অগণিত মানুষের মধ্যে সীমাহীন ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর গড়ে উঠেছে।[১৮৯]

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি তাদের কর্মসূচী প্রকাশ করে। এতে বলা হয়ঃ ''সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির প্রতিভু

এককেন্দ্রিক স্বৈরাচারী সমরবাদী শাসকগোষ্ঠীকে পূর্ব বাংলার বুক হইতে উচ্ছেদ করিয়া একমাত্র 'স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' কায়েমের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার শোষিত, বঞ্চিত জনতার মুক্তি সম্ভব''। এতে আরো বলা হয়ঃ ''সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করিয়া জনগণতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করিতে হইবে।'' সমন্বয় কমিটির কর্মসূচীতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের জন্যে দেশী–বিদেশী বৃহৎ পুঁজি, শিল্প–কারখানা ও খনি, জাহাজ, বিমান, অস্ত্র কারখানা, বিদ্যুৎসহ যাবতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রের মালি– কানা সামাজিক ও রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবী তোলা হয়। পাট শিল্পও রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবী তোলা হয়। এভাবে শিল্পনীতি, কৃষিনীতি, বাণিজ্যনীতি, শ্রমনীতি, শিক্ষা–সংস্কৃতি নীতি ইত্যাদি সবকিছুই ওই কর্মসূচীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্দেশিত করার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়।[১৯০]

১লা আগষ্ট ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ যে নীতি ও কর্মসূচীর ঘোষণা (ম্যানিফেষ্টো) দেয়, তাতে বলা হয়ঃ'' আওয়ামী লীগের আদর্শ স্বাধীন, শোষণহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমেই বর্তমানের শোষণ, বৈষম্য, অবিচার ও দুর্দশার হাত হইতে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত লক্ষ্য।''[১৯১]

এদিকে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান আসাদ হত্যার প্রতিবাদ যখন তুঙ্গে উঠছে, তখন ২৩শে জানুয়ারী 'পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্র সমাজ'এর নামে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে এক প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

প্রচারপত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

পূর্ব বাংলার জনগণ আবার রুখে দাঁড়িয়েছে। মুক্তি আর স্বাধীনতার আহ্বানে পূর্ব বাংলার শ্রমিক কৃষক ছাত্রজনতা আজ পথে নেমেছে। ১৯৫২ সালের মায়ের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হয়েছে আমাদের মুক্তি সংগ্রাম। যে সংগ্রাম সে দিন শুরু বাঙালির রক্তের বিনিময়ে তা আজো থামেনি। এদেশের মাটিকে সকল প্রকার পরাধীনতার গ্লানির হাত থেকে মুক্ত করার জন্য আজ আমরা বদ্ধপরিকর। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে বছরে বছরে আমরা রক্ত দিয়েছি— রক্ত দিয়েছি ৬২ সালে, ৬৪ সালে, ৬৬ সালে, ৬৮ সালে, ৭ই, ১৩ই ও ২৯শে ডিসেম্বরে। আজো আমাদের রক্ত ঝরছে। গতকাল ২০শে জানুয়ারীতে আমরা রক্ত দিয়েছি। আমাদের প্রিয় বন্ধু কর্মী আসাদ পাকিস্তানী পুলিশের হাতে প্রাণ দিয়ে আবার প্রমাণ করলো পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস রক্তের প্রচ্ছদে লেখা এক ইতি- হাস।

> পূর্ব বাংলা যখন বিক্ষুব্ধ, পূর্ব বাংলার শ্রমিক কৃষক, ছাত্রজনতা যখন মুক্তির নবদিগন্তে পৌঁছে যাবার জন্য বদ্ধপরিকর সেই সময় এদেশেরই কিছু বিশ্বাসঘাতক হতাশ রাজনীতিবিদ পূর্ব বাংলার মুক্তির প্রশ্নকে বাদ দিয়ে এক ভুয়া ঐক্য ফ্রন্টে মিলিত হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি এই দলের কুখ্যাত নেতা অথর্ব নূরুল আমিন আয়ুব খানের সাথে সহযোগিতা ও আপোষের আলাপ চালাচ্ছে।
>
> এমনি সময়ে পূর্ব বাংলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর এক শকুনী। এই শকুনী হল আমেরিকা। আমেরিকা চায় পূর্ব বাংলার জনগণের রক্ত তাই সে সকল অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে আইয়ুব সরকারকে।
>
> তাই পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি আজ আমাদের আহ্বান আসুন শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রজনতা সবাই মিলে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করি।
>
> যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পূর্বাবাংলাকে মুক্ত করবোই—পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাত হতে গড়ে তুলবো শ্রেণীহীন, শোষণহীন জনগণের স্বাধীন পূর্ববাংলা। [১৯২]

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ সালে সংগ্রামী ছাত্র সমাজের নামে বিলিকৃত আরেকটি প্রচারপত্রেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী তোলা হয় ঃ

> গণ আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারে পূর্ব বাংলা আজ উদ্বেল। স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর মসনদ আজ টলায়মান। অশিতিপর বৃদ্ধ অগ্নিপুরুষ মজলুম জননেতা মওলানা হামিদ খান ভাসানী এ আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র। তাঁকে সামনে রেখে কাতারবন্দী হয়েছে পূর্ব বাংলার সাতে ছয় কোটি মানুষ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, কাতারবন্দী হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ আর নয়া উপনিবেশিবাদকে কবর দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের অপ্রতিরোধ্য প্রত্যয় নিয়ে। [১৯৩]

এদিকে ১৯৬৯ সালের ১১ই আগষ্ট করাচী প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ মুজিব জানান যে আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করে। এ সম্পর্কে খবরে বলা হয়ঃ

"আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তাঁহার দল সমাজতন্ত্র সমর্থন করে। কিন্তু উক্ত সমাজতন্ত্র ধার করা বা আমদানীকৃত আদর্শের ভিত্তিতে নহে, বরং আমাদের পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে"। [১৯৪]

১৯৬৯ সালের ২৯শে আগষ্ট খুলনা পৌরসভা মিলনায়তনে শহর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবকে রৌপ্য নির্মিত একখানা নৌকা উপহার

দেয়া হয়। উক্ত নৌকার হালে 'সমাজতন্ত্র' কথাটি লিখিত ছিল এবং পাশে খচিত আওয়ামী লীগের পতাকা।[১৯৫]

১৯৬৯ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব চট্টগ্রামে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে তাঁর দলের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে দেশে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> এই সমাজতন্ত্র আমরা রাশিয়া বা চীন হইতে আমদানী করিব না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের নিজস্ব প্রয়োজন মত দেশজ সম্পদের ভিত্তিতেই উহা গড়িয়া তুলিবেন। এই দেশজ সম্পদ বলিতে আমার দল দেশের পারিপার্শ্বিকতা, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি , জীবনের প্রতি মনোভাব, জাতীয় সম্পদ ও দেশের মানুষের প্রতিভাকে বুঝায় ।[১৯৬]

আওয়ামী লীগ এসময় জাতীয় অর্থনীতির একটা বিরাট অংশের যেমন পাট, বস্ত্র, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীসমূহের জাতীয়করণের কথা বলে। কিন্তু, তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপের কথা যেমন বলেনি, তেমনি শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে সমাজ বিকাশের ব্যাখ্যাও দেয়নি। আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্র সে সময় ছিল যেন জীবনের ব্যাপারে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর ভিত্তিশীল।[১৯৭] লক্ষণীয় যে, এসময় আওয়ামী লীগ সিয়েটো, সেন্টো ও অন্যান্য সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা বলে।[১৯৮] এ সময় শেখ মুজিব বলেন যে, আওয়ামী লীগ ডানপন্থী নয় বা বামপন্থীও নয়, বরং মধ্যপন্থী দল।[১৯৯] এ থেকেই বোঝা যায়, কেন আওয়ামী লীগ ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ব্যাখ্যা উপরোক্ত ধরনের ছিল। সম্ভবত এ সময় আওয়ামী লীগ অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনগুলোর প্রভাব হ্রাস করা, জনচেতনা ও শ্রমিক-ছাত্র সমাজদ্বয়ের দাবীকে ধরে রাখা এবং সেই সঙ্গে দলীয় বিত্তবান অংশ ও দলীয় বিত্তবান সমর্থকদের না-চটানোর নীতি থেকে একযোগে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ সম্পর্কে এহেন নিজস্ব ধরনের ব্যাখ্যা দিচ্ছিল। তদুপরি, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ সম্পর্কে তত্ত্বগত পঠন-পাঠন ও জ্ঞানের অভাব তো তাদের ছিলই।

১৯৬৯ সালের ১২ই অক্টোবর ঢাকায় জাতীয় শ্রমিক লীগ গঠন করা হয়। এ উপলক্ষে ইঞ্জিনীয়ার্স ইন্সটিটিউটে আয়োজিত সম্মেলনে শেখ মুজিব ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে পারেননি, কেননা তিনি তখন দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থান করছিলেন। সম্মেলনে প্রেরিত বাণীতে মুজিব বলেন, " যে দিন ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সমস্যার সমাধান হইবে সেদিনই হইবে আমার রাজনৈতিক জীবনের সার্থকতা"। শেখ মুজিব তাঁর বাণীতে আরো বলেনঃ

"অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন আমাদের দেশের সম্পদের উপর নির্ভরশীল হইয়া, দেশের মানুষের মনোভাব অনুযায়ী সামাজিক রীতিনীতির স্বীকৃতি দিয়া এবং জনসাধারণের সম্মতি নিয়া দেশের অর্থনীতি ঢালাই করিয়া সাজাইতে হইবে। রাশিয়া বা চীন হইতে সমাজতন্ত্রকে আমদানী না করিয়া বা অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকরণ না করিয়া গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া এদেশের প্রয়োজনে শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজবাদ স্থাপনের মধ্যেই এদেশের মানুষের মুক্তি নিহিত। রক্ত চক্ষুর শাসন নয়, একচেটিয়া পুঁজিবাদের শোষণ নয়, এক সুখী-সুন্দর বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী শোষণহীন সমাজ গড়িয়া তোলাই আমাদের লক্ষ্য "।[২০০]

এক সপ্তাহব্যাপী পূর্ব বাংলার উত্তরাঞ্চল সফর শেষে ঢাকায় ফিরে ১৫ই অক্টোবর সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তাঁর সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে শেখ মুজিব বলেন ঃ

"প্রদেশের প্রায় সর্বত্র দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা বিরাজ করছে। জনসাধারণের দুর্দশা চরমে পৌঁছেছে। এদিকে চালের দাম উঠেছে ষাট টাকায় আর অন্যদিকে পাট বিক্রি হচ্ছে সরকার নির্ধারিত নিম্নতম মূল্যের অনেক কমে"।[২০১]

১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে এক প্রচার পত্রে ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সভাপতি শামসুদ্দোহা ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম, ছাত্রলীগের সভাপতি তোফায়েল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক আবদুর রব, এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ইব্রাহীম খলিল ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম তাদের সংগঠনত্রয়ের তরফ থেকে তাদের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে 'সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির উচ্ছেদ' করে 'শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ভেতর দিয়ে দেশের মুক্তির দাবী ওঠান।[২০২]

এসময় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কোপন্থী)-এর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন এবং ছাত্রদের ১১ দফা- দাবীর অন্তর্ভুক্ত ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী জাতীয়করণ এবং তথায় সন্নিবেশিত শ্রমিক-কৃষকের মৌলিক দাবীর ভিত্তিতে বৃহত্তম গণ ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[২০৩] ন্যাপ (মস্কোপন্থী) এসময় 'বাংলার কৃষক শ্রমিক/জাগো জাগো' শ্লোগান তোলে।[২০৪] এসময় ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি বা অন্যান্যদের দ্বারা উত্থাপিত তথাকথিত ইসলামী সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন যে, কেবল এক ধরনের সমাজতন্ত্রই রয়েছে আর তা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। অন্য যে কোনো ধরনের সমাজতন্ত্রের দাবী জনগণের কাছে তামাশা মাত্র।[২০৫]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)-এর নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৬৮-৬৯ এ সমাজতন্ত্রের দাবী তোলেন ইতিপূর্বেকার মতো। আইয়ুবের পতনের পরপর মওলানা ভাসানীর ও কৃষক সমিতির উদযোগে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে কৃষক সমাবেশ হয়। ভাসানী এসব সমাবেশে বলেন যে, সমাজতন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই আমরা গ্রহণ করবো না।২০৬ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে আন্দোলন শুরু করার জন্যে ভাসানী এসব সমাবেশে আহবান জানান। ভাসানী শ্রমজীবী জনতার আর্থনীতিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনীতিক মুক্তির একমাত্র পথ বলে সমাজতন্ত্রকে বর্ণনা করেন।

১৯৬৮-৬৯-৭০ এ আতাউর রহমান খানের ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ লীগও অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ, পূর্ব বাংলার স্বাধিকার ও পূর্ব বাংলার স্থলে 'বাংলাদেশ' নামটির ব্যবহার, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবীর২০৭ সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার দাবী ওঠায়।২০৮

এদিকে, ১৯৭০ সালের ১১ই জানুয়ারী পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় প্রদত্ত শেখ মুজিবের বক্তৃতা সম্পর্কে খবরে বলা হয় ঃ "আওয়ামী লীগ চায় কৃষকের, শ্রমিকের রাজত্ব কায়েম করতে। তাঁর দল দেশের সকল মূল শিল্পসহ ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসা জাতীয়করণ করবে। ২৫ বিঘা পর্যন্ত চাষীর জমির কোন খাজনা থাকবে না এবং দশ বছর পর্যন্ত কৃষকের জমির খাজনা মওকুফ করা হবে"।২০৯

৩০শে জানুয়ারী ১৯৭০-এ রাজশাহীতে এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণদানকালে শেখ মুজিব সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে কতকগুলো পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঃ "আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সাফল্য লাভ করলে পাট ব্যবসা, ব্যাঙ্ক,ইন্সুরেন্স কোম্পানী ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহ জাতীয়করণ করবে। এছাড়া কৃষকেরা শিল্পপতিদের মত কর অবকাশ ভোগ করবে, ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব মওকুফ করা হবে,দশ বছর কোন ভূমি-রাজস্ব নেওয়া হবে না, তামাক ও আখের ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে এবং শ্রমিকেরা শিল্প প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ পাবে"। স্বায়ত্তশাসন, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে নির্বাচনে জয়ী হলে ৬-দফাভিত্তিক ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন ক'রে এদেশের বঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাতে তিনি সক্ষম হবেন বলে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন।২১০

১৯৭০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সন্তোষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেন। ২১১

১৯৭০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) তাদের ১১-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে। এতে পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর চেপে বসা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির শোষণ ও সামন্তবাদী শোষণের অবসান করে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান রাখা হয়। এই প্রচারপত্রে 'জাতীয়

নিপীড়ন ও শ্রেণী শোষণের কবলমুক্ত' পরিবেশে জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।২১২

১লা এপ্রিল ১৯৭০-এ নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান লাহোরে পাঞ্জাব ছাত্র লীগের এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন যে, প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বিচিত্র সমস্যা রয়েছে যেগুলোর সমাধান কেবল নিজস্ব পন্থাতেই করা সম্ভব। সমাজতন্ত্রের ধারণা মূলতঃ হচ্ছে জাতীয় সম্পদ বন্টন নিশ্চিত করার জন্যে একটা পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণা। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের আন্দোলন একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, কারণ এটা পুঁজিবাদের সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত। এই সমাজ ব্যবস্থাই মুষ্টিমেয় পরিবারের হাতে জাতীয় সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটিয়েছে।২১৩

৬ই জুন ১৯৭০-এ ঢাকার মতিঝিলস্থ হোটেল ইডেন প্রাঙ্গনে আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে "একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, জমিদারী, জায়গীরদারী, সরদারীর বিলোপ সাধন করিয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাম্যবাদী অর্থনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদায় সমুন্নত করার কল্যাণময় প্রতিশ্রুতি বিবৃত" করে আওয়ামী লীগ তার কর্মসূচী ঘোষণা করে।২১৪

আওয়ামী লীগের ১৯৭০ এর নির্বাচনকালীন ম্যানিফেষ্টোতেও দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। সমাজের পুনর্গঠন, ন্যায়নীতি ও শোষণমুক্তির জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়। একটা নতুন শাসনতান্ত্রিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক কাঠামোর প্রয়োজনের উল্লেখ করা হয় শোষণমুক্ত জীবন গঠনের স্বার্থে। আইনের চোখে সমানাধিকার ও মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, মজুরী কাঠামো পুনঃনির্ধারণ ও কৃষক-শ্রমিকের দাবী-দাওয়া পূরণ, ভারী শিল্প-কারখানা, পাট ও বস্ত্র, ব্যাঙ্ক ও বীমা, বৈদেশিক বাণিজ্যের জাতীয়করণ, প্রগতিশীল কর কাঠামো, মনোপলি ও কার্টেলের অবসান, আন্তঃআঞ্চলিক ও অঞ্চল-অভ্যন্তরস্থ বৈষম্য বিলোপ ও বন্টনে সমতা ইত্যাদি দাবী ও কর্মসূচীর ভেতর দিয়ে আওয়ামী লীগের ম্যানিফেষ্টো তাদের বিঘোষিত সমাজতন্ত্রের কথা তুলে ধরে। ম্যানিফেষ্টোতে সমাজতন্ত্রকে আওয়ামী লীগের আর্থনীতিক কর্মসূচী হিসেবে দেখিয়ে বলা হয় যে, আর্থনীতিক অন্যায় ও বঞ্চনা উচ্ছেদ এবং আর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে ন্যায্য বন্টনের ভিত্তিতে সাম্যের সমাজে পৌঁছানোর জন্যে আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে।২১৫

অতঃপর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বানের প্রাক্কালেও আওয়ামী লীগ, ভাসানী ন্যাপ, জাতীয় লীগসহ বিভিন্ন দল সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ঘোষণা করে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন গোড়াতে ৫ই অক্টোবর জাতীয় পরিষদের ও ২২শে অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের —এভাবে হওয়ার কথা ছিল। পরে বন্যা-সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ৭ই ডিসেম্বর

জাতীয় পরিষদের ও ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ স্থিরীকৃত হয়। নির্বাচনের ইতিপূর্বেকার তারিখ অনুযায়ী সরকারী ব্যবস্থাপনায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের প্রধানকে বেতার ও টেলিভিশনে বক্তৃতা দানের সুযোগ দেয়া হয়। বিভিন্ন দলের নেতারা তখন তাদের বক্তব্য ও কর্মসূচী তুলে ধরেন। এসব বক্তৃতা থেকে দেখা যায় যে, পূর্ব বাংলাভিত্তিক দলগুলোর নেতারা পূর্ব বাংলার স্বাধিকার ও সমাজতন্ত্রের দাবীকে তৎকালীন জনচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

এই বেতার-টেলিভিশন ভাষণে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং শ্রেণী ও অঞ্চলগত সীমাহীন শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যা-সঙ্কটের স্থায়ী সমাধানের জন্যে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন ঃ

> আজকে জাতীয় সঙ্কটের প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত, দ্বিতীয়ত জনগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বৈষম্যের কবলে পতিত; তৃতীয়ত অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। ....
>
> আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে এ-সব মৌলিক সমস্যা সমাধানের একটা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করা হয়েছে।.....
>
> বর্তমানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। জাতীয় শিল্প সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ মাত্র দু'ডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যাঙ্কিং সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ আজ মাত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশে যে কর প্রথা কায়েম রয়েছে তা বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাদমুখী ব্যবস্থা। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬-ভাগ আদায় করা হয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশে করের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ অর্থ আদায় হয়। অপর পক্ষে লবণের মত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উপরেও নিপীড়নমূলক পরোক্ষ কর বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, ট্যাক্স হলিডে, বোনাস ভাউচারের মাধ্যমে সাবসিডি প্রদান এবং ক্রমিকভাবে নিম্নহারে বিদেশী মুদ্রার ঋণ ও অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি ব্যবস্থা একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথা সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে।
>
> ছিটে-ফোঁটা ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও সামন্ত প্রভুরা রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী রয়েছে। তারা সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। তাদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় মানুষের দিন দিন অবনতি ঘটছে।

কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার দ্রুত ব্যয় বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প শ্রমিক ও মেহনতি সম্প্রদায়ের উপর। মুদ্রা মজুরী যা বেড়েছে তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যয় বৃদ্ধির চাপ স্কুল কলেজের শিক্ষক, স্বল্প বেতনভুক কর্মচারী, বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে গত ২২ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র ১৫ শ' কোটি টাকার মত (মোট ব্যয়ের এক পঞ্চমাংশ মাত্র)বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে সাত হাজার কোটি টাকারও বেশী। দেশের সর্বমোট উৎপাদন ব্যয় খাতে বাংলাদেশে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশী। গত ২২ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র ১৩ শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিনগুণ বেশী বিদেশী দ্রব্য আমদানী করা হয়েছে। নিজস্ব বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি দু'হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী দ্রব্য আমদানী করতে পেরেছে। তার কারণ বাংলাদেশে অর্জিত পাঁচশো কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করেছে। তার উপরও সর্বপ্রকার বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান ব্যবহার করেছে।

সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রেও পরিসংখ্যান একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার ২২ বছর গত হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে বাঙালির সংখ্যা আজও শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ। দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙালির সংখ্যা শতকরা দশভাগেরও কম। সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রকট বৈষম্যের ফলে বাঙালির অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে। বাংলার বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষজনিত-অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণকে শুধুমাত্র অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হচ্ছে। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে, তার শিকারে পরিণত হয়ে চলেছে বাংলার অসহায় মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশী। পশ্চিম পাকিস্তানে যেক্ষেত্রে প্রতিমণ মোটা চাউলের দাম ২০ টাকা থেকে ২৫ টাকা, সে-ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সে-চাউলের দাম পড়ে ৪৫

থেকে ৫০ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১৫ থেকে ২০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি সের তেলের দাম আড়াই টাকা, কিন্তু বাংলাদেশে সরিষার তেলের দাম পাঁচ টাকা। করাচীতে যে সোনার দাম প্রতি ভরি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, ঢাকায় সে সোনার মূল্য ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকা। তারপরেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে সোনা আনার ব্যাপারে কাস্টমসের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গত বাইশ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে তুলেছেন, এসব অবিচার তারই পুঞ্জীভূত ফলশ্রুতি। এ-অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এ-সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনায়। ......

আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী, যে কর্মসূচী ১১ দফা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সে কর্মসূচী আঞ্চলিক অন্যায়-অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে। .... আমাদের বিশ্বাস, শাসনতান্ত্রিক এ কাঠামোর মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব আনা সম্ভব। অন্যায় অবিচার ও শোষণ-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও গড়ে তোলা সম্ভব হবে। .....অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম অংশ নিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবশ্যই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয়করণের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীসহ অর্থনৈতিক মূল চাবিকাঠিগুলিকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থনৈতিক এসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হতে হবে সরকারী অর্থাৎ জনগণের মালিকানায়। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। বেসরকারী পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করতে হবে। [২১৬]

শেখ মুজিবের এই ভাষণ থেকে লক্ষণীয় ১৯৭০-পর্যায়ে তিনি পূর্ব বাংলা প্রসঙ্গে যেকোনো উল্লেখের ক্ষেত্রে 'পূর্ব পাকিস্তান' কথাটি ব্যবহারতো করছেনই না, এমনকি তিনি 'পূর্ব বাংলা' শব্দটিও ব্যবহার না করে সরাসরি 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তৎকালীন বাংলাদেশের চেতনায় পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্নতা সর্ব অর্থেই ঘটে গিয়েছিল এবং মুজিবের বক্তৃতায় কেবল এর প্রতিফলন ঘটেছিল। শেখ মুজিব উল্লিখিত এই বাংলাদেশেই শোষণমুক্ত সমাজ হিসেবে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

নির্বাচন-পূর্ব মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৫ই নভেম্বর ১৯৭০-এর বেতার ও টেলিভিশন ভাষণেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষিত হয় ঃ

"আগামী সাধারণ নির্বাচনের একমাত্র উদ্দেশ্যঃ..... একটি শোষণমুক্ত সমাজ কায়েমের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর প্রগতিশীল শাসনতন্ত্র রচনা করা। ..... আমি আশা করি আগামী শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক-পূর্ণআঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা যথাযথরূপে গৃহীত হবে। তৎসঙ্গে শতকরা ৮৫ জন কৃষক ও ১০ জন শ্রমিক— ৯৫ জন নিপীড়িত নির্যাতিত অভুক্ত অনাহার-ক্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য সংখ্যানুপাতে আইন সভার আসন সংখ্যা নির্ধারিত হবে। .....

.....একমাত্র সমাজতন্ত্র ছাড়া পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষ, নিপীড়িত মানুষ, মজলুম মানুষের সামাজিক মুক্তি, আর্থিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি কোন কালেই আনা সম্ভবপর হবে না। ইহা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।"[২১৭]

নির্বাচন-পূর্ব বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে ন্যাশনাল লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খানও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন যে, তাঁর দলের "আদর্শ হচ্ছে, রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমন্বয়ে" একটি সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করা। তিনি আরো বলেনঃ "আমাদের দল এও বিশ্বাস করে যে, গোটা সমাজজীবনে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি শাসন ব্যবস্থা যাতে একদিকে থাকবে প্রয়োজনীয় সকল রাজনৈতিক অধিকারের সুযোগ, অপরদিকে থাকবে আপামর মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। .... "আন্তর্জাতিক রাজনীতির পটভূমিকায় দেশের অবস্থার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পর আমার দল প্রখ্যাত ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কির সঙ্গে একমত পোষণ করে যে, গণতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্য সমাজতন্ত্র অপরিহার্য"। আতাউর রহমান খান আরো বলেন যে, "অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন।" তিনি আরো বলেনঃ "আমরা ঘোষণা করেছি যে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়সাধন শুধু সম্ভবই নয়।-একান্তভাবে অপরিহার্য "। তিনি বলেন যে, "শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক কাঠামো সৃষ্টির কাজে আমার দল নিবেদিত....."। [২১৮]

ওপরে উল্লিখিত মুজিব, ভাসানী ও আতাউর রহমানের বক্তৃতাগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭০ সালের দিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজনীতিক দল ও নেতৃবৃন্দের ভেতর মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

২৩শে নভেম্বর ১৯৭০-এ পল্টন ময়দানে এক সভায় মওলানা ভাসানী বলেন যে, "আদমজী ইস্পাহানীর মিল-কারখানা পোড়াব না। কারণ এগুলি জনগণের সম্পদ। আমরা আল্লাহর নামে এইসব সম্পদ জাতীয়করণ করব"।[২১৯]

এদিকে এসবের পূর্বে ১৯৭০ সালের আগষ্ট মাসে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় স্বপন কুমার চৌধুরী "স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাঙলাদেশ" প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, সেটা ৫৫-৭ ভোটে পাস হয়।[২২০]

২রা অক্টোবর ১৯৭০-এ পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন তাদের এক প্রচারপত্রে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাত করে পূর্ব বাংলার বুকে শোষণহীন এক নতুন রাষ্ট্র জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।২২১

এদিকে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসের একমাত্র সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনীতিক দল-সংগঠন তাদের রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও আদর্শগত কর্মসূচী নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই নির্বাচনের ফলাফল ও ভোট প্রদানের মাত্রা থেকে সে সময় পূর্ব বাংলায় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও শোষণহীন আর্থনীতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতি ব্যাপক গণচেতনা ও কার্যকর সমর্থনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় ম্যানিফেস্টো, কর্মসূচী ও প্রচারণায় সরাসরি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা উচ্চারণকারী দল-সংগঠন ও প্রার্থীদেরকে ভোটারগণ মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭৪.৭০ ভাগ ভোট দেয়। এর মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে কেবল আওয়ামী লীগই পায় শতকরা ৭২.৫৭ ভাগ ভোট। ওদিকে সমাজতন্ত্র বিরোধী সাম্প্রদায়িক দলগুলোর প্রার্থীদের প্রায় সবারই নির্বাচনী জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। আবার, সমাজতন্ত্রের মতাদর্শের ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জন্যে জাতীয় পরিষদে নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের ভেতর ১৬৭টিতে জয়লাভ করে প্রতিনিধিত্ব পায়। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন (৩০০টির ভেতর ২৮৮টি) ও বিপুল হারে ভোট (মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৮৯ ভাগ) পায়।২২২

৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০-এ অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পর ৯ই ডিসেম্বর শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে বলেন যে, 'জনগণেরই জয় হয়েছে'। তিনি আরো বলেন যে, নির্বাচন ছিল ছয় দফা ও এগার দফার ভিত্তিতে গণভোট।২২৩

১২ই ডিসেম্বর ১৯৭০-এ ন্যাপের মোজাফফর আহমদ ও আলতাফ হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন যে এগার দফা ও নির্বাচনে প্রদত্ত ওয়াদাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ থেকে মুক্তিলাভের আশা নিয়ে এই নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে।২২৪

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭০-এ রিক্যুইজিশনপন্থী পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, জনগণের স্বার্থে গণতান্ত্রিক শাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং জনগণের মুক্তি আন্দোলন তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তান রিক্যুইজিশনপন্থী ন্যাপের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।২২৫ এখানে উল্লেখ্য যে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নতা ও পূর্ববাংলার দৃষ্টিভঙ্গীগত চূড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যের কারণে এতদঞ্চলের

স্বাধিকার –স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার কারণে সেই সময় (১৯৭০–৭১ সালে) কেন্দ্রীয় সংগঠন ওয়ালী ন্যাপের সঙ্গে মোজাফফর ও আলতাফ নেতৃত্বাধীন অংশের একত্রিত থাকা কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না।

২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭০–এ ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন,'নির্বাচনে জনসাধারণ ১১ দফাভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের পক্ষে সুস্পষ্ট ম্যান্ডেট প্রদান করেছে'।[২২৬]

১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী শপথ দিবস পালন করতে গিয়ে তৎকালীন রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসভায় আওয়ামী লীগ দলীয় নির্বাচিত সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। ছয় দফা ও এগার দফা এবং শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তারা উচ্চারণ করেন যেঃ

"আমরা—জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় নবনির্বাচিত সদস্যবৃন্দ—শপথ গ্রহণ করছি পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার নামে,আমরা শপথ গ্রহণ করছি সেই সব বীর শহীদের ও সংগ্রামী মানুষের নামে যারা আত্মহুতি দিয়ে চরম নির্যাতন–নিপীড়ন ভোগ করে আজ আমাদের প্রাথমিক বিজয়ের সূচনা করেছেন; আমরা শপথ গ্রহণ করছি এই দেশের কৃষক, শ্রমিক,ছাত্র, মেহনতী মানুষ তথা সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের নামেঃ জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এই দেশের আপামর জনসাধারণ আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ও নেতৃত্বের প্রতি যে বিপুল সমর্থন ও অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করেছেন তার মর্যাদা রক্ষাকল্পে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।

ছয় দফা ও এগার দফা কর্মসূচীর উপর প্রদত্ত গণরায়ের প্রতি আমরা একনিষ্ঠভাবে বিশ্বস্ত থাকবো এবং শাসনতন্ত্রে ও বাস্তব প্রয়োগে ছয় দফা কর্মসূচীভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও এগারো দফা কর্মসূচীর প্রতিফলন ঘটাতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবো; আওয়ামী লীগের নীতি, আর্দশ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রতি অবিচল আনুগত্য জ্ঞাপনপূর্বক আমরা অঙ্গীকার করছি যে, অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে বিরাজমান চরম রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটিয়ে শোষণমুক্ত এক সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়ার এবং অন্যান্য অবিচার বিদূরিত করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো, জনগণ অনুমোদিত আমাদের কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসী যে কোন মহল ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলবো এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কোন রূপ ত্যাগ স্বীকারকরতঃ আপোষহীন সংগ্রামের জন্যে আমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকবো।[২২৭]

৩রা জানুয়ারী ১৯৭১-এর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেন যে, ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ১১-দফা কর্মসূচীতে যেসব দাবী-দাওয়া রয়েছে সেগুলিও বাস্তবায়িত করা হবে। তিনি বলেন, ৬ দফা ও১১ দফা কর্মসূচী আওয়ামী লীগের সম্পত্তি নয় এবং কর্মসূচীগুলি পরিবর্তনের কিংবা এগুলো থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোন অধিকার আওয়ামী লীগের নেই। মুজিব ঘোষণা দেন যে, আওয়ামী লীগ দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করবে।[২২৮]

১০ই জানুয়ারী ১৯৭১-এ পল্টন ময়দানে এক জনসভায় মওলানা ভাসানী বলেন যেঃ

'মরে যাবো, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো, তবু আমরা পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি মানুষ গোলামের মত থাকবো না। শুধু পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই নয়, সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমানভাবে সম্পদ বন্টন করে যাবো—বাঙালিদের জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলবো। প্রয়োজন হলে লবণ দিয়ে ভাত খাব, তবু আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ আর আদমজী ইস্পাহানী-বাওয়ানী-সায়গল-দাউদ প্রমুখ একচেটিয়া শোষকদের গোলাম হয়ে থাকবো না। ......'[২২৯]

১৫ই জানুয়ারী ১৯৭১-এ পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ২০শে জানুয়ারী শহীদ আসাদ দিবস পালন উপলক্ষে সংগঠন প্রদত্ত এক প্রচারপত্রে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির শোষণমুক্ত এক স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা (যা ছিল তাদের ভাষায় আসাদের স্বপ্ন) বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।[২৩১]

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১-এ সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে মওলানা ভাসানী পুনরায় পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও কৃষক-মজুর রাজ কায়েমের সংগ্রাম চালিয়ে যাবার কথা ঘোষণা করেন।[২৩১]

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১-এ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক প্রচারপত্রে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী জনতার বিপ্লবী সরকার গঠন ও চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে শোষণহীন সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহ্বান রাখা হয়।[২৩২]

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১-এ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের তরফ থেকে এক প্রচারপত্রে পুনরায় স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের ডাক দেয়া হয়।[২৩৩]

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১-এ কমিউনিষ্ট পার্টি (মনি সিংহ) তাদের এক রাজনীতিক প্রস্তাবে বলেঃ "পরিশেষে আমাদের অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, এই সংগ্রামে স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া আমাদের প্রচেষ্টা হইবে এই সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির তথা দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা"।[২৩৪]

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১-এ ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ন্যাশনাল আওয়ামী

পার্টির এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পত্রিকায় বলা হয়ঃ নির্বাচনী রায় বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মহলের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে সভায় বক্তাগণ বলেন যে, দেশের জনসাধারণ ৬–দফা ও ১১ দফার সপক্ষে তাদের রায় দিয়েছেন। [২৩৫]

২৮-শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১–এ ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতি আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেন। খবরে বলা হয়ঃ

"ছয় দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতেই সংবিধান রচনায় তিনি তাঁর দৃঢ় অভিমতের কথা পুনরায় উল্লেখ করেন। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে এ ব্যাপারে কেউই আমাদের বাধা দিতে বা বিরত রাখতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন, আমরা মরবো কিন্তু আর নতি স্বীকার করবো না। ....

ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীসমূহের জাতীয়করণ সম্পর্কিত তাঁর পূর্ববর্তী ঘোষণার পুনরুল্লেখ করে শেখ মুজিব বলেন যে, তাঁরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তবে তা অর্জন করতে হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে—বিপ্লবের মাধ্যমে নয় বলে তিনি অভিমত দেন। তিনি মন্তব্য করেন, সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকার ৭ কোটি লোক কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না"।[২৩৬]

১লা মার্চ ১৯৭১–এ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা সংক্রান্ত প্রচারের পরপরই 'বিক্ষুব্ধ জনতা বাধভাঙা জলরাশির ন্যায়' রাস্তায় বেরিয়ে আসে এ সময় 'শোষণমুক্ত বাঙলাদেশ গঠনের জন্য রাস্তায় বড় বড় হরফে বহু শ্লোগান লেখা হয়'। [২৩৭]

১লা মার্চ ইয়াহিয়া কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করার পরপরই স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ–এর উদ্যোগে রচিত ও প্রচারিত 'ইশতেহার নং/এক. জয় বাংলা—স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী'তে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে যে তিনটি লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয় তাদের অন্যতমটি ছিলঃ"স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে"।[২৩৮]

৬ই মার্চ ১৯৭১–এ তৎকালীন পূর্ব বাংলার লেখক শিল্পীবৃন্দ 'স্বাধীন সার্বভৌম শোষণমুক্ত বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার রক্ত সংগ্রাম চূড়ান্ত লক্ষ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।[২৩৯] তারা জনগণের ওই সংগ্রামকে 'শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি বাঙলায় 'বলে অভিহিত করেন। [২৪০]

৬ই মার্চ ১৯৭১–এ বাঙলা জাতীয় লীগের উদ্যোগে অলি আহাদের সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানে যে সভা হয় সেই সভায়ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়। পত্রিকার খবরে বলা হয়ঃ "পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবুর

রহমান ও জাতীয় পরিষদের প্রতি অবিলম্বে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ঘোষণার দাবী জানানো হয়"।২৪১

৭ই মার্চ ১৯৭১–এ কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি এক প্রচারপত্রে 'কৃষক,শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা সমগ্র জনতার মুক্তি'র জন্যে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে 'জনতার স্বাধীন পূর্ব বাংলা' কায়েমের ডাক দেন। ২৪২

৮ই মার্চ ১৯৭১–এ ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্টস্ ব্লক এক প্রচারপত্রে স্বাধীন শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের জন্যে চূড়ান্ত লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানায়। তাদের প্রচারপত্রে বলা হয়ঃ

"পরিশেষে বাংলার সাড়ে সাতকোটি জাগ্রত স্বাধীনতাকামী ভাইবোনদের নিকট আমাদের আকুল আবেদন টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত বাঙলার প্রতিটি ঘরে ঘরে মাতৃভূমি বাঙলাকে স্বাধীন করার যে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা গর্জে উঠেছে তাকে যে কোন মূল্যে বাঁচিয়ে রেখে "সমাজতান্ত্রিক বাঙলাদেশ" গঠন করতে হবেই। এই প্রেক্ষিতে সর্বস্তরে "বাঙলা মুক্তিফ্রন্ট" (**Bengal Liberation Front**) গঠন করুন, গ্রামে–গ্রামে,নগরে–নগরে, ফৌজ গড়ে তুলুন আর স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলুন। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী" ২৪৩

৯ই মার্চ ১৯৭১–এ মওলানা ভাসানী স্বাক্ষরিত এক প্রচারপত্রে জাতীয় মুক্তি,স্বাধীনতা ও শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করার আহবান জানানো হয়। ২৪৪

এদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ৯ই মার্চ ১৯৭১–এ এক আহবানে বলেনঃ 'কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশে এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানাইতেছে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ–সামন্তবাদ উৎখাত করিয়া ও পুঁজিবাদী বিকাশের পথ পরিহার করিয়া জনগণের স্বার্থে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবার বিপ্লবী পথ উন্মুক্ত হইতে পারে"।২৪৫

৯ই মার্চ তারিখেই পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী–লেনিনবাদী) এক প্রচার স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা এবং শোষণমুক্ত শ্রমিক কৃষক রাজ গঠনের জন্যে সশস্ত্র বিপ্লব ও গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করার আহ্বান জানান।২৪৬

১১ই মার্চ ছাত্র ইউনিয়ন এক প্রচারপত্রে শোষণমুক্ত স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। ২৪৭

বস্তুতঃ ওপরের আলোচনা থেকে–দেখা যায়, একাত্তরের দিকে সমাজতন্ত্রের চেতনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন এমনভাবে একাকার হয়ে গিয়েছিল যে এ দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করার সাহস সত্তরের নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয় লাভের গৌরব অর্জনকারী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবেরও হয়নি। অন্যথায় তাঁকে নেতৃত্ব হারাতে হত।

১৯৭১–সালের মার্চ মাসের ৭ তারিখে তৎকালীন পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ও স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শেখ মুজিবকে চূড়ান্ত হুমকি দেয় যে, তাঁকে অবশ্যই স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে, নচেৎ তারা তাঁকে পরিত্যাগ করবেন এবং স্বাধীন পথ অবলম্বন করবেন।[২৪৮] এ পর্যায়ে মুজিব ফরাসী সংবাদদাতার কাছে প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন যেঃ"পশ্চিম পাকিস্তান সরকার কি অবগত নন যে, আমিই কেবল পূর্ব পাকিস্তানকে কমিউনিজমের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি? তারা যদি লড়াইয়ের অবস্থান নেয় তাহলে আমাকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে এবং নক্সালীরা (অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা বাম ও কমিউনিস্টরা–বর্তমান গবেষক) আমার নামে কর্তৃত্ব নিয়ে নেবে। যদি আমি খুব বেশী ছাড় দিই, তাহলে আমি আমার কর্তৃত্ব হারাবো। আমি খুব খারাপ অবস্থায় আছি"।[২৪৯]

১৯৭১ এর মার্চে শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার ভেতরকার আলোচনায় মুজিবের পক্ষে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী রেহমান সোবহান লিখেছেনঃ

আওয়ামী লীগ "দলের ছাত্র ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী অংশের ভেতর নিশ্চিতভাবে ছিল এ ধরনের প্রবণতা। ছাত্রলীগের সুনিশ্চিতভাবে ছিল একটা শক্তিশালী ও প্রাধান্যশীল গ্রুপ, যারা নিজেদেরকে সমাজতন্ত্রী হিসেবে গড়ে তুলেছিল এবং এমনকি মার্কসীয় দৃষ্টিও গ্রহণ করেছিল। এই বিপ্লবী গ্রুপটি দলের বর্ধাফলক গঠন করে এবং দলকে জঙ্গী তীক্ষ্মতা এনে দেয়। এই গ্রুপ ইতিমধ্যে শ্রমিক আন্দোলনে স্থান করে নিয়েছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে মূল দলে তারা জঙ্গী শ্রমিক উপাদান গড়ে তুলেছিল। এভাবে দলে ছাত্র সংগঠনের জঙ্গীত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। এই গ্রুপের সঙ্গে শেখ মুজিবের একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ট দ্বিপক্ষীয় সংযোগ ছিল। মুজিব জানতেন যে, সামরিক বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে ছাত্র ও শ্রমিকরাই আবার গণআন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবে ও টিকিয়ে রাখবে। শেখ মুজিব কর্তৃক সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আপোষহীন অবস্থান গ্রহণ ও খোলাখুলি বিপ্লবী পরিপ্রেক্ষিতকে সমর্থ দান দলের ভেতরকার এই উল্লেখযোগ্য অংশের প্রকৃত চাপের মুখেই সম্ভব হয়েছিল"।[২৫০]

১১

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সমাজতন্ত্রের ঐকমত্য সম্পর্কে কিছু নমুনা

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত হয় "রক্তাক্ত বাংলা" নামক একটা প্রবন্ধ-রচনা সংগ্রহ।[২৫১] এতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন লেখক-বুদ্ধিজীবী-অর্থনীতিবিদ-সাংবাদিক নিজেদের সেসময়কার বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করেছেন। বিভিন্ন অবস্থান ও পেশার প্রতিনিধিত্বকারী এদের রচনাসমূহ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭১-এর পর্যায়ে এসে বাংলাদেশ ও বাঙালীরা তাদের ২৪ বছরের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক কাঠামো থেকে মুক্তিলাভের জন্য, শ্রেণী ও অঞ্চলগত শোষণের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও নয়া সমাজ গঠনের লক্ষ্যরূপে সমাজতন্ত্রকে একমাত্র সমাধান হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ যে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে শোষণমুক্তির জন্য সংঘটিত হয়েছিল, সে সত্য তৎকালের উল্লিখিত রচনাবলীতে অত্যন্ত স্পষ্ট। সমাজতন্ত্র তখন বাঙালি জনমণ্ডলীর জাতীয় ঐকমত্য হয়ে উঠেছে।

সাংবাদিক-লেখক রণেশ দাশ গুপ্ত ওই গ্রন্থে "পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের গতি প্রকৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন যে, "পর্যায়ের পর পর্যায়ে অধিকতর ক্রুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ ঔপনিবেশিকতাবাদী পাকিস্তানী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম জনগণের গভীরতম স্তরগুলি থেকে নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে এবং নতুনতর চেতনা নিয়ে সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছে বলেই নেতৃত্বের বৈপ্লবিক সম্প্রসারণ অনিবার্য ঐতিহাসিক সত্য। গণতন্ত্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে সমাজতন্ত্রের দাবী"।[২৫২]

বিশিষ্ট অভিনেতা, প্রযোজক ও নাট্যকার রামেন্দু মজুমদার "বাংলাদেশ স্বীকৃতি চায়" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন যে, "বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম।

অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করলে বর্তমান সংগ্রাম–যে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ তাতে কোন দ্বিধা থাকবার কথা নয়। বর্তমান সংগ্রামের মূলে রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীদের বাংলাদেশ–শোষণ।

বর্তমান মুক্তিআন্দোলনের নায়ক বাংলাদেশের বীর জনতা। ইয়াহিয়ার বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের সংগঠিত করেছেন। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত বাংলার মানুষের সামাজিক মুক্তি না আসবে, ততদিন পর্যন্ত এ আন্দোলনের শেষ নেই। এ আন্দোলন বাংলাদেশকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেখানেই বাংলার মানুষের যথার্থ মুক্তি"।[২৫৩]

গল্পকার ও শিশু সাহিত্যিক এবং ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের (এখন ইন্সটিটিউট) সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক বুলবন ওসমান "বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেনঃ

> "এ–দিকে সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন ব্যয় ন্যূন হওয়ায় সমগ্র কাঠামোর বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ জনসাধারণের মনে দানা বেঁধে ওঠে। যার ফলে একদিকে আঞ্চলিক শোষণরোধ ও অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক পরিকল্পনা গ্রহণ বাংলাদেশের একমাত্র বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক যে–কারণে আওয়ামী লীগ বিপুল জন–সমর্থন লাভ করে। একদিকে ছয় দফাভিত্তিক আঞ্চলিক শোষণ বন্ধ করা, অন্যদিকে পূর্বের সম্পদ পশ্চিমে না যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ। মনোপলি ও কার্টেল পদ্ধতির বিলোপ সাধন এবং অর্থনীতির মূল ভাগগুলোর জাতীয়করণ। এইভাবে বাংলাদেশের আর্থনীতিক বদ্ধতা কাটানোর পরিকল্পণা গ্রহণ করা হয়"।[২৫৪]

ওই একই প্রবন্ধে বুলবন ওসমান আরো বলেনঃ

> "আমাদের বর্তমান আন্দোলন জাতীয় মুক্তির আন্দোলন হলেও অদূর ভবিষ্যতে তার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। আওয়ামী লীগও তার ম্যানিফেস্টোতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। ব্যাঙ্ক–বীমা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণের মাধ্যমে, ঠিক যে–কারণে বা যে– ভয়ে পাকিস্তানের শাসক–শোষকগোষ্ঠী বাঙালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের আসল ভয় বাঙালিকে নয়, সমাজতন্ত্রকে এবং বাঙালিরা সে রাস্তায় অনেকটা এগিয়ে গেছে– তাই বাঙালিদের উপর হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ইয়াহিয়া–ভুট্টো চক্র। এটার আরো প্রমাণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই আজো পাকিস্তানকে সামরিক দিক দিয়ে প্রত্যক্ষ সাহায্য করছে। আমাদের আজকের স্বাধীনতা সংগ্রাম আগামী সমাজতন্ত্রী সংগ্রামের একটি ধাপ"[২৫৫]

তৎকালে পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্সের সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতিবিদ মতিলাল পাল তাঁর "বাঙলাদেশঃ অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেনঃ

"অর্থনৈতিক চেতনা আজকের সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। এই চেতনার পরিপক্কতা কি আমরা দেখতে পাব না স্বাধীন বাংলার অর্থনীতিতে? আয়-বন্টনে শ্রেণীগত বৈষম্যের কথা অস্বীকার করা যায় না বাংলাদেশে। আঞ্চলিক বৈষম্যের ব্যাপকতার ভারে চাপা পড়েছিল তা, বাংলার প্রতিটি শ্রেণীই পরস্পরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে শোষণ-মুক্তির সংগ্রামে। বৈষম্যের ফলে, শোষণের ফলে আজকের সংগ্রামের জন্ম। শুধুমাত্র এ শোষকদের, লুণ্ঠনকারীদের তাড়িয়ে দিলেই এর শেষ নয়। শ্রেণীগত পার্থক্য ভুলে সর্বস্তরের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে- সংগ্রামে, বৈষম্য আর শোষণের মূল-উৎপাটন করে তবেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে সে সংগ্রাম"। ২৫৬

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর থেকে শ্রাবণ ১৩৭৮-এ প্রকাশিত "জাগ্রত বাংলাদেশ" নামক তাঁর গ্রন্থে আহমদ ছফাও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে বাংলাদেশের মুক্তির লক্ষ্য যে স্বাধীন দেশে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, তা জানিয়েছেন। ছফার ভাষায়ঃ

"বাংলাদেশের অন্তরে যে অতলান্ত মুক্তি-পিপাসা সঞ্চিত হয়েছে, তার লক্ষ্য একটি স্বাধীন, মুক্ত, শোষণহীন সমাজ। একটি উজ্জ্বল সভ্যতা। এই সেনানীদের (মুক্তিযোদ্ধাদের—বর্তমান গবেষক) কামান- বন্দুকের নলে নলে প্রতিদিন সে গন্তব্যের সুন্দর ইশারাটি রূপ ধরে মুকুলিত হচ্ছে। পূর্ণ স্বাধীনতা আদায় না করা পর্যন্ত, একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কন্টক না করা পর্যন্ত, শেষ হানাদার সৈন্যটিকে হত্যা না করা পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলবে। স্বাধীন সংগ্রামী বাংলার জয় সুনিশ্চিত"। ২৫৭

১২

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রবাসী সরকারের দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারও সমাজতন্ত্রকে বাংলাদেশের জনগণের অন্যতম মৌল ঐকমত্য হিসেবে ঘোষণা করে। স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে একে গ্রহণ করেছে বলে জানায়। প্রবাসী সরকার আরো জানায় যে, শ্রেণী ও আঞ্চলিক শোষণসহ যাবতীয় শোষণ–বঞ্চনা, অনাচার–অবিচার ও অসাম্য দূর করার জন্যে দেশ শত্রুমুক্ত হবার পর সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১–এ বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইস–লাম জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে 'বাংলাদেশ সরকারের মৌলিক নীতি' শীর্ষক অংশে বলেনঃ "স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনে আমার সরকারের মৌলিক নীতি ইতি–পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের সুখী সমৃদ্ধিশালী বাংলা গঠন করতে হবে।

...আমার সরকারের তরফ থেকে আমি বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। আমরা এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করব, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনী–দরিদ্রের ব্যবধান দূর হবে—যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিটি কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত মানুষ তার জীবন ধারণের পরিপূর্ণ সুযোগ পাবে"।[২৫৮]

৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১–এ জাতির উদ্দেশ্য 'আসুন সোনার বাংলা গড়ে তুলি শীর্ষক এক ভাষণে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেনঃ

"সকল প্রগতিশীল জাতির কাছেই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় অভিনন্দিত হবে। এই নতুন রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জোট নিরপেক্ষতা এবং

সকল ধরনের সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরোধী। এই রাষ্ট্র গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক জীবন পরিচালনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।[২৫৯]

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ 'স্বাধীনতার সূর্যোদয়ে' শীর্ষক বেতার ভাষণে বলেনঃ

"শুধু পুনঃনির্মাণ নয়—নতুন সমাজ গঠনের দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। সংগ্রামের কালে সমগ্র জাতির যে-ঐক্য ও আত্মত্যাগের পরিচয় আমরা দিয়েছি, সেই ঐক্য ও ত্যাগের মনোভাব অটুট রাখতে হবে। তবেই গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের ভিত্তি দৃঢ় হবে। সেই নতুন আলোর পথে আজ আমরা যাত্রা করলাম"।[২৬০]

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রী এম. মনসুর আলী "নতুন শপথ" শীর্ষক এক বেতার ভাষণে বলেনঃ

"স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো হবে সমাজতান্ত্রিক। এ কাঠামোর ভিত্তিতে আমরা গড়ে তুলব এমন এক সুখী-সমৃদ্ধ দেশ যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। যেখানে শ্রমিক পাবে তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য, কৃষক পাবে তার ফসলের ন্যায্য অধিকার। অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রাচীর রুদ্ধ করবে না মানুষের দক্ষতা এবং প্রতিভা বিকাশের পথ। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যেমন প্রতিটি পরিবারের দান রয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে যেমনিভাবে প্রত্যেকটি সক্ষম নাগরিককে অংশ নিতে হবে, তেমনি বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির ফসলেও সবার থাকবে সমান অধিকার। এক শ্রেণীকে শোষণ করে আরেক শ্রেণী ফেঁপে উঠবে এমন অর্থনৈতিক অনাচার বাংলাদেশের মাটিতে বরদাস্ত করা হবে না"।[২৬১]

২৩শে নভেম্বর ১৯৭১-এ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে লিখিত এক চিঠিতে নতুন বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। বলা হয় ঃ

"আমরা এখানে দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরছি যে আমরা আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শকে, যেখানে কুল, ধর্ম, নারী-পুরুষ ও ঐতিহ্য নির্বিশেষে কারো ব্যাপারে কোনো ভেদাভেদ করা হবে না।"[২৬২]

এদিকে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বাংলাদেশ সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়ঃ

"আমরা বিশ্বের সকল স্বাধীনতাকামী ও শান্তিপ্রিয় সরকারের কাছে সনির্বন্ধ আহ্বান জানাচ্ছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে, যাতে করে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শকে উর্দ্ধে তুলে ধরা সম্ভব হয়।"[২৬৩]

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রবাসী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশের 'উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য' শিরোনামে যে প্রচারপত্র প্রকাশিত হয়, তাতে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কিত অংশে বলা হয় ঃ "বাংলাদেশের নয়া জাতির অর্থনীতি হবে একটি সমাজতান্ত্রিক ধরনের অর্থনীতি"। [২৬৪]

১৩

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন সংগঠনের দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র

১৯৭১ সালের ২৯শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি "শত্রু বাহিনীকে মোকাবেলায় প্রস্তুত হউন গণস্বার্থে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন" শীর্ষক প্রচারপত্রে বলেনঃ

"ঐক্যবদ্ধ গণশক্তি ও জনতার সংগ্রামের জোরে গণ দুশমনদের ও উহাদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া এখানে জনগণের দাবী মতে 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অগ্রসর করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু স্বাধীন বাংলা যাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের ডলারের শৃংখলে বাধা না পড়ে, স্বাধীন বাংলার কৃষক সমাজের উপর যাহাতে জোতদার–মহাজনদের শোষণ না থাকে, স্বাধীন বাংলায় যাহাতে শ্রমিক ও জনসাধারণকে পুনরায় পুঁজিপতিদের শোষণ ও নিপীড়নে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিতে না হয়, সেজন্যও সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে আগাইয়া লওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক–কৃষক–ছাত্র–মধ্যবিত্ত জনতাকে তাহাদের সংগ্রাম আগাইয়া লওয়ার আহবান জানাইতেছে।

কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশে এমন একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহবান জানাইতেছে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ–সামন্তবাদ উৎখাত করিয়া ও পুঁজিবাদী বিকাশের পথ পরিহার করিয়া জনগণের স্বার্থে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবার বিপ্লবী পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।"[২৬৫]

৫ই মে ১৯৭১ তারিখে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী "পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতি মওলানা ভাসানীর আবেদন" শীর্ষক এক প্রচারপত্রে বলেনঃ

"....যে জনযুদ্ধ শুরু হইয়াছে তাহা শুধু বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম নহে। ইহা

পশ্চিম পাকিস্তানী কুটিল সামন্ত প্রভু, শোষক শিল্পপতি অত্যাচারী সমরদানব ও ষড়যন্ত্রকারী আমলাদিগের শোষণ শাসন অত্যাচার অবিচার হইতে নিপীড়িত নির্যাতিত শ্রমিক কৃষক জেলে তাঁতী প্রভৃতি শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামও বটে। অতএব গত ২৩ বৎসরের শোষণ-শাসনের ফলে বাঙালিদিগের সর্বশ্রেণীর মানুষের যে চরম দুর্দশা দেখা দিয়াছে এইবার ধ্বংস না করিয়া পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর পৈশাচিক কবল হইতে মুক্তি না পাইলে বাঙালিদিগের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই প্রতিজ্ঞা করুন যত জীবন যত কোরবানী করিতে হয় করিব, যুদ্ধ যত কঠিন যত দীর্ঘস্থায়ী হয় হউক সবকিছুর বিনিময়ে শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ গড়িয়া তুলিব"।[২৬৬]

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভাসানী নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, দেবেন শিকদার নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়ার), পূর্ব বাংলা কৃষক সমিতি, পূর্ববাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন (পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন) এবং পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি রাজনীতিক ও গণ সংগঠনের প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে "বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি" গঠন করেন। এই কমিটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১লা জুন ১৯৭১-এ যে ঘোষণা বাংলাদেশের জনগণের সামনে উপস্থিত করে, তাতে বলা হয় ঃ

> এই সমন্বয় কমিটির চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল বাংলাদেশকে হানাদার দস্যুদের হাত হইতে মুক্তি করিয়া বাংলার বুকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী একটি স্বাধীন, সুখী সুন্দর গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইহা হইবে এমনই একটি সমাজ ব্যবস্থা যেখানে যুগ যুগ ধরিয়া শোষিত কৃষক জোতদারী-মহাজনী শোষণের নাগপাশ হইতে সত্যিকারের মুক্তিলাভ করিবে, যেখানে জমির উপর তাহার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যেখানে শ্রমিক পাইবে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবারসহ মানুষের মতো বাঁচিবার গ্যারান্টি, যেখানে বেকারত্বের অভিশাপ থাকিবে না, যেখানে ছাত্রের জন্য থাকিবে বিজ্ঞানভিত্তিক সার্বজনীন গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে বুদ্ধিজীবির জন্য থাকিবে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ। প্রতিটি নাগরিকের জন্য থাকিবে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। এই সমাজ নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবে। উন্নতমানের কৃষি ব্যবস্থা ও শিল্প বিকাশের মাধমে

গড়িয়া তুলিবে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি ও একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ। এক কথায় এই সমাজ ব্যবস্থায় জনগণের জন্য থাকিবে অন্ন, বস্ত্র,বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির নূন্যতম গ্যারান্টি। এই বাংলা হইবে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষ,মধ্যবিত্ত, দেশপ্রেমিক ধনিক শ্রেণীর বাংলা জনতার বাংলা।[২৬৭]

৬ই জুলাই ১৯৭১–এ বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইস–লাম বাংলাদেশ সংসদ সদস্যদের এক সমাবেশে ভাষণ দানকালে বলেনঃ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে,গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি আমরা বহু পূর্বেই গ্রহণ করেছি। এ প্রশ্নে কারো মনে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলতে ব্যক্তিগত মালিকানা হ্রাস করতেই হবে। এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক মালিকানা অর্জন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মাধ্যমে আপনাদেরকে দেশ গঠনের কাজে অগ্রসর হতে হবে। [২৬৮]

২৬শে জুলাই ১৯৭১–এক প্রেস বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী পুনরায় স্বাধীন, সার্বভৌম ও সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে আহ্বান রাখেন। তাঁর মতে,এই বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও উপজাতীয়রা আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।"[২৬৯]

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ এ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে এর সদস্য শাহজাহান সিরাজ এক ভাষণে বলেনঃ

বাংলার ছাত্রসমাজ ও জনগণের পক্ষ থেকে আজকের এই পবিত্র দিনে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা বলতে চাই— বাংলার ভৌগলিক স্বাধীনতার সাথে সাথে বাংলার কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন আমি কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েম করব। লক্ষ লক্ষ মানুষের তাজা রক্ত আর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে যে নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে তার অর্থনীতি অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক হতে হবে। আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে অবশই নির্মূল করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে খান খান করে একটি শ্রেণী শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে প্রতিটি মায়ের সন্তান একই নীতিতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। পাঞ্জাবের ২২ পরিবারকে উৎখাত করে

আবার নতুন করে কোন পুঁজিপতি বাংলাদেশে যাতে সৃষ্টি না হয়,জনগণের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার কোন সুযোগ যাতে না থাকে তার বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তার ভিত্তিতে অবশ্যই ভাবী শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। [২৭০]

৩০শে নভেম্বর ১৯৭১-এ আবুল বাশার নেতৃত্বাধীন বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক 'বাংলাদেশের জনগণের সামনে উপস্থাপিত স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার রূপরেখা ও কর্মসূচী' শীর্ষক দলিলে স্বাধীন বাংলাদেশে "সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার" আহবান জানানো হয়।[২৭১]

৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (মনি সিংহ) 'মুক্তিযুদ্ধের নতুন অধ্যায় ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক পার্টি সার্কুলারে বলে ঃ

"বাঙালি জাতির জীবনে আজ এক নতুন দিনের সূচনা হইতেছে। আসুন আমরা সবাই মিলিয়া শপথ গ্রহণ করি যে বাংলাদেশের শ্রমিক,কৃষক ও মেহনতী জনগণকে অতীতের সমস্ত বঞ্চনা,শোষণ ও অত্যাচার হইতে মুক্ত করিব এবং স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এক সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গঠন করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে আগাইয়া যাইব " [২৭২]

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট তার বিঘোষিত কর্মসূচীর ১নং অনুচ্ছেদে বলেঃ

"পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর দখলকারী সৈন্যবাহিনীকে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা পরাভূত ও বিতাড়িত করা, বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তোলা।" [২৭৩]

১৪

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালায়ও নানাভাবে সমাজতন্ত্রের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। শোষণমুক্তির স্বার্থে সমাজতন্ত্রকে স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রাদর্শ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক ও সাহিত্যিক জহির রায়হানের (স্বাধীনতার পরপরই তিনি নিখোঁজ হন বা তাঁকে হত্যা করা হয়) 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি কথিকা প্রচারিত হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। এতে বলা হয়, পাকিস্তানের গত তেইশ বছরের (অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০—বর্তমান গবেষক) ইতিহাস হচ্ছে গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু, কায়েমী স্বার্থবাদী, আমলা মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতি, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী, সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থশিকারীদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। পাকিস্তানে সাধারণ মানুষ এক দুঃসহ সময় অতিবাহিত করেছে গত তেইশ বছর ধরে। ধনীরা আরো ধনী হয়েছে। গরীবের দল আরো গরীব হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশী শোষিত হয়েছে-পূর্ব বাংলা ও পূর্ব বাংলার মানুষ। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা এই শাসকচক্রের হাতে সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত হয়েছে। ১৯৬৯-এর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পাকিস্তানের শাসকচক্রের ভিত নাড়িয়ে দেয় এবং তারা বুঝতে পারে যে জনতার এই একতায় ফাটল না ধরাতে পারলে তাদের একচেটিয়া শোষণ আর গণবিমুখ শাসন ব্যবস্থাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে না। জহিরের এই কথিকায় আরো বলা হয়, পাকিস্তান এখন বাংলাদেশের মানুষের কাছে মৃত। বাংলাদেশ এখন প্রতিটি বাঙালির প্রাণ। বাংলাদেশে তারা পাকিস্তানের ইতি-

হ্রাসের পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না। সেখানে তারা গড়ে তুলবে এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। [২৭৪]

ডিসেম্বর ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ডঃ এবনে গোলাম সামাদ রচিত 'বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়' শীর্ষক কথিকায় বলা হয় ঃ

"একটা দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য বর্তমান যুগে রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা এখন মোটামুটি সব অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেন। কিন্তু সব পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে যেমন পরিকল্পনা তৈরীর নির্ভুলতার উপর, তেমনি সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে কার্যকর করার ভার যাদের হাতে ন্যস্ত থাকে তাদের নিষ্ঠা ও সততার উপর। কেবল আমলাতন্ত্রের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন হল উপযুক্ত সংগঠনের। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে, যে মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করে দেশকে শত্রুকবল থেকে মুক্ত করল, তাদের দেশপ্রেম ও কর্মশক্তিকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে লাগাতে হবে। এদের সাহায্যে গ্রাম বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে দ্রুত বিরাট পরিবর্তন আনা সম্ভব"।[২৭৫]

ডিসেম্বর ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ও নাসিম চৌধুরী রচিত 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন' শীর্ষক আরেকটি কথিকায় বলা হয় ঃ

" বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পরিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলার জন্য বদ্ধ পরিকর, দেশের ভবিষ্যৎ রূপরেখায় যা উপস্থাপিত হয়েছে তাতে কায়েমী স্বার্থের কোন স্থান থাকবে না, পুঁজিবাদ বা আমলাতান্ত্রিকতা কোন সুবিধা করতে পারবে না। নতুন করে কোন সুবিধাবাদী চক্রকে গড়ে উঠতে দেয়া হবে না'।[২৭৬]

১৫

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গণমাধ্যমে বা সংবাদপত্রে সমাজতন্ত্র

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর বা মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোতেও সমাজতন্ত্রের পক্ষে বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করা হয়েছে, বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। পত্র-পত্রিকাগুলোতে সমাজতন্ত্রকে বাংলাদেশের জনগণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সৃষ্ট ঐকমত্য এবং শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম মৌল রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

১৫ই অক্টোবর ১৯৭১-এ 'জয়বাংলা' পত্রিকার ১ম বর্ষ ঃ ২৩ সংখ্যায় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক এক নিবন্ধে অর্থনৈতিক ভাষ্যকার বলেন ঃ

এ কথাও বুঝতে হবে যে, মুক্তিযোদ্ধারা ভাড়াটিয়া সৈন্য নয়। দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ শুধু শুধু জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়নি। এর পেছনে অবশ্যই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সুনিশ্চিত আশ্বাস রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী ২২ পরিবারের জায়গায় বাঙালি ২২ পরিবার সৃষ্টি করার জন্যে তিনি এই মুক্তিসংগ্রাম শুরু করেননি। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য।

শুধু বঙ্গবন্ধুর মৌলিক ঘোষণাই নয়, আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতেও সামাজিক ন্যায় বিচার ও অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এই ঘোষণাপত্রের প্রথম দিকেই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকে কর্মসংস্থানের সুযোগসহ প্রতিটি নাগরিকের প্রাথমিক চাহিদা

পূরণের মৌলিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের—এ কথার স্বীকৃতি শাসনতন্ত্রে থাকবে।

রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের চাহিদা পূরণের মৌলিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের বলে ঘোষণা করার সঙ্গে উক্ত ঘোষণাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে আওয়ামী লীগ ম্যানিফেস্টোতে অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, "শোষণমুক্ত একটি ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন করাই এই অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। এটা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপকল্প—যাতে অর্থনৈতিক অবিচার দূরীকরণ ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ও সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এই সমৃদ্ধির ফল যথাযথভাবে বন্টনের বিধান থাকবে"।

"শোষণমুক্ত ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক রূপকল্প বাস্তবায়িত করার জন্যে আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে ভাবী শাসনতন্ত্রে যে ব্যবস্থা সংবিধানে সন্নিবদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেই সংবিধানটি জনগণের হাতে উপরোক্ত সমাজ গঠন ও অর্থনৈতিক রূপকল্প বাস্তবায়নের দলিল। শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ মৌলনীতির ভিত্তিতে উপরোক্ত শোষণমুক্ত ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন নির্ভর করবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে উপরোক্ত পদক্ষেপ সম্পর্কেও সুস্পষ্টভাবে পথ নির্দেশ করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের জায়গায় সরকারী খাতের সম্প্রসারণ এবং গুরুত্ব অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ও আমদানী-রফতানী বাণিজ্য জাতীয়করণ, যে পরোক্ষকর সাধারণ মানুষের কাঁধে চেপে বসে, কর ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে উপরোক্ত পরোক্ষ করের জায়গায় প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা প্রশাসনিক পদক্ষেপের অঙ্গ।

মূলধন ও ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক অংশীদারীত্ব

মূলধনে শ্রমিক শ্রেণীর অংশীদারীত্ব সম্পর্কে ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত শিল্প কারখানা সত্বর জনগণের মালিকানাধীন আনা হবে না, সরকার ক্রমবর্ধমান হারে তাদের ইকুইটি মূলধন দখল করবে। সরকার যেটুকু ইকুইটি মূলধন আয়ত্ত করবে, সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ যৌথভাবে সেই পরিমাণ অংশের মালিকানা লাভ করবে এবং সেই পরিমাণ অংশের মুনাফার ভাগ পাবে। শ্রমিকরা কেবল ইকুইটি মূলধনের নয়, শিল্প কারখানার ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করবে। এইভাবে শ্রমিক সমাজ যেমন ক্রমান্বয়ে অধিক হারে শিল্পে মালিকানা লাভ করবে তেমনি শিল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাতেও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

কৃষি ও গ্রামের জনগণ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী । এদের মধ্যে ৮০

শতাংশ প্রত্যক্ষভাবে কৃষি কর্মের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই শোষণমুক্ত এবং ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সফল রূপায়ণ কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ছাড়া সম্ভব নয়। তাই আওয়ামী লীগের ম্যানিফেষ্টোতে এ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, 'কৃষি ও গ্রামের মানুষের অবস্থার উন্নয়নের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া না হলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের সমস্ত পরিকল্পনাই অর্থহীন হয়ে পড়বে। একদিকে আমাদের গোটা সমাজের সর্বত্র দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়েছে, অন্যদিকে গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার মানের গুরুতর বৈষম্য রয়েছে"।

এ প্রসঙ্গে মেনিফেষ্টোতে আরও বলা হয়েছে যে এর পিছনে ঐতিহাসিক কারণ থাকলেও নিকট অতীতে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির জন্য এই বৈষম্য আরও বেড়ে গিয়েছে, ফলে গরীব চাষীর হাত থেকে সম্পদ ধনী পুঁজিপতিদের হাতে ব্যাপকভাবে পাচার হয়ে গিয়েছে। আওয়ামী লীগ অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলের জনগণকে এইরূপ শোষণের হাত থেকে বাঁচাবার অঙ্গীকার করেছে। আর এটা করতে হলে কৃষি খাতে সুদূর প্রসারী বিপ্লবের প্রয়োজন। এই ধরনের বিপ্লবের পূর্বশর্ত হলো ভূমি ব্যবহারের বর্তমান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন এবং বহুমুখী সমবায়ের মত নয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

কাজেই ঔপনিবেশিক শোষণের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করার ঐকান্তিক কামনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ন্যায় নীতি ও অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষকে একটি শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে"।[২৭৭]

২১শে অক্টোবর ১৯৭১-এ 'স্বদেশ' পত্রিকার ১ম বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যায় 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রঃ বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী' শীর্ষক ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধির প্রতিবেদনে বলা হয় যে, সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশের বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

"আমাদের সরকার এমন এক রাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক যে রাষ্ট্র হবে সার্বিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক এবং যার বৈদেশিক নীতি হবে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ"— মুক্তি বাহিনীর দুর্জয় ঘাঁটি রৌদ্র করা মালভূমি দিনাজপুরে প্রায় তিন হাজার সুশিক্ষিত গেরিলাদের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দীপ্ত কণ্ঠে উপরোক্ত ঘোষণা করেন।[২৭৮]

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ 'স্বদেশ' পত্রিকার ১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যায় 'আসুন যুদ্ধের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত হউন' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে ঃ

"........ আমরা আজ সংকল্পবদ্ধ। চট্টল থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত বিস্তৃত এর রণাঙ্গণ। ক্ষেত-খামার-স্কুল-কলেজ আর কলে কারখানায় এ যুদ্ধ চলবে। আমাদের আজকের

যুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ- গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সুমহান আদর্শ বাস্তবায়নের যুদ্ধ। আমাদের আজকের যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। আমাদের আজকের যুদ্ধ সুখী সমৃদ্ধিশালী কৃষক শ্রমিক ছাত্রজনতার বাংলাদেশ গড়ার। বাংলাদেশের মাটিতে কবরস্থ হয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তান আত্মহত্যা করেছে। গড়ে উঠেছে নতুন দেশ নতুন জাতি। বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতি"।[২৭৯]

২১ শে ডিসেম্বর ১৯৭১-এ 'মুক্তিযুদ্ধ' পত্রিকার ১ম বর্ষ ঃ ২০শ সংখ্যায় 'রাজনৈতিক হালচাল' শীর্ষক ভাষ্যকারের নিবন্ধে বলা হয় ঃ

> .... স্বাধীনতার দাবীতে বাঙলাদেশের সব মানুষ এক। পশ্চিম পাকিস্তানের কুখ্যাত বাইশটি একচেটিয়া পুঁজিপতি পরিবার, বড় জমিদার গোষ্ঠী ও উহাদের মুরুব্বী সাম্রাজ্যবাদীরা বাঙলাদেশের উপর যে এক ধরনের ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের জোয়াল চাপাইয়া দিয়াছিল, উহা হইতে মুক্তি চায় প্রতিটি নরনারী। এই একচেটিয়া শোষণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উহারা যে নিষ্ঠুর সামরিক স্বৈরতন্ত্র কায়েম করিয়াছিল উহাকে ধ্বংস করিয়া জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর, সকল স্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ। প্রতিটি দেশবাসী চায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং উক্ত দাবীতে প্রত্যেকেই ঐক্যবদ্ধভাবেই লড়াই করিতেছে।
>
> এখন প্রশ্ন হইল, স্বাধীন বাঙলাদেশে কোন শ্রেণীর মানুষের স্বপ্ন সফল হইবে? শোষক শ্রেণীর না শোষিত শ্রেণীর? যে শ্রমিক/কৃষক/ছাত্র জনতা স্বাধীনতার জন্য বুকের রক্ত ঢালিতেছে তাহাদের শোষণমুক্তির পথ উন্মোচিত করা হইবে, না মুষ্টিমেয় ধনিকের শোষণের অধিকার কায়েম করা হইবে? বাঙালি উদীয়মান ধনিক শ্রেণী স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে। পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে ইহারা অতীতেও লড়াই করিয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ইহারা মিত্র শ্রেণীভুক্ত। তাহা সত্ত্বেও একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাদের শ্রেণী চরিত্র শোষকের। কাজেই স্বাধীন বাঙলাদেশে ইহাদিগকে যদি অবাধ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয় অর্থাৎ বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহা হইলে শোষিত শ্রেণীগুলি অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবী তথা সকল মেহনতী মানুষ শোষণের জোয়ালে আবদ্ধই থাকিয়া যাইবে। শোষকের পরিবর্তন হইলেও শোষণের অবসান ঘটিবে না। তাছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করা হইলে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ ইয়াহিয়া-চক্রকে অস্ত্র, অর্থ, "উপদেষ্টা" দিয়া বাঙলার নরমেধ-যজ্ঞে সহায়তা করিতেছে, সাহায্য, ঋণ ও "বিশেষজ্ঞের" জন্য উহাদিগকেই স্বাধীন বাঙলাদেশে ডাকিয়া আনিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িবে বাঙলাদেশ। সোনার বাঙলা আরও রিক্ত, আরও কঙ্কালসার হইয়া পড়িবে।
>
> ইহার বিকল্প কি? ইহার বিকল্প রাস্তা হইল পুঁজিবাদী পথ পরিহার করা— শুধু শোষক পরিবর্তন নয়, শোষণমূলক ব্যবস্থারই চির অবসানের দিকে পদক্ষেপ

নেওয়া। শোষিত-নিপীড়িতের রাজ কায়েম করা। ইহার অর্থ এই নয় যে, পুঁজিপতিদের গলা কাটিয়া ফেলা হউক কিম্বা যে লোক আন্ডা বেচিয়া খায় তাহার মুরগীটিকে জাতীয়করণ করিয়া লওয়া হউক। বাঙলাদেশের সামাজিক বিকাশের বর্তমান স্তরে বেসরকারী উদ্যোগের ইতিবাচক ভূমিকা শেষ হইয়া যায় নাই। কাজেই বেসরকারী পুঁজি বা উদ্যোগকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করার প্রশ্ন আসে না। কিন্তু এই পুঁজিকে জনসাধারণের উপর অবাধ শোষণ চালাইয়া একচেটিয়া পুঁজিতে পরিণতি হইতে দেওয়া চলিবে না। রাষ্ট্রায়ত্ব খাতকে জাতীয় অর্থনীতির নিয়ামক শক্তিরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ব্যাঙ্ক-বীমা, বৃহৎ শিল্প, পাট শিল্প ও ব্যবসা, আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা প্রভৃতি জাতীয়করণ করিয়া রাষ্ট্রায়ত্ব বা সরকারী খাতকে শক্তিশালী করিতে হইবে। সরকারী খাতের পরিচালনা ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকীকরণ, পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকের অংশ গ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান এবং সরকারী খাতের দক্ষতা বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা নিতে হইবে। জাতীয় অর্থনীতির বিকাশকে পরিচালিত করিতে হইবে অপুঁজিবাদী পথে— যাহা পরিণতি লাভ করিবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায়।[২৮০]

১২ ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকার ১ম বর্ষ ঃ ৫ম সংখ্যায় 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কি এবং কেন' শীর্ষক নিবন্ধে মোহাম্মদ আলী খান বলেনঃ "বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখে তাই আজ কঠিন অগ্নি পরীক্ষা। প্রথমত ঃ বিদেশী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করা, দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের বঞ্চিত অবহেলিত মানুষের জন্যে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করা"।[২৮১]

২৮শে নভেম্বর ১৯৭১-এ 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকার ১ম বর্ষ ঃ ১৫শ সংখ্যায় 'শোষণ অবসানের অভিযান' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ "একদিন সারা বাংলাদেশ রাহুমুক্ত হবে, বাংলাদেশের সূচাগ্র ভূমিতেও পাকিস্তানী শোষকের অবৈধ অধিকার থাকবে না, সর্বত্র উড়বে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের শাসন। .... জনসাধারণের শোষণমুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের হৃদপিণ্ড স্বরূপ"।[২৮২]

৫ই অক্টোবর ১৯৭১-এ 'বাংলার বাণী' পত্রিকার মুজিবনগর ঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'কাহার সঙ্গে আপোষ, কিসের আপোষ?' শীর্ষক নিবন্ধে রাজনৈতিক ভাষ্যকার বলেন ঃ

"..... স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুমহান উদ্দেশ্যে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত থামিবে না"।[২৮৩]

৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ 'বাংলার বাণী' পত্রিকার মুজিবনগরঃ ১৫শ সংখ্যায় পাঠকদের চিত্রিপত্রের জবাবে একস্থানে বলা হয় ঃ শেখ মুজিবের রাজনীতিক আদর্শ হচ্ছে "স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ শোষণবিহীন সমাজ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা"।[২৮৪]

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ 'নতুন বাংলা' পত্রিকার ১ম বর্ষ ঃ ১৮-শ সংখ্যায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সমীপেষু' শীর্ষক রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে যে বিশদ প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকার সমীপে দেয়া হয়, তাতে সমাজতন্ত্রকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার দাবী জানানো হয়। সমাজতন্ত্র বাস্তবায়ন করার জন্যে কতকগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিশদ উল্লেখও ঐ প্রস্তাবে স্থান পায়।[২৮৫]

১১ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ 'জাগ্রত বাংলা' পত্রিকার ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে দেখা যায়যে, মুক্ত ভালুকায় এক জনসভায় 'জাগ্রত বাংলা'- এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হাফিজউদ্দিন আহমদ বলেন যে, শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েমই বাংলাদেশের লক্ষ্য। [২৮৬]

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ "অভিযান" পত্রিকার ১ম বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যায় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালির দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত দুর্জয় পৌরুষের ঐতিহাসিক পুরস্কার' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী মনসুর আলী বলেছেন, "বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কাজে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতেই আমারা আত্মনিয়োগ করব"। [২৮৭]

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ 'অভিযান'' পত্রিকার ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যায় 'বিশ্ব পরিসরে বাঙলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আজ আমাদের হাতে' শীর্ষক ভাষ্যে পত্রিকার রাজনীতিক পর্যালোচক বলেছেন যেঃ "ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বপরিসরে প্রতিষ্ঠিত হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ"। [২৮৮]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পত্র-পত্রিকার মতো মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের কাজে নিয়োজিত প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও সমাজতন্ত্রকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রাদর্শ এবং নতুন দেশের অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। সারদা পুলিশ একাডেমির প্রিন্সিপাল এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ও আই জি পি আবদুল খালেক সেপ্টেম্বর ১৯৮৪-তে এক সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ

"স্বাধীনতাযুদ্ধের দিনগুলোয় আমরা যখন আমাদের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেছি তখন তাদেরকে সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। যে অন্যায় অবিচার ও শোষণকে লক্ষ্য করে মুক্তিকামী বাঙালিরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তার অবসান ঘটাতে হলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যে আদর্শ স্থানীয় তার ব্যতিক্রম কিছু বলার ছিল না। ধনতন্ত্রের কাঠামো ও ভিতকে দুর্বল করতে হলে জনসাধারণকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিতে হবে—এই ছিল আমাদের বাণী। এই দুর্গম পথের পাথেয় ত্যাগ তিতিক্ষা তার নাম ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধ। ত্রিশ লক্ষ লোকের জীবন দান আর মা বোনদের ইজ্জত হানি— এই আমাদের ত্যাগ তিতিক্ষা। ফসল হলো—বাংলাদেশ"।[২৮৯]

এদিকে ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭১-এ ঢাকায় ফিরে আসার পর বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এয়ারপোর্টে এবং অতঃপর ২৩শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ

সচিবালয়ের সকল অফিসার ও কর্মচারীগণের এক সভায় ঘোষণা দেন যে, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতিগুলোর ওপর দেশকে গড়ে তোলা হবে। তিনি বলেন যে, মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা জীবন দান করেছেন, তাঁরা লড়াই করেছিলেন আইনের শাসন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সব রকমের শোষণ ও বৈষম্য চিরতরে বন্ধ করার জন্যে। কেবল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়েই এদেশের সব মানুষের জীবিকা নিশ্চিত করা যাবে।[২৯০]

পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসে গোড়াতে রাষ্ট্রপ্রধান এবং অনতিকাল মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন ঃ

"বাংলাদেশের জনগণ তাদের ভূমিতে শোষণমুক্ত এক ন্যায়ানুগ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে বাঙালি জনগণকে অনেক বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। আমাদের জনমণ্ডলী, সম্পদরাজি ও মৌলিক আর্থনীতিক বাস্তবতা যার সম্মুখীন আমরা, এসবের পরিপ্রেক্ষিতে জন আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত করা"[২৯১]

উপসংহার

ওপরের সমগ্র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহারে বলা যায় যে, ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য, সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং জনগণের আর্থনীতিক-সামাজিক পূর্ণাঙ্গ শোষণ মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে পাকিস্তান তার কোনো প্রতিশ্রুতিই পূরণ করতে পারেনি। পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামো গোড়া থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজি, সামন্ত-অভিজাত, বণিক-ব্যবসায়ী, সামরিক-আমলা চক্র ও তথাকার শাসকগোষ্ঠীর অঞ্চল শ্রেণী ও গোত্রগত স্বার্থে নিজেকে কাজে লাগিয়েছে, ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে অল্প দিনের ভেতরই পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। একদিকে আর্থনীতিক জীবনের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের ও অবাঙালিদের সর্বময় কর্তৃত্ব এবং অন্যদিকে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে বেসামরিক-সামরিক স্বেচ্ছাচার আর সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনীতে বাঙালির প্রতিনিধিত্বহীনতার প্রেক্ষাপটে আর্থনীতিক শোষণ চরম আকার নেয়। দু'অঞ্চলের বৈষম্য ভয়াবহ পর্যায়ে চলে যায়। রাজনীতিক ক্ষেত্র অকার্যকর থাকা এবং আমলা-সামরিক ক্ষেত্রে বাঙালির তেমন কোনো প্রতিনিধিত্ব না থাকার ফলে রাষ্ট্র কাঠামোয় ও সরকারী সিদ্ধান্তে-বরাদ্দে বাঙালির কোনো ঠাঁই ছিল না। এই প্রক্রিয়ায় ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের আর্থনীতিক বৈষম্য, ক্ষমতা চর্চার মাত্রায় ফারাক এবং চেতনাগত বিচ্ছিন্নতা বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত হয়ে ওঠে। এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি ও পূর্ব বাংলা পাকিস্তানী কাঠামো থেকে দূরে যেতে যেতে স্বাতন্ত্র্য, স্বাধিকার ও শেষাবধি

স্বাধীনতার পথে পা বাড়ায়। বাঙালির কাছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপযোগিতা বিনষ্ট হয়। ১৯৪৮–৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪–এর নির্বাচনী সংগ্রাম, ১৯৬২–৬৪এর সংগ্রাম, ১৯৬৬ এর স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সংগ্রাম, ১৯৬৮–৬৯এর বৈপ্লবিক গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচনী সংগ্রাম, ১৯৭১ এরঅসহযোগ আন্দোলন—ইত্যাদি বড় বড় আন্দোলন–সংগ্রামসহ বহু ত্যাগ–তিতিক্ষা ও রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে এবং পরিশেষে ১৯৭১–এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়ে বাঙালি জনমণ্ডলী তাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথে এগোতে চেষ্টা করে।

পাকিস্তানে যেমন ছিল আঞ্চলিক শোষণ, তেমনি ছিল শ্রেণী শোষণ। বিশেষত আইয়ুব দশকে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে আর্থনীতিক উন্নয়নের নীতির ফলস্বরূপ আঞ্চলিক বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ শ্রেণী শোষণের কারণে শ্রেণী বৈষম্যও মারাত্মক হয়ে ওঠে। এজন্যে গোড়াতে বাঙালি নেতৃবর্গ, সংগঠনসমূহ ও সাধারণভাবে জনগণ স্বায়ত্তশাসন, আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান ও গণতন্ত্র দাবী করলেও অচিরেই শ্রেণী বৈষম্যের সত্য সামনে প্রকট হয়ে ওঠে। যদিও ১৯৪৭ বা তার পূর্ব থেকে বাঙালির অগ্রসর ও প্রগতিশীল অংশ এবং বাম–কমিউনিস্ট আর কৃষক–শ্রমিক সংগঠনের ভেতর শোষণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও কর্মসূচী ছিল, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল। তথাপি ষাট দশকের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও অসহনীয় বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক ও শ্রেণীগত শোষণের দ্বিবিধ চাপে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং সাধারণভাবে জনগণের ভেতর সমাজতন্ত্রের চেতনা ছড়িয়ে পড়ে। বাম প্রগতিশীলদের প্রচেষ্টায় এই চেতনা দ্রুত প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। এজন্যে একসময়কার স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচীর বা 'দুই অর্থনীতি তত্ত্বের' সাথে সাথে শ্রেণী শোষণ মুক্তির বক্তব্যও বলিষ্ঠভাবে আসতে থাকে। ১৯৬৮–৬৯ এর বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের শুরুতে ছাত্রদের ১১–দফায় সমাজতান্ত্রিক চেতনা এবং অভ্যুত্থানে শ্রমিক–কৃষক বস্তিবাসী বিত্তহীন মেহনতী মানুষের কার্যকর অংশগ্রহণ, প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ অর্জন এবং সর্বপ্লাবী ঘেরাও আন্দোলনের ফলে শ্রমিক–কৃষক রাজ বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বক্তব্য সর্বপ্রাধান্য লাভ করে। এ সময় থেকে বাম–কমিউনিস্ট প্রগতিশীল রাজনীতিক ছাত্র–শ্রমিক–কৃষক–সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের কর্মসূচীতে তো বটেই, এমনকি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, উদারনীতিক দল–সংগঠন, ছাত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীতেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। ১৯৭০–এর নির্বাচনে পূর্ব বাংলার আপামর জনগণের গণরায় লাভ করে আওয়ামী লীগ, এই সমাজতন্ত্রের বক্তব্যকে প্রাধান্যে এনে। এভাবে সমাজতন্ত্র ২৪ বছরের পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় শ্রেণী ও অঞ্চলগত দ্বিবিধ শোষণের চাপে বাঙালি জনমণ্ডলীর ঐকমত্যে পরিণত হয়। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই ঐকমত্য আরো দৃঢ়তা লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বারংবার ঘোষণা দিয়ে এটাকে স্বীকৃতি দেন। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে এভাবেই সমাজতন্ত্র

বাঙালি জনমণ্ডলীর ঐকমত্য হিসেবে বাংলাদেশ সংবিধানে মৌল রাষ্ট্রীয় নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার বিষয়টি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের তরফ থেকে জনমন্ডলীর কাছে সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি হিসেবে ব্যক্ত হয়।

বর্তমান গবেষণায় সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে বাংলাদেশে ঐকমত্য গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আনুগত্যের পেছনে সুশৃংখল জীবন ও নিরাপত্তা লাভ এবং বৈষয়িক জীবনে টিকে থাকা শুরু থেকে করে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও প্রগতির সম্ভাবনার শর্ত সমুপস্থিত। বন্টনে বাঁচা, সমতালে এগোনো, ন্যায় নীতির প্রতিষ্ঠা—এসব প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্র প্রদত্ত। মানবমণ্ডলী সেজন্যেই খুঁজে পায় রাষ্ট্রেয় উপযোগিতা। রাষ্ট্রের বিচার হবে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ট মানবমণ্ডলীর জীবনে প্রকৃত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি আনয়নে তার আন্তরিক প্রয়াস-প্রচেষ্টা ও সাফল্যের মাপকাঠিতে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর্থনীতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা বলে। শোষণমুক্তি, ক্রমাগত সমৃদ্ধি, বন্টনে বাঁচা, সমতালে এগোনো ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি পেয়ে বাঙালিরা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল, তার জন্যে সার্বিক ত্যাগ স্বীকার করেছিল।

কিন্তু, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তান উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে থাকে এবং এরই বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় বাঙালির আনুগত্যও হ্রাস পেতে থাকে। পাকিস্তান রাষ্ট্র কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের ও তথাকার অবাঙালি বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে পূর্ব বাংলার ওপর ঔপনিবেশিক আধিপত্য কায়েম করে। পূর্ব বাংলা হয়ে পড়ে পাকিস্তানী কাঠামোয় অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ। অঞ্চল ও শ্রেণীগত শোষণের ফলে পূর্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য হয়ে পড়ে পবর্তসম। ওদিকে ব্যক্তিগত খাতে উন্নয়নের নামে শ্রেণীগত শোষণ মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতির স্বার্থের প্রয়োজনে অধিকাংশ বিশেষত পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষকে দিনে দিনে দরিদ্রতর করে তোলে। অঞ্চল ও শ্রেণীগত শোষণ-বৈষম্য-পীড়নের বিরুদ্ধে তাই বাঙালিদেরকে চালাতে হয় একটানা সংগ্রাম। শোষণ ও বন্টনের অন্যায্যতা দূরীকরণের প্রয়োজনে একারণে বন্টনে সাম্য ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার দাবী ওঠে বাঙালীর তরফ থেকে। আর এহেন আর্থনীতিক এবং সামাজিক-রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্ট আন্দোলন-সংগ্রামের ভেতর দিয়েই পূর্ব বাংলার নেতৃবর্গ ও রাজনীতিক, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক সংগঠন এবং জনমণ্ডলীর ভেতর থেকে শোষণহীন সমবন্টনের সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রের দাবী সরবে উচ্চারিত হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালের বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে বাঙালি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও বাম অংশের কাছ অপেক্ষা এ দাবী অতি স্পষ্টই মুখ্যতর ও তীব্রতর হয়ে ওঠে শ্রমিক-কৃষক মেহনতী বিত্তহীন গণমানুষের চেতনা ও সংগ্রামের মাঝে। ধর্মের নামে শোষণকারী পুঁজিবাদী অন্যায্য পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি

জনমণ্ডলীর এই দাবীর ফলে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের মীমাংসা সম্ভবপর ছিল না বিধায় একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে এর নিরসন ঘটে।

বাঙালি জনতা সার্বিক সমর্থনের মাধ্যমে, ভোটের জোরে (১৯৪৬–এর নির্বাচন দ্রষ্টব্য) পাকিস্তানকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল ১৯৪৭ সালে। কিন্তু, তারা পুঁজিবাদী শোষণমূলক পাকিস্তান চায়নি এবং সেজন্যে দিনে দিনে জমা হওয়া ক্রোধবহ্নিতে তারা পাকিস্তানের ধ্বংস চেয়েছে। এরই পরিণতিতে ১৯৭১ সালে মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে তারা এতদঞ্চলে অস্ত্র দিয়ে পরাজিত করেছে শোষক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো পাকিস্তানকে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে মৌল রাষ্ট্রীয় নীতিমালার অঙ্গীভূত করার পেছনে বাঙালির চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামজাত ঐকমত্যই স্বীকৃতি পায়। শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্নই সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে বাঙালি জনমণ্ডলীর চেতনায় প্রবিষ্ট করে।

তথ্য ও সূত্র নির্দেশ

১। সাইমন কুজনেতস্, সিক্স লেকচারস্ অন ইকোনমিক গ্রোথ, ইলিনয় ঃ দি ফ্রী প্রেস অফ গ্লেনকো, ১৯৫৯,পৃঃ ১৪।

২। থমাস বালোগ " এনফ্র্যানচাইজমেন্ট" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। থমাস বালোগ, "প্রবলেমস এ্যান্ড স্ট্র্যাটেজীজ অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং ঃ লেসনস্ ফ্রম ল্যাটিন এ্যামেরিকা", উদ্ধৃত ঃ নরম্যান টি, আপহফ্ এ্যাণ্ড ওয়ারেন এফ, ইলচ্‌ম্যান, সম্পাদিত, দি পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ ডেভেলপমেন্ট, বার্কলে ঃ ইউনির্ভাসিটি অফ ক্যালিফোর্ণিয়া প্রেস, ১৯৭২, পৃঃ ৯৬।

৩। তারিক আলী, ক্যান পাকিস্তান সারভাইভঃ দি ডেথ অফ এ স্টেট, লন্ডন ঃ ১৯৮৩ঃ পৃঃ ৮৬।

৪। ১৯৬০ পাকিস্তান সেন্সাস অফ এগ্রিকালচার ঃ এ সামারী অফ ইষ্ট এ্যাণ্ড ওয়েষ্ট পাকিস্তান ডাটা, করাচী ঃ ১৯৬৩, ভলিয়্যুম ১ এবং ২।

৫। এই প্যারার তথ্য নেয়া হয়েছে- সের্গেই স্তেপানোভিচ বারানভ, পূর্ব বাংলা ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য (১৯৪৭-১৯৭১), অনূদিত, ঢাকা ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬, পৃঃ১১৭।

৬। রিচার্ড নেশনস্, "দি ইকোনমিক স্ট্রাকচার অফ পাকিস্তান এ্যাণ্ড বাংলাদেশ", নিউ লেফট রিভিউ, নম্বর ৬৫, জুলাই-আগষ্ট ১৯৭১।

৭। কীথ বি. গ্রীফিন, ' ফিনান্সিং ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানস্ ইন পাকিস্তান", পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ভলিয়্যুম ৫, স্প্রীং ১৯৬৫, পৃঃ ৬১২-১৩।

৮। এ.এইচ. এম.এন. চৌধুরী," সাম রিফ্লেকশনস্ অন ইনকাম রিডিস্ট্রিবিউটিভ ইন্টারমিডিয়েশন ইন পাকিস্তান", পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ভলিয়্যুম ১০, ১৯৬৯, পৃঃ ৯৫-১১০।

৯। সের্গেই স্তেপানোভিচ বারানভ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২, ১২১-২২।

১০। স্বদেশ আর. বোস, "ট্রেন্ড অফ রিয়েল ইনকাম অফ দি রুরাল পুওর ইন ইষ্ট পাকিস্তান, ১৯৪৯-৬৬" , পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ভলিয়্যুম ৮, অটাম, ১৯৬৮,পৃঃ ৪৫২-৪৮৮।

১১। কীথ বি. গ্রীফিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০৮।

১২। মোহাম্মদ ইরশাদ খান। " এগ্রিগেটিভ এ্যানালিসিস অফ ফুড কনজাম্পশন ইন পাকিস্তান," পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ভলিয়্যুম ৯, উইন্টার ১৯৬৮, পৃঃ ৪২৬-৪১।

১৩। পপুলেশন সেন্সাস অফ পাকিস্তান ১৯৬১, পৃঃ ১১।

১৪। স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক অফ পাকিস্তান ১৯৭১, করাচী ঃ ১৯৭১, পৃঃ ২২০।

১৫। আবদুল গফুর ," কম্পারিজন অফ দি ইন্টার রিজিওনাল পার্চেজিং পাওয়ার অফ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ওয়েজেজ ইন পাকিস্তান," পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ভলিয়্যুম ৩, উইন্টার ১৯৭১, পৃঃ ৫৩৩-৩৪।

১৬। এ. আর. খান " হোয়াট হ্যাজ বীন হ্যাপেনিং টু রীয়েল ওয়েজেজ ইন পাকিস্তান?," পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ভলিয়্যুম ৭, অটাম ১৯৬৭, পৃঃ ৩৩৮।

১৭। বারানভ, প্রাগুক্ত,পৃঃ ১২১-২২।

১৮। রিপোর্ট অফ ফাইভ মেম্বারস অফ দি ফিনান্স কমিশন, ঢাকাঃ গভর্ণমেন্ট অফ ইষ্ট পাকিস্তান, ১৯৬২, পৃঃ ১২, ২২ এবং ২৩।

১৯। হাসান উজ্জামান, সমসাময়িক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, ঢাকাঃ দেশপ্রিয় পাবলিকেশন্স, প্রথম সংস্করণ জুলাই, ১৯৭৮, পৃঃ ৯৫-৯৬।

২০। বারানভ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০-৫১।

২১। এই পুরো প্যারার তথ্যের জন্যে- বারানভ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩।

২২। হাসান উজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫-৯৬।

২৩। রিপোর্টস্ অফ দি, এ্যাডভাইজারী প্যানেলস্ ফর দি ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ১৯৭০-৭৫, ইসলামাবাদ ঃ গভর্ণমেন্ট অফ পাকিস্তান, পৃঃ ২২, ১৩৬।

২৪। বারানভ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬।

২৫। ঐ।

২৬। টুয়েন্টি ইয়ারস অফ পাকিস্তান ইন স্ট্যাটিসটিকস্ ১৯৪৭-৬৭, করাচী ১৯৬৮, পৃঃ ১৯৮।

২৭। বারানভ, প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৬৩।

২৮। লুসিয়ান ডব্লিউ, পাই, অ্যাসপেক্টস্ অফ পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, নিউ দিল্লীঃ অমরিন্দ পাবলিশিং কোঃ প্রাইভেট লিঃ, ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৭২,পৃঃ ৬৬।

২৯। মর্নিং নিউজ, ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৭। উদ্বৃত ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র ঃ প্রথম খণ্ড, ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নভেম্বর ১৯৮২, পৃঃ ২৫-২৭।

৩০। ১৯৪৭ সালের বিভাগ পূর্ব ও বিভাগকালীন বাংলাদেশে এবং ১৯৪৬-উত্তর পূর্ব বাংলায় শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন ও কমিউনিষ্টদের সংগ্রাম এক কথায়

সমাজতন্ত্রের জন্যে আন্দোলন সংগ্রামের বিস্তারিত ইতিহাস জানার জন্যে দেখুন–

কৃষ্ণবিনোদ রায়, চাষীর লড়াই, কলকাতাঃ বঙ্গীয় প্রদেশিক কৃষক সভার পক্ষে বগলা গুহ কর্তৃক ২৯৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত।

মুজফ্ফর আহমদ, কৃষক সমস্যা, কলকাতা ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ৩য় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৫৪।

ভবানী সেন, তাঙ্গনের মুখে বাংলা কলকাতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমি-টেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৪৫।

সত্যেন সেন, ঢাকা জেলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস একটি রক্ত–রাঙ্গা অধ্যায় ।

সত্যেন সেন ও বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, মেহনতী মানুষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৬।

অজয় ভট্টাচার্য, নানকার বিদ্রোহ, প্রথম খণ্ড, ঢাকা ঃ পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ১লা শ্রাবণ ১৩৮০। নানকার বিদ্রোহ দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ পুঁথিপত্র প্রকাশনী, তারিখবিহীন (কেবল ৭ই নভেম্বর মহান সোভিয়েত বিপ্লব স্মরণে কথাটি লেখা রয়েছে)।

জিতেন ঘোষ, পরাদের আড়াল থেকে, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, সেপ্টেম্বর ১৯৭০। জিতেন ঘোষ, জেল থেকে, ঢাকাঃ ইুডেন্টস্ পাবলিকেশন, দ্বিতীয় প্রকাশন, ফাল্গুন ১৩৮০।

জ্ঞান চক্রবর্তী, ঢাকা জেলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অতীত যুগ, ঢাকাঃ জন সাহিত্য প্রকাশন, জুন ১৯৭২।

জ্ঞান চক্রবর্তী, কৃষকনেতা জিতেন ঘোষ, ঢাকাঃ প্রকাশকঃ শামসুল হক, গ্রাম পোষ্ট– তাটেরচর, মুদ্রকঃ প্যারাগন প্রিন্টার্স, ঢাকা অক্টোবর ১৯৭৭।

সত্যেন সেন, বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম, ঢাকাঃ কালিকলম প্রকাশনী, তারিখবিহীন। সত্যেন সেন, গ্রাম বাংলার পথে পথে, ঢাকাঃ কালিকলম প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৮১।

দেবেন শিকদার, বাংলার কৃষক আন্দোলন ও মওলানা ভাসানী, চট্টগ্রামঃ বুলবুল প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৭৮।

খোকা রায়, সংগ্রামের তিন দশক (১৯৩৮–১৯৬৮), ঢাকাঃ জাতীয় সা হিত্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬।

বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, নভেম্বর ১৯৭০। দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, সেপ্টেম্বর ১৯৭৫। বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, জৈষ্ঠ ১৩৭৯, ইং ১৯৭২।

৩১। 'আশু দাবী কর্মসূচী আদর্শ', ঢাকাঃ প্রকাশক– কমরুদ্দীন আহমদ, কনভেনার গণ–আজাদী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান পাবলিশিং হাউজ, জুমরাইল লেন, প্রথম সংস্করণঃ জুলাই ১৯৪৭, পৃঃ ১।

উদ্ধৃতঃ বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, নভেম্বর ১৯৭০, পৃঃ ১।

৩২। আশু দাবী, পৃঃ ২, উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ২।

৩৩। ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা', পুস্তিকাঃ "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?", ঢাকাঃ প্রকাশক অধ্যাপক এম. এ. কাশেম, এম, এস. সি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তমদ্দুন অফিস, রমনা, ঢাকা। প্রিন্টার– এ. এইচ. সৈয়দ, বলিয়াদী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩৭ নং বংশাল রোড, ঢাকা, ১ম সংস্করণ– সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ ইং পৃঃ ৮। উদ্ধৃত, উমর, ঐ, পৃঃ ১৭।

৩৪। দি পাকিস্তান ইয়ারবুক, করাচীঃ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯, পৃঃ ৭৪৪।

৩৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্রঃ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৩–৭৫।

৩৬। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৯৩।

৩৭। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৯৪।

৩৮। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৯৬–১০০।

৩৯। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ১০০–১০১।

৪০। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ১০১।

৪১। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ১০২–১০৩।

৪২। উদ্ধৃতঃ বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃঃ ৩০৫–৩০৬।

৪৩। ঐ, পৃঃ ৩০৬।

৪৪। ঐ, পৃঃ ৩০৬।

৪৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮–২০।

৪৬। কমরুদ্দীন আহমদ, দি সোশ্যাল হিস্টোরী অব ইষ্ট পাকিস্তান, ঢাকা ক্রিসেন্ট বুক ষ্টোর, ১৯৬৭, দ্বিতীয় সংস্করণ, এ্যাপেনডিক্স–সি।

৪৭। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৭, ১৮ এবং ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৩।

৪৮। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, পৃঃ ২০৭।

৪৯। ঐ, পৃঃ ২১১–১২।

৫০। মুশতাক আহমদ, গভর্ণমেন্ট এ্যান্ড পলিটিকস ইন পাকিস্তান, করাচীঃ পাকিস্তান পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৩, পৃঃ ১৬৩।

৫১। সরদার ফজলুল করীম, "পূর্ববঙ্গঃ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের বামপন্থী সমাজতন্ত্রী চিন্তার উদ্ভব এবং বিকাশের প্রসঙ্গ, " ঢাকাঃ সমাজ নিরীক্ষণ বক্তৃতা ১৯৮৫, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সনিকে–৮১, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৮৫, পৃঃ ২২ (পুরো বক্তৃতাটি ২৩ পৃষ্ঠার একটি বুকলেট)।

৫২। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৩–৭৪।

৫৩। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

৫৪। ঐ।

৫৫। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

৫৬। দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

৫৭। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০২।

৫৮। শোষণের এই চিত্রসহ পুরো প্যারার তথ্যাদি নেয়া হয়েছে– ঐ, পৃঃ ৬০৩–৬১০।

৫৯। দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা ১০ এবং ১৩ই নভেম্বর ১৯৬১।

৬০। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১লা জুলাই ১৯৬৫।

৬১। হাজী মোহাম্মদ দানেশ, জনাব আইয়ুব খাঁর জবাবে (পুস্তিকা), ঢাকাঃ পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, অক্টোবর ১৯৬৪।

৬২। ঐ।

৬৩। ন্যাপের ১৪ দফা– জাতীয় মুক্তির কর্মসূচী, ঢাকাঃ মহিউদ্দিন আহমদ, যুগ্ম সম্পাদক পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত এবং আরফান প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৫ই জুন ১৯৬৫।

৬৪। আমাদের বাঁচার দাবী ৬–দফা কর্মসূচী, ঢাকাঃ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, প্রকাশকঃ আবদুল মোমিন, প্রচার সম্পাদক, ৫১ পুরানা পল্টন, মুদ্রক গ্লোরি প্রিন্টার্স, ঢাকা–১। ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬।

৬৫। দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ১৯৬৬।

৬৬। দমননীতি, গণহত্যার প্রতিবাদে ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হউন (প্রচারপত্র), ঢাকাঃ ইষ্ট পাকিস্তান প্রেস, ২৬৩ বংশাল রোড। ৮ই জুন ১৯৬৬।

৬৭। রংপুরে অনুষ্ঠিত ন্যাপের বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পুস্তিকা), ৩০শে নভেম্বর ১৯৬৭।

৬৮। সাপ্তাহিক পূর্বদেশ, ঢাকা, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।

৬৯। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ৯ই নভেম্বর ১৯৬৮।
দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৯ই নভেম্বর ১৯৬৮।

৭০। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ২০শে নভেম্বর ১৯৬৮।

৭১। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ২৩শে নভেম্বর ১৯৬৮।

৭২। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ৩০শে নভেম্বর ১৯৬৮।

৭৩। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ২রা ডিসেম্বর ১৯৬৮।

৭৪। এই পুরো প্যারার তথ্যের জন্যে– মাহফুজ উল্লাহ, অভ্যুত্থানের উনসত্তর, ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, পৃঃ ১৬–১৭।

৭৫। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৮।

৭৬। ঐ, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৮।

৭৭। ঐ, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৬৮।

৭৮। ঐ

৭৮ক। হাজী মোহাম্মদ দানেশ, " মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন" (প্রবন্ধ) গ্রন্থ শাহারিয়ার কবীর, সম্পাদিত, মওলানা ভাসানী জীবন ও সংগ্রাম, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৮, পৃঃ ১৩৫।

৭৯। পুরো প্যারার তথ্য নেয়া হয়েছে- মাহফুজ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯।

৮০। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬৮।

৮১। পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নামে প্রচারিত এই প্রচারপত্রটি কৃষক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক আবদুল মতিন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১লা জানুয়ারী ১৯৬৯।

৮২। ১১-দফা দাবীর পূর্ণ বিবরণের জন্যে-
হাসান উজ্জামান, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন, ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, পৃঃ ৪১-৪৩।

৮৩। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে- দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৯ই জানুয়ারী ১৯৬৯।

৮৪। 'দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ২১শে জানুয়ারী ১৯৬৯।

৮৫। দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ২১ শে জানুয়ারী ১৯৬৯।
দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ২১শে জানুয়ারী ১৯৬৯।

৮৬। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ২২শে জানুয়ারী ১৯৬৯।

৮৭। দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আজাদ, দৈনিক সংবাদ ২১ এবং ২২শে জানুয়ারী ১৯৬৯।

৮৮। শামসুর রাহমান, "আসাদের সার্ট" সাগর বড়াল (সম্পাদিত), উপদ্রুত পলাশ (দেনিশ), ঢাকাঃ ১৯৭৪ পৃঃ ৭।

৮৯। আজাদ, ঢাকা, ২৫শে জানুয়ারী থেকে ৩০শে জানুয়ারী ১৯৬৯ সংখ্যাগুলো।

৯০। এই শেষোক্ত তথ্যের জন্য মাহফুজউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।

৯১। ঢাকার আজিমপুর নিউমার্কেটের উল্টোদিকে বড় রাস্তা সংলগ্ন আজিমপুর কলোনীর একটি ফ্ল্যাটে তৎকালে বসবাসকারী বর্তমান গবেষক এসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। পরবর্তী ক'দিন ঢাকার রাস্তায় বস্তির ও রাস্তা-ঘাটে বসবাসকারী বালক ও কিশোরেরাও মিছিল করে "ই.পি.আর এর বুলেট খাইয়া স্বর্গে যাব গো" ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করেছে। উল্লেখ্য যে, বিগত দিনগুলিতে আন্দোলনরত জনতার ওপর তৎকালীন ই.পি.আর. বাহিনী ব্যাপক গুলীবর্ষণ ও নিপীড়ন করে।

৯২। ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।

৯৩। ঐ, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।

৯৪। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ২রা জানুয়ারী ১৯৬৯।

৯৫। সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।

৯৬। আজাদ, ঢাকা, ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।

৯৭। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।

৯৮। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।
৯৯। সাপ্তাহিক আওয়াজ, ঢাকা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।
১০০। আজাদ, ঢাকা, ১লা মার্চ ১৯৬৯।
১০১। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১লা মার্চ ১৯৬৯।
১০২। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ৩রা মার্চ ১৯৬৯।
১০৩। আজাদ, ঢাকা, ৪ঠা মার্চ ১৯৬৯।
১০৪। ঐ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৬৮-৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানকালে রাজনীতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও ব্যাপক জনতার তরফ থেকে দাবী উঠেছিল আইয়ুবের শোষণ ভিত্তিক, দুর্নীতিবাজ ও অগণতান্ত্রিক মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা বাতিলের। জনতা আরো দাবী করেছিল যে, মৌলিক গণতন্ত্রীগণ আইয়ুবের শোষণ ব্যবস্থা ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবেন এবং জনতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করবেন মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ ত্যাগ করে। কাজেই গণ অভ্যুত্থানকালে পদত্যাগকারী মৌলিক গণতন্ত্রীগণ জনতার পক্ষাবলম্বী বলে বিবেচিত হয়েছিলো। চাঁদপুরে এমন পদত্যাগকারী দু'জন সদস্যকে হত্যা করায় জনতা হত্যাকারী চেয়ারম্যান ও তার পুত্রের ওপর রোষ প্রকাশ করে। —বর্তমান গবেষক।
১০৫। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১লা মার্চ ১৯৬৯।
১০৬। ঐ ২রা মার্চ, ১৯৬৯।
১০৭। ঐ।
১০৮। ঐ।
১০৯। ঐ।
১১০। ঐ, ৩রা মার্চ ১৯৬৯।
১১১। আজাদ, ঢাকা, ৫ই মার্চ ১৯৬৯।
১১২। ঐ।
১১৩। ঐ।
১১৪। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ৮ই মার্চ, ১৯৬৯।
১১৫। ঐ, ১০ই মার্চ ১৯৬৯।
১১৬। ঐ, আজাদ, ঢাকা, ১০ই মার্চ ১৯৬৯।
১১৭। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১১ই মার্চ ১৯৬৯।
১১৮। ঐ।
১১৯। ঐ।
১২০। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১২ই মার্চ ১৯৬৯।
১২১। ঐ।
১২২। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১২ই মার্চ ১৯৬৯।
১২৩। ঐ।
১২৪। আজাদ, ঢাকা, ১৩ই মার্চ ১৯৬৯।

১২৫। ঐ। এ ছাড়া দেখুন, মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৩ই মার্চ ১৯৬৯।

১২৬। আজাদ, ঢাকা, ১৩ই মার্চ ১৯৬৯।

১২৭। দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ১৩ই মার্চ ১৯৬৯।

১২৮। মর্নিং নিউজ,ঢাকা, ১৩ই মার্চ ১৯৬৯।

১২৯। ঐ।

১৩০। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৪ই মার্চ ১৯৬৯।
আজাদ, ঢাকা, ১৪ই মার্চ ১৯৬৯।

১৩১। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৪ই মার্চ ১৯৬৯।

১৩২। ঐ।

১৩৩। দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ১৪ এবং ১৫ই মার্চ ১৯৬৯।

১৩৪। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৫ই মার্চ ১৯৬৯।

১৩৫। ঐ।

১৩৬। আজাদ, ঢাকা, ১৫ই মার্চ ১৯৬৯।

১৩৭। ঐ।

১৩৮। দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ই মার্চ ১৯৬৯।

১৩৯। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৬ই মার্চ ১৯৬৯।

১৪০। ঐ।

১৪১। আজাদ, ঢাকা, ১৭ই মার্চ ১৯৬৯।

১৪২। ঐ।

১৪৩। ঐ।

১৪৪। ঐ।

১৪৫। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৮ই মার্চ ১৯৬৯।

১৪৬। আজাদ, ঢাকা, ১৮ই মার্চ ১৯৬৯।

১৪৭। ঐ।

১৪৮। ঐ।

১৪৯। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৯শে মার্চ ১৯৬৯।

১৫০। আজাদ, ঢাকা, ১৯শে মার্চ ১৯৬৯। এ সংক্রান্ত আরো সংবাদের জন্যে দেখুন। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৯শে মার্চ ১৯৬৯।

১৫১। আজাদ, ১৯শে মার্চ ১৯৬৯।

১৫২। উভয় সংবাদের জন্য, ঐ।

১৫৩। ঐ।

১৫৪। ঐ।

১৫৫। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ২০শে মার্চ ১৯৬৯।

১৫৬। সব ক'টি সংবাদের জন্যে আজাদ, ঢাকা, ২০শে মার্চ ১৯৬৯।

১৫৭। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ২১শে মার্চ ১৯৬৯।

১৫৮। আজাদ, ঢাকা, ২১শে মার্চ ১৯৬৯।

৯৮। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।

৯৯। সাপ্তাহিক আওয়াজ, ঢাকা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।

১০০। আজাদ, ঢাকা, ১লা মার্চ ১৯৬৯।

১০১। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১লা মার্চ ১৯৬৯।

১০২। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ৩রা মার্চ ১৯৬৯।

১০৩। আজাদ, ঢাকা, ৪ঠা মার্চ ১৯৬৯।

১০৪। ঐ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৬৮-৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানকালে রাজনীতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও ব্যাপক জনতার তরফ থেকে দাবী উঠেছিল আইয়ুবের শোষণ ভিত্তিক, দুর্নীতিবাজ ও অগণতান্ত্রিক মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা বাতিলের। জনতা আরো দাবী করেছিল যে, মৌলিক গণতন্ত্রীগণ আইয়ুবের শোষণ ব্যবস্থা ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবেন এবং জনতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করবেন মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ ত্যাগ করে। কাজেই গণ অভ্যুত্থানকালে পদত্যাগকারী মৌলিক গণতন্ত্রীগণ জনতার পক্ষাবলম্বী বলে বিবেচিত হয়েছিলো। চাঁদপুরে এমন পদত্যাগকারী দু'জন সদস্যকে হত্যা করায় জনতা হত্যাকারী চেয়ারম্যান ও তার পুত্রের ওপর রোষ প্রকাশ করে। —বর্তমান গবেষক।

১০৫। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১লা মার্চ ১৯৬৯।

১০৬। ঐ ২রা মার্চ, ১৯৬৯।

১০৭। ঐ।

১০৮। ঐ।

১০৯। ঐ।

১১০। ঐ, ৩রা মার্চ ১৯৬৯।

১১১। আজাদ, ঢাকা, ৫ই মার্চ ১৯৬৯।

১১২। ঐ।

১১৩। ঐ।

১১৪। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ৮ই মার্চ, ১৯৬৯।

১১৫। ঐ, ১০ই মার্চ ১৯৬৯।

১১৬। ঐ, আজাদ, ঢাকা, ১০ই মার্চ ১৯৬৯।

১১৭। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১১ই মার্চ ১৯৬৯।

১১৮। ঐ।

১১৯। ঐ।

১২০। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১২ই মার্চ ১৯৬৯।

১২১। ঐ।

১২২। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১২ই মার্চ ১৯৬৯।

১২৩। ঐ।

১২৪। আজাদ, ঢাকা, ১৩ই মার্চ ১৯৬৯।

১২৫। ঐ। এ ছাড়া দেখুন, মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৩ই মার্চ ১৯৬৯।
১২৬। আজাদ, ঢাকা, ১৩ই মার্চ ১৯৬৯।
১২৭। দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ১৩ই মার্চ ১৯৬৯।
১২৮। মর্নিং নিউজ,ঢাকা, ১৩ই মার্চ ১৯৬৯।
১২৯। ঐ।
১৩০। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৪ই মার্চ ১৯৬৯।
আজাদ, ঢাকা, ১৪ই মার্চ ১৯৬৯।
১৩১। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৪ই মার্চ ১৯৬৯।
১৩২। ঐ।
১৩৩। দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ১৪ এবং ১৫ই মার্চ ১৯৬৯।
১৩৪। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৫ই মার্চ ১৯৬৯।
১৩৫। ঐ।
১৩৬। আজাদ, ঢাকা, ১৫ই মার্চ ১৯৬৯।
১৩৭। ঐ।
১৩৮। দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ই মার্চ ১৯৬৯।
১৩৯। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৬ই মার্চ ১৯৬৯।
১৪০। ঐ।
১৪১। আজাদ, ঢাকা, ১৭ই মার্চ ১৯৬৯।
১৪২। ঐ।
১৪৩। ঐ।
১৪৪। ঐ।
১৪৫। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৮ই মার্চ ১৯৬৯।
১৪৬। আজাদ, ঢাকা, ১৮ই মার্চ ১৯৬৯।
১৪৭। ঐ।
১৪৮। ঐ।
১৪৯। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৯শে মার্চ ১৯৬৯।
১৫০। আজাদ, ঢাকা, ১৯শে মার্চ ১৯৬৯। এ সংক্রান্ত আরো সংবাদের জন্যে দেখুন । মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৯শে মার্চ ১৯৬৯।
১৫১। আজাদ, ১৯শে মার্চ ১৯৬৯।
১৫২। উভয় সংবাদের জন্য, ঐ।
১৫৩। ঐ।
১৫৪। ঐ।
১৫৫। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ২০শে মার্চ ১৯৬৯।
১৫৬। সব ক'টি সংবাদের জন্যে আজাদ, ঢাকা, ২০শে মার্চ ১৯৬৯।
১৫৭। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ২১শে মার্চ ১৯৬৯।
১৫৮। আজাদ, ঢাকা, ২১শে মার্চ ১৯৬৯।

১৫৯। ঐ।

১৬০। ঐ।

১৬১। ঐ।

১৬২। ঐ, ২২শে মার্চ ১৯৬৯।

১৬৩। ঐ।

১৬৪। ঐ, ২৩শে মার্চ ১৯৬৯।

১৬৫। ঐ, ২৫শে মার্চ ১৯৬৯।

১৬৬। ঐ, ২৬শে মার্চ ১৯৬৯।

১৬৭। তারিক আলী, পাকিস্তানঃ মিলিটারী রুল অর পিপল'স্ পাওয়ার ?, লণ্ডনঃ জোনাথন কেপ, ১৯৭০, পৃঃ ২১৩।

১৬৮। মোহাম্মদ আইয়ুব এ্যাণ্ড কে, সুব্রামানিয়াম, দি লিবারেশন ওয়ার, নিউদিল্লীঃ এস, চান্দ এ্যাণ্ড কোঃ প্রাইভেট লিঃ, রিপ্রিন্টঃ মার্চ ১৯৭২, পৃঃ ৭৮–৭৯।

১৬৯। কমরুদ্দীন আহমদ, লেবার মুভমেন্ট ইন ইষ্ট পাকিস্তান, ঢাকাঃ প্রগতি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৬৯, পৃঃ ৯৬–১০৯।

১৭০। ঐ, পৃঃ ১১০।

১৭১। পিটার হ্যাজেলহার্ষ্ট, "মব রেয়িংস্ সুইপ রুরাল ইস্ট পাকিস্তান"; দি নিউইয়র্ক টাইমস্, ২০শে মার্চ ১৯৬৯।

১৭২। জোসেফ লেলিভেল্ড, " আইয়ুব'স হোপস্ ডিজলভ ইনটু মার্শাল ল", দি নিউইয়র্ক টাইমস্, ৩০শে মার্চ ১৯৬৯। এছাড়া দেখুন, দি নিউইর্য়র্ক টাইমস্, ২২শে ফেব্রুয়ারী এবং ২৬শে মার্চ ১৯৬৯।

১৭৩। রওনক জাহান, পাকিস্তানঃ ফেইলিয়র ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন, ঢাকা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৭, পৃঃ ১৭২–৭৬।

১৭৪। ডিসেম্বর–মার্চ (১৯৬৮–৬৯) আন্দোলনের পর্যালোচনা, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক ২৮শে মে ১৯৬৯ তারিখে প্রকাশিত দলিল, পৃঃ৫।

১৭৫। ডেভিড লোশাক, পাকিস্তান ক্রাইসিস, লন্ডনঃ হাইনিম্যান, প্রথম প্রকাশ ১৯৭১, পৃঃ ২৯–৩০।

১৭৫ক। ১৯৬৮–৬৯ সালের বৈপ্লবিক গণ অভ্যুত্থানকালে টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে ঘেরাও আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী কমিউনিস্ট নেতা হায়দার আকবর খান রনোর সঙ্গে ১৯৮৪ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারীর ভেতর আমার কয়েক বারের আলাপচারিতা দ্রষ্টব্য। রনো বর্তমানে ওয়ার্কার্স পার্টির (মেনন) কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

১৭৬। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ৩রা মার্চ ১৯৬৯।

১৭৭। মেসবাহ কামাল, আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ঢাকাঃ বিবর্তন, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, পৃঃ ৬৯–৭০।

১৭৮। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১১ই মার্চ ১৯৬৯।

১৭৯। ঐ।

১৮০। ঐ, ১৩ই মার্চ ১৯৬৯।

১৮১। মেসবাহ কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০। কামাল মস্কোপন্থী ন্যাপ নেতা রবি নিয়োগীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এ তথ্য সংগ্রহ করেছেনঃ বর্তমান গবেষক।

১৮২। পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ২০শে মার্চ ১৯৬৯।

১৮৩। আজাদ, ঢাকা ,১৪ই মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ ১৯৬৯ সংখ্যাগুলো দ্রষ্টব্য।

১৮৪। উদ্ধৃত ঃ মাহফুজউল্লাহ ,অভ্যুত্থানের উনসত্তর ,ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, পৃঃ, ৮৫-৮৬।

১৮৫। রেহমান সোবহান এন্ড মুজাফফর আহমদ ,পাবলিক এন্টারপ্রাইজ ইন এন ইন্টারমিডিয়েট রিজিম ঃ এ স্টাডি ইন দি পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ বাংলাদেশ ,ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ১৯৮০,পৃঃ ৮৭ ।

১৮৬। মোশাররফ হোসেইন, "নেচার অব স্টেট পাওয়ার ইন বাংলাদেশ" দি জার্নাল অফ সোশ্যাল স্টাডিজ, ঢাকা, জার্নাল অফ দি সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ, ঢাকা ইউনির্ভাসিটি , নম্বর ৫ ,অক্টোবর ১৯৭৯, পৃঃ ২৩।

১৮৭। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস (পুস্তিকা) , পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন, ১লা ডিসেম্বর ১৯৬৮।

১৮৮। ১১দফার পূর্ণ বিবরণের জন্যে—হাসানউজ্জামান, আন্তর্জাতিক, প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন, ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী , ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, পৃঃ ৪১-৪৩।১১-দফা কর্মসূচীর সঙ্গে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও "ডাকসুর" যাদের নাম জড়িত ছিল , তারা হচ্ছেন ঃ ছাত্র লীগের সভাপতি আবদুর রউফ ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী , ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার ও সহসম্পাদিকা দীপা দত্ত , ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সভাপতি সাইফুদ্দিন আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা ,এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী ।

১৮৯। দৈনিক পাকিস্তান , ঢাকা , ১৪ ই মার্চ ১৯৬৯ ।

১৯০। পূর্ব বাংলার জনতার নিকট কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী পেশ (প্রচার পুস্তিকা), কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি , এপ্রিল১৯৬৯।

১৯১। নীতি ও কর্মসূচীর ঘোষণা (ম্যানিফেস্টো), পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, তাজউদ্দিন আহমদ , সাধারণ সম্পাদক , পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এর নামে প্রকাশিত ১লা আগষ্ট ১৯৬৯ (তৃতীয় পুণর্মুদ্রণ)

১৯২। মাহফুজ উল্লাহ , প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪। ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) প্রচার পত্রটি প্রকাশ ও বিলি করে এবং এটি প্রকাশের দায়িত্বে ছিলেন নূর

মোহাম্মদ খান ও মাহবুব উল্লাহ – ঐ, পৃঃ ৬৫ –৬৬ ।

১৯৩। ঐ, পৃঃ ১১০ ।

১৯৪। দৈনিক ইত্তেফাক , ঢাকা , ১২ই আগষ্ট ১৯৬৯ ।

১৯৫। ঐ, ৩০শে আগষ্ট ১৯৬৯ ।

১৯৬। ঐ, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ ।

১৯৭। জনতা, ঢাকা , ১৪ ই আগষ্ট ১৯৬৯ ।

১৯৮। ২৮শে অক্টোবর ১৯৭০– এ প্রদত্ত শেখ মুজিবের রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণ। দ্রষ্টব্য ঃ জনতা, ঢাকা, ১লা নভেম্বর ১৯৭০।

১৯৯। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯।

২০০। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৬৯।

২০১। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৬ই অক্টোবর ১৯৬৯।

২০২। ১১–দফার সংগ্রাম চলবেই' ইয়াহিয়া খানের ভাষণ সম্পর্কে ছাত্র সমাজের অভিমত (প্রচারপত্র), ঢাকাঃ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় ৩১/১, হোসেনী দালান থেকে প্রকাশিত ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক কামাল– উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রচারিত। বর্ণশ্রী মুদ্রায়ণ, ৩৪ টিপু সুলতান রোড থেকে মুদ্রিত। নভেম্বর ১৯৬৯।

২০৩। সংবাদ, ঢাকা ৫ই জানুয়ারী ১৯৭০।

২০৪। ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৭শে এপ্রিল ১৯৭০।

২০৫। ঐ, ৪ঠা জুন ১৯৭০।

২০৬। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ৬ই অক্টোবর ১৯৬৯।

২০৭। দ্রষ্টব্যঃ পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ১৬ই মার্চ ১৯৭০। মর্নিং নিউজ, ঢাকা ২৪শে জুন ১৯৭০। ইত্তেফাক, ঢাকা, ৪ঠা মার্চ ১৯৭০।

২০৮। আজাদ, ঢাকা, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৯।

২০৯। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১২ই জানুয়ারী ১৯৭০।

২১০। ঐ, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৭০।

২১১। ঐ, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০।

২১২। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১–দফা কর্মসূচী (প্রচারপত্র), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে মাহবুব উল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০।

২১৩। জনতা, ঢাকা, ১২ই এপ্রিল ১৯৭০।

২১৪। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ৭ই জুন ১৯৭০।

২১৫। আওয়ামী লীগের সত্তরের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ও প্রস্তাবিত সাংবিধানিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যাবলীর পূর্ণ বিবরণের জন্যে– মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ৮ই জুন ১৯৭০।

২১৬। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ২১শে অক্টোবর ১৯৭০।

২১৭। ঐ, ৬ই নভেম্বর ১৯৭০।

২১৮। ঐ, ১৮ই নভেম্বর ১৯৭০।

২১৯। ঐ, ২৪শে নভেম্বর ১৯৭০।

২২০। শাহজাহান সিরাজের সাক্ষাৎকার নিপুণ, ঢাকা, দশম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৪, পৃঃ ২৮–২৯।

২২১। মেহনতি জনতার সাথে একাত্মতা হও। ২রা অক্টোবরের গণ সমাবেশে উপস্থিত কৃষক–শ্রমিক মেহনতি জনতার প্রতি পূর্ববাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের আহ্বান (প্রচারপত্র), ২রা অক্টোবর ১৯৭০।

২২২। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে। দেখুন, ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭১। প্রাদেশিক পরিষদে আসন সংখ্যা ও ভোটের শতকরা হার নির্ধারণ করা হয়েছে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলো থেকে–

ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৮ ও ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৭০।

মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৮ এবং ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৭০।

২২৩। সংবাদ, ঢাকা, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭০।

২২৪। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭০।

২২৫। ঐ, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭০

২২৬। ঐ, ৩০ শে ডিসেম্বর ১৯৭০।

২২৭। ঐ, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭১।

২২৮। ঐ।

২২৯। ঐ, ১১ই জানুয়ারী ১৯৭১।

২৩০। ২০শে জানুয়ারী শহীদ আসাদ দিবস (প্রচারপত্র), পূর্ববাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৭১।

২৩১। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১।

২৩২। গণ–বিপ্লব দিবসে মেহনতী জনতার নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার কায়েমের শপথ নিন (প্রচারপত্র), ঢাকাঃ শ্রমিক–কৃষক সমাজবাদী দল। দলের পক্ষে হারুন–উর–রশিদ কর্তৃক ২৪৩ মধুবাজার থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১।

২৩৩। একাত্তরে একুশের ডাক (প্রচারপত্র), পূর্ববাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১।

২৩৪। উদ্ধৃতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্রঃ দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃঃ ৬৫৩–৫৪।

২৩৫। দৈনিক পাকিস্তান, ১লা মার্চ ১৯৭১।

২৩৬। ঐ। একই রিপোর্টের জন্যে দেখুন, দৈনিক পূর্বদেশ, ঢাকা, ১লা মার্চ ১৯৭১। দি ডন, করাচী, ১লা মার্চ ১৯৭১।

২৩৭। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ২রা মার্চ ১৯৭১।

২৩৮। উদ্ধৃতঃ হাসান উজ্জামান, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন; ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, পৃঃ ৪৪–৪৭।

২৩৯। আপোসের বাণী আগুনে জ্বালিয়ে দাও, প্রতিরোধ (স্বাধীন সার্বভৌম শোষণমুক্ত বাংলাদেশের জাগ্রত লেখক শিল্পীদের মুখপত্র), দ্বিতীয় সংখ্যা, ৬ই মার্চ ১৯৭১।

২৪০। ঐ।

২৪১। দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা ৭ই মার্চ ১৯৭১।

২৪২। আঘাত হানো (প্রচার পত্র), কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, ৭ই মার্চ ১৯৭১।

২৪৩। জয় স্বাধীন বাঙলা, ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের ডাক আপোসের চোরাবালিতে বাঙলার এ স্বাধীনতার উদীত সূর্য যেন মেঘাচ্ছন্ন না হয় (প্রচার পত্র)। ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ এহসানুল হক সেলিম কর্তৃক ঘোষিত ও প্রচারিত। ৮ই মার্চ ১৯৭১। এই প্রচারপত্র সংগঠনের সভাপতি মোঃ লুৎফুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ওয়াজেদুল করিমের নামে ছাপা হয়।

২৪৪। পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন (প্রচারপত্র), মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৯ই মার্চ ১৯৭১।

২৪৫। শত্রু বাহিনীকে মোকাবেলায় প্রস্তুত হউন গণস্বার্থে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন, কেন্দ্রীয় কমিটি, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, ৯ই মার্চ ১৯৭১।

২৪৬। পূর্ব বাঙলার মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন নয়, হরতাল–ধর্মঘট নয় অস্ত্র হাতে লড়াই করুন শত শত মানুষের হত্যার বদলা নিন। গ্রামে কৃষকদের গেরিলা লড়াই–এ সংগঠিত করুন (প্রচার পত্র), ঢাকা জেলা শাখা, পূর্ব পাকিস্তান কমিনিউস্ট পার্টি (মার্কসবাদী–লেনিনবাদী), ৯ই মার্চ ১৯৭১।

২৪৭। শোষণমুক্ত স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রাম আরও দুর্বার করিয়া তুলুন (প্রচার পত্র), ছাত্র ইউনিয়ন, ১১ই মার্চ ১৯৭১।

২৪৮। লরেন্স লিফসুজ, বাংলাদেশঃ দি আনফিনিশড্ রিভোলিউশন, লন্ডনঃ জেড প্রেস, ১৯৭৯, পৃঃ২৯।

২৪৯। লা মন্ডে, প্যারিস, ৩১শে মার্চ ১৯৭১। উদ্ধৃতঃ লিফসুজ, ঐ।

২৫০। রেহমান সোবহান, "শেখ মুজিবুর রহমান এ্যান্ড দি কন্ট্রাডিকশনস্ অফ বুর্জোয়া সোসাইটি ইন বাঙলাদেশ", আবদুল গাফফার চৌধুরী, সম্পাদিত, শেখ মুজিবঃ এ কোমেমোরেটিভ এ্যানথোলজী, লন্ডনঃ র‍্যাডিকাল এশিয়া বুকস্ ১৯৭৭।

২৫১। রক্তাক্ত বাংলাঃ মুজিবনগরঃ মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ), আগস্ট ১৯৭১।

২৫২। ঐ, পৃঃ ৪৩।

২৫৩। ঐ, পৃঃ১২৭–২৮।

২৫৪। ঐ, পৃঃ ১৩৭–৩৮।

২৫৫। ঐ, পৃঃ ১৫০।

২৫৬। ঐ, পৃঃ ২১৫।

২৫৭। আহমদ ছফা, জাগ্রত বাংলাদেশ, মুজিবনগরঃ মুক্তধারা (স্বাধীন বাঙলা সাহিত্য পরিষদ),ঃ শ্রাবণ ১৩৮৭, পৃঃ ৮৮।

২৫৮। উদ্বৃতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্রঃ তৃতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃঃ ২৮৯-৯৪।

২৫৯। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ২৯৬-৯৮।

২৬০। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৩২১-২২।

২৬১। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৩৪২-৪৫।

২৬২। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৮৯০-৯৩।

২৬৩। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৮৯৮।

২৬৪। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৯৪৬-৪৮।

২৬৫। উদ্ধৃতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্রঃ চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃঃ ৪৬৫-৬৮।

২৬৬। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৪৯৩-৯৭।

২৬৭। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৫০৯-১৫।

২৬৮। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৫৩৭-৫৪৭।

২৬৯। টাইমস অফ ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ২৮শে জুলাই ১৯৭১, উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৫৬৬।

২৭০। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৫৮৭-৯০।

২৭১। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৬০৫-৬১৫।

২৭২। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৬১৬-২২।

২৭৩। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৬৪৮-৫১।

২৭৪। উদ্ধৃতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্রঃ পঞ্চম খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃঃ ৩১৬-২৪।

২৭৫। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ২৭৯-৮১।

২৭৬। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ২৭৬-২৭৯।

২৭৭। উদ্ধৃতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্রঃ ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃঃ ৯৩-৯৭।

২৭৮। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ১২৯।

২৭৯। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ১৩১।

২৮০। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ২০৭-১১।

২৮১। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ২৫৪-৫৫।

২৮২। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ২৭২-৭৩।

২৮৩। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৩১৯-২৪।

২৮৪। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৩৫৪-৫৭।

২৮৫। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৩৮৪–৯০।

২৮৬। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৪৫৯–৬০।

২৮৭। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৫৮২–৮৪।

২৮৮। উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৫৯৩–৯৫।

২৮৯। উদ্ধৃতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্রঃ ১৫শ খণ্ড,ঢাকা, তথ্যমন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৫, পৃঃ ৩৭–৫৩।

২৯০। দি বাংলাদেশ অবজারভার, ঢাকা, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭১।

২৯১। মুজিব এ বক্তৃতা দেন ১৪ই জানুয়ারী ১৯৭২–এ। পূর্ণ বিবরণের জন্যে– আর. এন. ত্রীপাঠি, ট্রাভেল টু ডিমোক্রেসী,ঃ কানপুরঃ পুস্তক ভবন, ১৯৭২, এ্যাপেনডিক্স–৭।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ পর্যায়ে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের চেতনা
বিকাশের আর্থরাজনীতি ও ইতিহাস অনুসন্ধান করা হয়েছে এই
বইতে। মতাদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রের বিষয়টি কিভাবে
বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং জনগণের চেতনায় ঠাঁই পেলো,
কিভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ,
ছাত্র–বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক কর্মী ও নেতৃবর্গ এবং দেশের
ব্যাপক গণমানুষ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে জাতীয় ঐকমত্য
হিসেবে গ্রহণ করলো, সেই ইতিহাস, তার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত
এবং ১৯৪৭ — '৭২ পর্যায়ের রাজনৈতিক অর্থনীতি অনুসন্ধান,
আলোচনা ও বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের মূল উপপাদ্য বিষয়।
গ্রন্থকার ডঃ হাসান উজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান
বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। এর আগে তিনি জাহাঙ্গীরনগর
বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক
ও চেয়ারম্যান ছিলেন। এ যাবৎ তাঁর প্রকাশিত
গ্রন্থের সংখ্যা বিশটি।

টাকা ১০০.০০

UPB 119